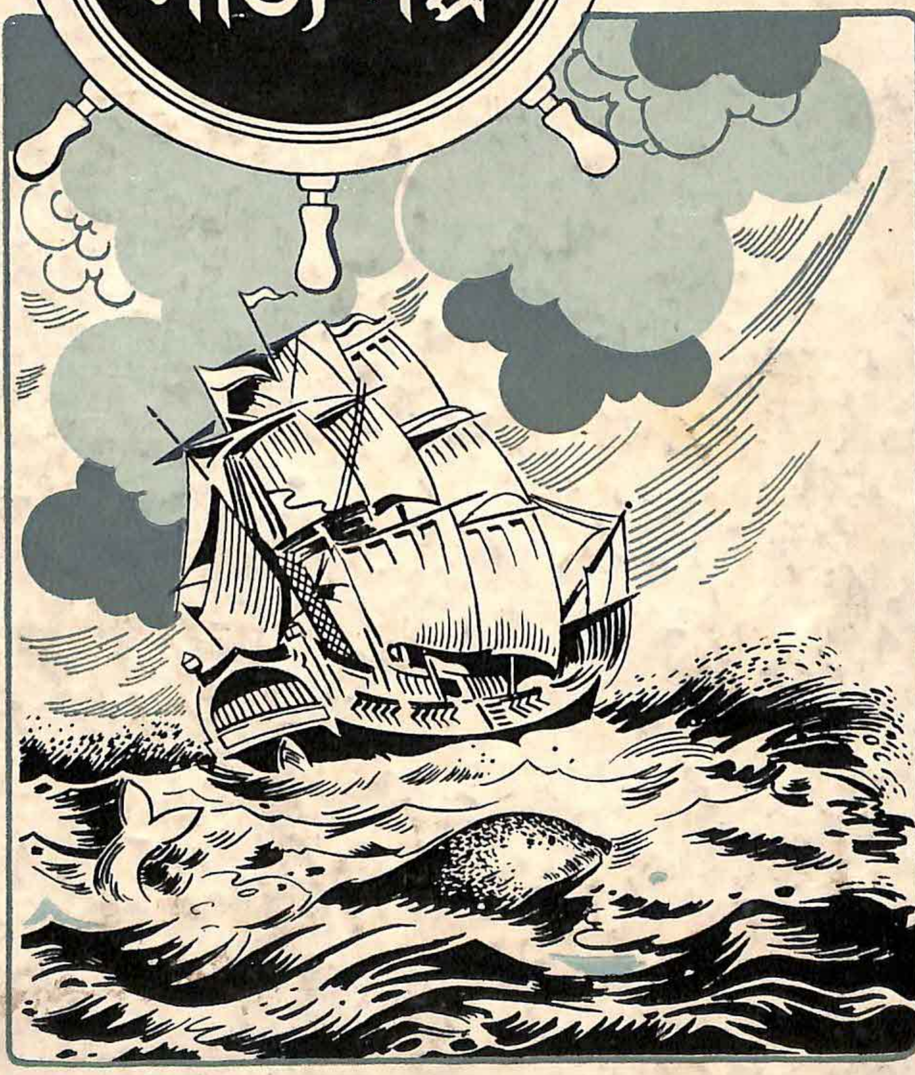
সলিল লাহিড়ী

সমুদ্র অভিযানের সত্যি গল্প



সমুদ্র অভিযানের সত্যি গল্প

সলিল লাহিড়ী

মডেল পাবলিশিং হাউস, ২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-৭০০ ০৭৩

SAMUDRA AVIJANER SATYE GALPO

A thriller and adventure on actual Sea. Expedition

by

Salil Lahiri

প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা বৈশাখ-১৩৯৩

15th. April 1986

প্রকাশক ঃ জয়দেব ঘোষ।
মডেল পাবলিশিং হাউস,
২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩।

মুদ্রাকর ঃ জি. শীল,
ইম্প্রেসন প্রবলেম
২৭এ, তারক চ্যাটার্জী লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৫।

ম্যাপ ও ফটো ঃ সলিল লাহিড়ী

প্রচ্ছদ ঃ সত্য চক্রবর্তী।

মূল্য ঃ পনেরো টাকা
Price ঃ *Rs. Fifteen only*

রোমাঞ্চ আর বিস্ময়
এই নিয়েই সমুদ্র

সমুদ্রের বিস্তৃতি যেমন আদিগন্ত, গভীরতাও তেমনি অতলান্ত। বিস্ময় আররোমঞ্চভরা সমুদ্র-যাকে একবার আকর্ষণ করেছে, সে বারবার ছুটেছে সমুদ্রে, শত-সহস্র বাধাকে তুচ্ছ করেই।

এমনি বাধা-বিপদ মাথায় নিয়েই যাঁরা সমুদ্রে ছুটেছেন, জীবন বিপন্ন করেও সমুদ্রের রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করেছেন, সমুদ্রের বুক থেকে হারামাণিক ফিরিয়ে আনার জন্য সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়েছেন, কাল্পিক কাহিনীর রেখা ধরে ছুটেছেন সমুদ্রের অজানা পথে, খুলেছেন নূতন নূতন রহস্যজাল, তাদেরই কয়েকজনের সত্যকাহিনীকে আশ্রয় করেই এই বই।

তিনটি সত্য কাহিনীর সমন্বয়ে এই বই 'সমুদ্রঅভিযানের সত্যি গল্প'। সত্য কাহিনীকে গল্পের আকারে বলার চেষ্টা করা হয়েছে। গল্পের বুনুনির জন্য কিছু কাল্পিক চরিত্র সংযোজিত হয়েছে। আর সেজন্যই "সত্যি কাহিনী" না বলে বলা হয়েছে, "সত্যি গল্প"।

ট্রেজার হান্টিং নিয়ে মিল ফিশারের ঘটনার সমাপ্তিকাল আগষ্ট ১৯৮৫ সাল। সংক্ষিপ্ত খবর বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত। তাকে অবলম্বন করেই "ট্রেজার হান্টার ফিশার"।

জ্যেইসনের কাল্পিক গল্পকে কেন্দ্র করে স্বর্ণগুহা অভিযানকাল ১৯৮৪ সাল। ক্যাপ্টেন সেভেরিন কাল্পিক ঘটনাকে অবলম্বন করে বহু সমুদ্র অভিযান করেছেন। তারই মধ্যে এক অনন্য অভিযান "জ্যেইসনের স্বর্ণগুহার সন্ধানে"।

সমুদ্রতলের পরিবেশে, অদ্ভুত সব অজানা জীবজন্তু, অজানা উদ্ভিদরা কেমন নিবিড় সখ্যতায় বেঁচে থাকছে, পরিবেশ সংরক্ষণ করছে, তাকেই দেখে এসেছেন সমুদ্র পরিবেশ-বিজ্ঞানী সিলভিয়া। ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৫ সালে সমুদ্রতলে চলেছে এই পরীক্ষা-নিরিক্ষা। সচিত্র এই রোমাঞ্চকর কাহিনীই বলা হয়েছে শেষ গল্প "সমুদ্রতলের বিস্ময়ে"।

সমুদ্রকে যারা ভাল করে জানেন না, চেনেন না, আমার বিশ্বাস, এই সংকলন তাদের সমুদ্র বিষয়ে কিছুটা আগ্রহী করবে।

সলিল লাহিড়ী

১লা বৈশাখ, ১৩৯৩;

উৎসর্গ

স্নেহবরেষু

শ্রীমান শান্তনুকে

বাবা

ট্রেজার হাণ্টার-ফিশার

নিউইয়র্কের এমপায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর একশ তলার রেষ্টুরেণ্টে বসে আছেন চিন্তিত মুখে মিল ফিশার। জাহাজের নামী ক্যাপ্টেন মিল ফিশার। জাহাজ নিয়ে পৃথিবীর দেশী-বিদেশী সব সমুদ্রেই বহুবার পাড়ি দিয়েছেন। ঝড়-ঝঞ্ঝা, আপদ-বিপদ অনেক কিছুর সঙ্গেই বহুবার পরিচয় হয়েছে ক্যাপ্টেন মিল ফিশারের। সী-ডাইভার হিসাবেও কম খ্যাতি নেই তাঁর। কিন্তু এই বছরে, ১৯৬৯ সালের ১৫ই জুলাই দিনের ঘটনা তাঁর জীবনের গতিই বদলে দিল।

এই কিছুদিন আগে জাহাজ নিয়ে তিনি গেছিলেন আমেরিকার দক্ষিণতম প্রান্তে বে-অফ-ফ্লোরিডায়। জাহাজ কয়দিন থাকবে সেখানে। তাই বে-অফ-ফ্লোরিডার সী-বিচ হোটেলে বিকেলে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে আসতেন তিনি। ওখানেই আলাপ হোল মিস্ বার্থ ম্যাকহোলির সঙ্গে।

সাধারণতঃ বড় ধরণের বেশী দিনের সী-ভয়েজ হলে ক্যাপ্টেন ফিশার তার স্ত্রী ডোলারিস আর ছোট ছেলে বারো বছরের নীল ফিশারকে সঙ্গে নিয়েই যেতেন। এবার দীর্ঘদিনের সমুদ্রযাত্রা ছিল বলে ডোলারিস আর নীল ক্যাপ্টেনের সঙ্গেই ছিল।

নীল ভারী দুরন্ত আর ছটপটে প্রাণচঞ্চল ছেলে। বলতে গেলে, ওরই জন্য প্রত্যেক দিন বিকেলে ফ্লোরিডা কিইসের কাছে বে-অফ-ফ্লোরিডার বোট-হাউসে, নানান ক্লাবে, ছেলে আর মাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে হোত। ফেরার পথে সী-বিচ হোটেলে আমেরিকার স্পেশাল খাবার ম্যাকডোনাল্ড চিকেন নাটস্ খেতে নিয়ে যেতে হোত ওদের। এই ফ্লোরিডা কিইসেই ঘটনাটা প্রথম ঘটল।

সেদিন সবে ম্যাকডোনাল্ড রুমে বসে হ্যামবারগার আর চিকেন ফ্রায়েড নাটস খাচ্ছেন। নীল খেতে খেতে উঠে যাচ্ছে, আর ট্রাই-লাক বক্সে কয়েন ঢোকাচ্ছে, চাবী টিপে দেখছে পঁচিশ সেণ্ট কয়েনের বদলে কয়েক ডলার ফেরৎ আসছে কিনা। নীলের পাশে দাঁড়িয়ে নীলের মা, মিসেস ডোলারিস্ ওকে উৎসাহিত করছে, বলছে—ট্রাই লাক্ নীল। জানিস্, ট্রাই করতে করতেই লাক্ ফেবার করে।

—না খোকা, এভাবে লাক ফেবার করে না।—পাশ থেকে কথাটা ভেসে আসে।

—কে। —চম্‌কে ঘুরে তাকান ডোলারিস ফিশার, ছোট্ট ছেলে নীল ফিশারের মা।

—আমি মিস বার্থ ম্যাকহোলি। স্রেফ ঘুরে বেড়ানই আমার কাজ। আর নানান্

জায়গা ঘুরে থিলিং কিছু খবর থাকলে সেটা জোগাড় করি তা নিয়ে, থিলি গল্প-কাহিনী লিখি।

—তাই নাকি? বাঃ, আপনি তো বেশ মজার ভদ্রমহিলা। —ফিক্ করে হেসে বলে নীল।

—ভাগ্য এভাবে ফেরে না, কথাটা হঠাৎ বললেন যে, এর মধ্যে কিছুর ইঙ্গিত আছে? —বেশ গম্ভীর হয়েই বলেন ডোলারিস।

কথাটা শুনে হেসে ফেলেন বার্থ ম্যাকহোলি। —মনে হচ্ছে কথাটা বলেছি বলে আপনি রেগে গেছেন? আমি কিছু মনে না করেই কথাটা বলেছি। তবে দেশ-বিদেশ ঘুরে যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে তার থেকে বলছি ট্রাই-লাক খেলে সত্যিই ভাগ্য ফেরে না। ট্রেজার নানান্ দেশে, নানান ভাবে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু তার খবর কে রাখে?

—অ্যাঃ, ট্রেজার ছড়িয়ে আছে! কোথায়! —আনন্দে লাফিয়ে উঠে বলে বাচ্চা নীল ফিশার।

—হ্যাঁ খোকা, আছে। কিন্তু তাকে খুঁজতে যাচ্ছে কে? ট্রেজার খোঁজা মানেই তো বিপদ। বিপদের মধ্যে আর কে যায়। —আস্তে নরম স্বরে বলে বার্থ ম্যাকহোলি। —আরামে থাকতেই তো সবাই চায়।

—না, মোটেই না। তুমি আমার বাবা ক্যাপ্টেন মিল ফিশারকে দেখ নি। জাহাজ নিয়ে কত দেশ বিদেশ ঘুরেছে। জান, কতবার জলদস্যুরা বাবার জাহাজ আক্রমণ করেছে, কিন্তু বাবা তাদের সঙ্গে লড়ে জাহাজকে বাঁচিয়ে এনেছে।

—তাই নাকি! তোমার বাবা জাহাজের ক্যাপ্টেন? —এবার বেশ গম্ভীর গলায় বলে বার্থ ম্যাকহোলি।

—হ্যাঁ। আমরা আর দিন কয়েক এখানে থাকছি। আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ক্যাপ্টেন মিল ফিশারকে জিজ্ঞেস করে নিতে পারেন। —মিসেস্ ডোলারিস ফিশারের গলায় বেশ রাগত ভাব।

—আহ্, আপনি দেখছি এখনও রেগে আছেন আমার ওপর। প্লি-ইজ, রাগ করবেন না। আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে আমার ভালই হোল। আমি এরকমই একজন কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছি এতদিন।

—তার মানে! —এবার নীল ফিশারের মা ডোলারিস সত্যিই অবাক হয়।

—আপনিই তাহলে মিসেস ফিশার, ক্যাপ্টেনের স্ত্রী? এই সুন্দর বাচ্চা ছেলের মা? —মিষ্টি হেসে বলে বার্থ ম্যাকহোলি।

—এই আমাকে বাচ্চা ছেলে বলছ কেন? জান না, আমি মাষ্টার নীল ফিশার? —খুব রেগে বলে নীল।

—স্যরি। তাই তো, তুমি বাচ্চা হবে কেন? তুমি তো মাষ্টার ফিশার। রাইট।

—নীল ফিশারকে আদর করে বলে ম্যাকহোলি।

তারপর ডোলারিস ফিশারের দিকে হাত বাড়িয়ে মিস বার্থ ম্যাকহোলি বলে—প্লিজ, লেট আস বি ফ্রেন্ড। বিশ্বাস করুন, সত্যিই ভীষণ ভাবে আমার দরকার ক্যাপ্টেন মিল ফিশারকে। আমি আমার পরিচয় পরিষ্কার ভাবে বলছি আপনাকে। আমি জিওলজি নিয়ে মাষ্টার ডিগ্রী পাবার পর জিওটেকনলজি নিয়ে রিসার্চ করছি। সী-ফ্লোরে সমুদ্র সম্পদ নিয়েই চলছে আমার পরীক্ষা। এই জন্যই নানান্ সমুদ্রতলের খবরাখবর নিয়ে চলেছি আজ ছ' সাত বছর ধরে।

—তারপর? ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কেন দেখা করতে চান? —ডোলারিস ফিশার প্রশ্ন করেন।

—সবই বলব ডোলারিস। এই রেষ্টুরেন্টে এসব নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়। আমাকে পরিচয় করিয়ে দিন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। সবই বলব সেখানে। বিশ্বাস করুন, আমি আপনাদের বন্ধু, সুহৃদ। —গভীর আবেগে মিসেস ডোলারিসের দু'হাত চেপে ধরে ম্যাকহোলি।

—চলুন আণ্টি, ড্যাডির সঙ্গে আমিই আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। —ম্যাকহোলির হাত ধরে বলে মাষ্টার নীল।

—চল। —এবার বন্ধুত্বের হাসি মিসেস ডোলারিস ফিশারের মুখেও।

মাষ্টার নীল ও মিসেস ডোলারিসের সঙ্গে মিস ম্যাকহোলি ফ্লোরিডা কিইসে এলো সী-ফরচুন জাহাজে। ক্যাপ্টেন মিল ফিশারের সঙ্গে দেখা হোল।

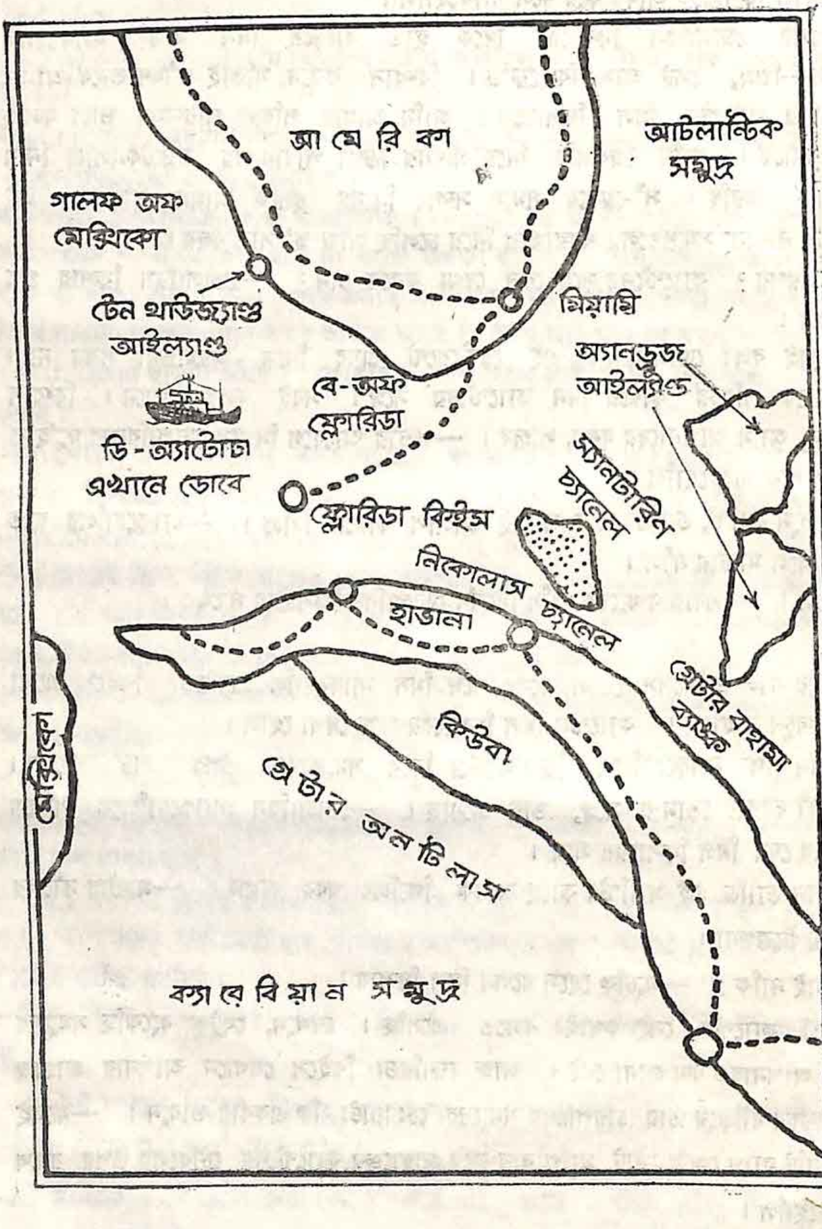
—ইনি বার্থ ম্যাকহোলি। জিওফিজিক্স নিয়ে সমুদ্রতলের উপর রিসার্চ করছেন। জরুরী দরকার তোমার সঙ্গে, তাই এনেছি। —ডোলারিস ম্যাকহোলিকে পরিচয় করিয়ে দেয় মিল ফিশারের সঙ্গে।

—জান ড্যাডি, এই অ্যাণ্টির কাছে অনেক থ্রিলিং খবর আছে। —মাষ্টার নীলের গলায় উত্তেজনা।

—তাই নাকি! —মুচকি হেসে বলেন মিল ফিশার।

—হ্যাঁ ক্যাপ্টেন, সেই কথাই বলতে এসেছি। দেখুন, যেটুকু বুঝেছি সমুদ্রের খবর আপনারও কম জানা নেই। আজ ফ্লোরিডা কিইসে যেখানে আপনার জাহাজ সী-ফরচুন দাঁড়িয়ে তার চারপাশের সমুদ্রের চেহারাটা কি একবার ভাবুন। —বলেই ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ছোট্ট ম্যাপ বার করে জাহাজের ক্যাপ্টেনের টেবিলের উপর রাখে ম্যাকহোলি।

—এই দেখুন, আটলাণ্টিক সমুদ্র ও গালফ অফ মেক্সিকোর সংযোগস্থলে মিয়ামি টাউন। ফ্লোরিডা কিইসের দক্ষিণে হাভানা—কিউবা। এরই মধ্যিখানে ছোট্ট দ্বীপ



সোনা-রূপো বোঝাই স্প্যানিশ গ্যালিয়ন যেখানে ডুবেছিল সাড়ে তিনশ বছর আগে।

কেইস্যাল। তাকিয়ে দেখুন ক্যাপ্টেন, এই কেইস্যাল দ্বীপের একপাশে নিকোলাস চ্যানেল, অন্য পাশে স্যানটারিন চ্যানেল। আর কেইস্যাল দ্বীপের পূর্বে বেশ কিছু দূরে ঐ দেখুন অ্যানড্রুজ আইল্যাণ্ড। এসব ছবি নিশ্চয়ই আপনার জানা ক্যাপ্টেন, কারণ জাহাজ তো এইসব চ্যানেল দিয়েই যাতায়াত করে।

—হ্যাঁ মিস্ ম্যাকহোলি। এসব তো কিছু নূতন ব্যাপার নয়। তবে আপনি এমন কি থ্রিলিং ব্যাপার বলতে চান ?

—বলছি ক্যাপ্টেন। তবে মনে রাখবেন ব্যাপারটা গোপনীয়। বে-অফ-ফ্লোরিডা থেকে উত্তর-পশ্চিমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অজস্র ছোট-ছোট দ্বীপ, এগুলোকে বলে টেন-থাউজেণ্ড আইল্যাণ্ড, তাতো জানেন ?

—হ্যাঁ। তা জানি।

ফ্লোরিডা-কিইস্ আর তার চারপাশের জায়গা জুড়ে সমুদ্র চলাচল পথের এত বাধা বিঘ্ন আছে যে বহু জাহাজ এই জায়গার মধ্যে ডুবে গেছে। এই দেখুন, সেই সব ডুবে যাওয়া জাহাজের নাম, আর এই তাকিয়ে দেখুন, সেইসব জাহাজের কোনটা মনুষ্যবাহী, আর কোনটা মালবাহী জাহাজ।

—বাঃ, খুব খেটে খুটে সব তথ্য তৈরী করেছেন তো। তা এতে থ্রিলিং তো কিছু দেখছি না। আজ পঁচিশ বছর জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে ঘুরছি। জাহাজ ডুবির ঘটনা আমাদের কাছে নূতন কিছু নয়।—হালকা গলায় বলেন ক্যাপ্টেন মিল ফিশার।

—ঠিক। সবাই এই ঘটনাকে এমনি সহজ ভাবেই দেখেছে। কিন্তু দেখুন ক্যাপ্টেন, কোন মালবাহী জাহাজে কি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তার লিষ্টটাকে। ভাল করে ব্যাপারটা লক্ষ্য করুন।—লিষ্টটা ক্যাপ্টেন ফিশারের হাতে তুলে দেয় ম্যাকহোলি।

মিল ফিসার লিষ্টটার দিকে নিবিষ্টভাবে তাকিয়ে থাকেন। হঠাৎ বিস্ফারিত হয়ে যায় চোখ ক্যাপ্টেনের। —মাই গড্! একি! একি দেখছি আমি!

—ইয়েস ক্যাপ্টেন, এবার বুঝেছেন থ্রিল কোথায় লুকিয়ে আছে?—ধীর গলায় বলে মিস ম্যাকহোলি।

মিসেস ডোলারিস একবার মিস ফিশারের দিকে আর একবার মিস ম্যাকহোলির দিকে তাকাল। তারপর ক্যাপ্টেনের হাত থেকে লিষ্টটা নিয়ে নিজেই দেখতে থাকেন ব্যাপারটা কি। কিছুক্ষণ পরে ডোলারিসও চেঁচিয়ে ওঠে—কি আশ্চর্য! এযে সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার।

—হ্যাঁ, ব্যাপারটা সাঙ্ঘাতিকই। আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ বছর আগে, ১৬২২ সালে, কিউবার উপকূলে স্প্যানিশ মালবাহী জাহাজ, যাকে আপনারা গ্যালিয়ন বলেন, ডুবে যায়। আর সেই মালবাহী গ্যালিয়নে যাচ্ছিল শুধু সোনার কয়েন ভর্তি বাক্স আর রুপোর বার। অর্থাৎ এক কথায় বলতে পারেন, এক জাহাজ ভর্তি সোনা-রুপো

আজ থেকে সাড়ে তিনশ বছর আগে হঠাৎই ডুবে যায় এখান থেকে একটু দূরে কিউবার উপকূলে।

—মিস ম্যাকহোলি, তাহলে দাঁড়াচ্ছে, এরই ধারে-কাছে সমুদ্রে এক জাহাজ সোনার-রুপো ডুবে আছে ?

—হ্যাঁ ক্যাপ্টেন। আমি বিস্তারিত আরও খবর নিয়ে যা জেনেছি তাতে মনে হচ্ছে সাড়ে তিনশ বছরের তালিয়ে যাওয়া সোনার কয়েনস আর রুপোর বার ভর্তি জাহাজ ফ্লোরিডা কিইসের কাছে নিকোলাস চ্যানেলের আশেপাশেই কোথাও পড়েছে। সেই জাহাজকে আজও কেউ উদ্ধার করতে পারে নি। সঠিকভাবে সার্চ করলে সেই হারানো ট্রেজারকে হয়ত আজও উদ্ধার করা যেতে পারে। কিন্তু তার জন্য চাই সমুদ্র বিষয়ে অভিজ্ঞ মানুষ, সাহসী মানুষ, থ্রিলারকে যে ভালবাসে এমন মানুষ। সেরকম কাউকে আমি এতদিন খুঁজে পাই নি ক্যাপ্টেন। কিন্তু আপনাকে দেখে—

—উম্। ব্যাপারটা ভাববার মত।—ক্যাপ্টেন গম্ভীর হয়ে ভাবতে থাকেন।

—ম্যাকহোলি, সাড়ে তিনশ বছর আগে ডুবে যাওয়া রুপো-সোনা ভর্তি জাহাজকে কেউ খুঁজতে চেষ্টা করেনি কেন ?—ডোলারিস প্রশ্ন করে মাঝখান থেকে।

—চেষ্টা হয়নি কে বলল। মাঝে মাঝে কেউ কেউ চেষ্টা করেছে বৈকি কয়েক মাস ধরে। কিন্তু জাহাজের বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখতে না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। মাঝখান থেকে খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে অনেক টাকাই খরচা হয়ে গেছে তাদের।

—ম্যাকহোলি, সব শুনে যা বুঝছি, আপনার কথামত সত্যিই যদি সোনার কয়েন আর রুপোর বার ভর্তি গ্যালিয়ন এখানে ধারে কাছে ডুবে থাকে, আর আগে অনেকে খুঁজেও তাকে পায় নি, তবে বুঝতে হবে, সেই জাহাজ সমুদ্রতল দিয়ে এদিক ওদিক কোথাও সরে গেছে। অর্থাৎ অনুসন্ধান কাজ বিস্তারিতভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চালাতে হবে।—আস্তে আস্তে কথাটা বলেন ক্যাপ্টেন মিল ফিশার।

—তাতো হবেই।—উত্তর দেয় মিস ম্যাকহোলি।

—প্রশ্ন তো থাকছে সেখানেই। সঠিকভাবে এই ডুবন্ত ট্রেজারকে যদি সত্যিই খুঁজতে হয়, তাতে যেমন সময়ও লাগবে টাকাও লাগবে। অত টাকা আসবে কোথা থেকে ম্যাকহোলি ?

এতক্ষণ চুপটি করে বড়দের বড় বড় কথাবার্তা শুনছিল নীল। সবাইকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে উঠল—বাবা, সমুদ্র-তলের ঐ জাহাজটা পেলে কত ডলার পাব আমরা ?

—আরে! তুই এমনভাবে কথা বলছিস যেন ঐ গ্যালিয়নকে আমরা উদ্ধার করেই ফেলেছি।—ছেলের পিঠে সস্নেহে হাত দিয়ে বলেন ক্যাপ্টেন মিল।

—বাঃ, অত্ত সোনা রুপো আছে, খুঁজবে না নাকি ? ভয় কি, আমিও তো আছি তোমাদের সঙ্গে।—বুক ফুলিয়ে বলে বার বছরের নীল ফিশার।

—হাঃ, হাঃ, হাঃ। হেসে উঠেন ক্যাপ্টেন। সেই হাসির সঙ্গে যোগ দেয়
ডোলারিস আর ম্যাকহোলি। নীল শুধু ভাবতে থাকে, আরে, এতে হাসির কি
আছে।

মিস বার্থ ম্যাকহোলি এর পরই নিয়ে এসেছে ক্যাপ্টেন মিল ফিশারকে নিউইয়র্কে, তার
মামা কার্ল প্যাফিনডরফের কাছে। কার্ল নিউইয়র্কের খুব বড় ব্যবসায়ী। থ্রিলিং
এইসব ধরণের কাজে মাঝে মাঝে তিনি টাকা দিয়ে সাহায্য করেন এ খবর কার্লের
ভাগ্নী মিস ম্যাকহোলি জানত। তাছাড়া ম্যাকহোলিকে খুবই ভালবাসে কার্ল।
আজই ঠিক হবে প্যাফিনডরফ ডুবো জাহাজের ট্রেজার-হান্টিং কাজে টাকা দিয়ে সাহায্য
করতে রাজী আছেন কিনা। ব্যাপারটা একান্ত গোপনীয় বলেই এমপায়ার ষ্টেট
বিল্ডিং-এর একশ তলার এই ছোট্ট রেষ্টুরেণ্টে কথা হবে ঠিক হয়েছে। ১৯৬৯ সাল
এভাবে যে রোমাঞ্চকর হয়ে উঠবে ভাবেই নি ক্যাপ্টেন ফিশার। ভাগ্যিস ছুটি পেয়েছেন।
তা না হলে আমেরিকার সেই সুদূর বে-অফ-ফ্লোরিডা থেকে নিউইয়র্কে ছুটে আসা তাঁর
পক্ষে কি সম্ভব হত ?

কার্ল প্যাফিনডরফকে নিয়ে আসে মিস ম্যাকহোলি। কথাবার্তা হয়। কথাবার্তার
শেষে ঠিক হয় ট্রেজার-সেলভোর্স নামে এক কোম্পানি তৈরী হবে। কোম্পানির মালিক
হবেন অভিজ্ঞ মেরিন ক্যাপ্টেন মিল ফিশার। কোম্পানি বাজারে শেয়ার বিক্রি করে টাকা
আনবে। তবে কার্ল পাঁচ লক্ষ ডলারের শেয়ার কিনে কোম্পানীকে শুরু করতে
সাহায্য করবে। এই পাঁচ লক্ষ ডলারের শেয়ার হবে ভাগ্নী মিস ম্যাকহোলির নামে।
কোম্পানী তৈরী হতে এই সাহায্য করছেন বলে কার্লের ভাগ্নী মিস বার্থ ম্যাকহোলি
কোম্পানীতে ক্যাপ্টেন মিল ফিশারের পরেই স্থান পাবেন।

সব ঠিকঠাক হয়ে যায়। ট্রেজার-সেলভোর্স কোম্পানির জন্ম হয় ১৯৬৯ সালের আগষ্ট
মাসে। কোম্পানির মূল মালিক ও প্রেসিডেণ্ট হন ক্যাপ্টেন মিল ফিশার। ভাইস
প্রেসিডেণ্ট হন মিস বার্থ ম্যাকহোলি। কোম্পানিতে আরও দুজন অংশীদার হন, মিল
ফিশারের বড় ছেলে রেম্যান ফিশার, আর ছোট ছেলে নীল ফিশার। মিল ফিশার
জাহাজের কাজ ছেড়ে দিয়ে নেমে পড়েন ট্রেজার হাণ্টিং-এর কাজে।
ফিশার পরিবারে নামে খুশীর হাওয়া। খুশী হন ম্যাকহোলি।

ট্রেজার সেলভোর্স কোম্পানি বাজারে শেয়ার বিক্রির বিজ্ঞাপন দিল ফলাও করে। শেয়ার
বিক্রিও হল পাঁচ লাখ ডলারের। কোম্পানির মূলধন হল মোট দশ লক্ষ ডলার।
খুশীর হাওয়া বইতে লাগল ট্রেজার-সেলভোর্স কোম্পানিতে।

এবার কোম্পানি সত্যি করে কাজে নামল অক্টোবর ১৯৬৯ সালে। কেনা হল সার্চ-
সীপ সী-ঈগল। কেনা হল সার্চ-বোট, ডাইভিং ইকুইপমেণ্টস, ওয়েরলেস সেট
ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষ। যন্ত্রপাতি, জাহাজ, বোট এইসব

জোগাড় করে আসল অপারেশনে নামল ক্যাপ্টেন ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বরে।

মিল ফিশার তার অপারেশনের সীপ সী-ঈগল ও তার দলবল নিয়ে হাজির হলেন আটলাণ্টিক সমুদ্র আর গালফ আফ মেক্সিকোর সংযোগস্থলে, ফ্লোরিডা কিইসে। সমুদ্রতলে পরীক্ষা চালাবার জন্য তিনজন অ্যাকোয়েনটস্ ডাইভারকে দলে নিলেন ক্যাপ্টেন মিল। তাছাড়া বলতে গেলে, ট্রেজার-সেলভোর্স কোম্পানির সব অফিসটাই থাকল অপারেশন সীপ সী-ঈগলেই। মিসেস ডোলারিস ফিশার, কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিস্ বার্থ ম্যাকহোলি, ছোট ছেলে বার বছরের নীল ফিশারও রইল অপারেশন সীপে। শুধু বড় ছেলে রেম্যান ও একমাত্র মেয়ে রোজারিনা রয়ে গেল নিউইয়র্কে পড়াশুনার জন্য।

ক্যাপ্টেন ফিশার কাজ শুরুর আগে কয়েকদিন তার অপারেশন টীমের সবাইকে সবকিছু বুঝিয়ে দেবার জন্য অপারেশন সীপ সী-ঈগলে ট্রেনিং ক্লাস নিলেন। ক্লাসে তিনজন মাত্র ছাত্র, তিন ডাইভার—অ্যাকোয়েনটস্, ম্যাক, স্যাণ্ডো ও জনসন।

—বন্ধুগণ, তোমরা কয়দিন পরে নিকোলাস চ্যানেল ও তার চারপাশের সমুদ্রতলে এক্সপ্লোরেশনে যাবে। তার আগে তোমরা কেন যাচ্ছ, কোথায় যাচ্ছ সেটা তোমাদের জানা দরকার। সাড়ে তিনশ বছর আগে সমুদ্রতলে হারিয়ে যাওয়া গ্যালিয়ন সম্বন্ধে কিছু বলবে আমাদের কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিস ম্যাকহোলি।

ক্যাপ্টেনের কথার মাঝে দরজায় উঁকি দেয় ছোট্ট নীল।—ড্যাডি, আমি কি গ্যালিয়নের গলপটা শুনতে পারি?

—ইয়েস্। নিশ্চয়ই। তুমি হচ্ছ ট্রেজার-সালভোর্স কোম্পানির ছোট মালিক, তোমাকে কি নিষেধ করা যায়?—মিষ্টি করে কথাটা বলে হেসে উঠে ম্যাকহোলি।

থ্যাঙ্ক ইউ আণ্ট।—টুক করে কেবিনরুমে ঢুকে একপাশে বসে পড়ে নীল ফিশার। মিস ম্যাকহোলিও শুরু করেন সাড়ে তিনশ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া সোনা-রুপো ভর্তি মালবাহী জাহাজের কাহিনী।

—বন্ধুগণ, নথীপত্র থেকে যা জেনেছি তা হচ্ছে ১৬২২ সালে স্প্যানিশ মালবাহী জাহাজ বা গ্যালিয়ন সোনার মুদ্রা ভর্তি দশটি বাক্স আর ১২০০ পিস রুপোর বার নিয়ে যেতে যেতে এরই কাছাকাছি কিউবার কিছু দূরে সমুদ্রঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে যায়। ঐ গ্যালিয়নের নাম ছিল "নিউষ্ট্রা সেনহারা-ডি-অ্যাটোচা"। যেখানে জাহাজ ডোবে সেখানে সমুদ্রের গভীরতা ছিল মাত্র ৫০ ফুটের মত। জাহাজ ডুবির মাসকয়েক পরে সেখানে ডুবুরি নামান হয়, তখন কিন্তু গ্যালিয়ন নিউষ্ট্রা-সেনহারা-ডি-অ্যাটোচার কোনও চিহ্নই পাওয়া গেল না। জাহাজ ডুবির চিহ্নও দেখতে পেল না কেউ।

এমনি ভাবেই গ্যালিয়ন অ্যাটোচা বিরাট ট্রেজার নিয়ে সমুদ্রতলে হারিয়ে গেল।—দীর্ঘ বক্তৃতার পরে নিশ্চুপ হল মিস ম্যাকহোলি।

—জাহাজ যে ডুবে গেছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাহলে, এমনভাবে জাহাজ সমুদ্রতলে হারিয়ে গেল কি করে?—প্রশ্ন করেন ক্যাপ্টেন ফিশার।

তিনজন অ্যাকোয়েনট-সমুদ্র ডাইভার—ম্যাক, স্যাণ্ডো, জনসন চুপ করে থাকে।

—মিস ম্যাকহোলি, তোমার কোনও মতামত আছে এই ব্যাপারে? নিউষ্ট্রা-সেনহারা-ডি-অ্যাটোচাকে কেন পাওয়া গেল না হাভানার উপকূলের সমুদ্রতলে?

—না স্যার, এ ব্যাপারে কোন আন্দাজই নেই। নিয়মমত কিছু কিছু চিহ্ন তো পাওয়া উচিত ছিল।

—ঠিকই ম্যাকহোলি। বিগত সাড়ে তিনশ বছরে অনেক দলই এই ডুবো জাহাজ ডি অ্যাটোচাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারে নি। আর সেই জন্যই এইবার আমি আমার তিনজন অ্যাকোয়েনট ডাইভার বন্ধুকে নিয়ে সমুদ্রে নামব।

—সে কি ক্যাপ্টন মিল! এই বয়সে সমুদ্রে ডাইভিংএ যাওয়া কি ঠিক হবে?—উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে মিস ম্যাকহোলি।

—কি দরকার তোমার সমুদ্রে যাবার? ম্যাক-স্যাণ্ডো-জনসনরাই তো তোমার কথামত সমুদ্রতলে পরীক্ষা চালাতে পারে।—উদ্বিগ্ন মিসেস ডোলারিস ফিশার।

—কি মজা! ড্যাডি সমুদ্রে ডাইভিংএ যাবে। কোনও ভয় নেই ড্যাডি। তুমি যাও, তোমার কিচ্ছু হবে না। আমি সী-ঈগল পাহারা দেব।—উত্তেজিত ছোট্ট নীল ফিশার।

—এইটুকু বাচ্চা ভয় পাচ্ছে না, তোমরা শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ।—হেসে উঠেন ক্যাপ্টেন ফিশার।

—আমরা তো কচি বাচ্চা নই যে যা মনে হবে তাই বলব। সমুদ্রতলের বিপদের কথা কতটুকু জানে নীল?—বেশ রেগেই যান মিসেস ডোলারিস।

—এ-ই, আবার! আমাকে কচি বাচ্চা বলা?—ধমকে উঠে বার বছরের নীল ফিশার।

—স্যরি। সত্যিই তো, তুমি কচি বাচ্চা হবে কেন?—ক্যাপ্টেন কথাটা বলে হাসতে থাকেন।—দেখ, তোমরা নেহাতই ভয় পাচ্ছ। ডোলা, তুমি তো জান, অ্যাকুয়েনটস্ হিসাবে আমি কম দক্ষ নই। তাছাড়া আমার সঙ্গে তো থাকছে আমার তিন সঙ্গী ম্যাক-স্যাণ্ডো-জনসন।

—ওদের বয়স কম, তাই সমুদ্রতলে ওরা যত সহজে চলাফেরা করবে, তোমার এই পঞ্চাশ বছর বয়সে তুমি কি তা পারবে?—ক্যাপ্টেনকে বোঝায় ক্যাপ্টেনের স্ত্রী ডোলারিস।

—আপনিই বলুন, পঞ্চাশ বছরে কোনও অ্যাকুয়েনটস্ সমুদ্রতলে যায় ?—কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট, জিওলজিস্ট মিস ম্যাকহোলি কথাটা বলেন।

—তোমাদের উদ্বেগের কারণ বুঝতে পারছি। জানি, সমুদ্রতলে যাওয়া মানে মাঝে মাঝে সমুদ্রতলের জীবদের সঙ্গে মোকাবিলা করা। সেই মোকাবিলার জন্য শক্তি চাই, চাই সমুদ্রতলে থাকার মত শারীরিক ফিটনেশ। জানি, বয়স হয়েছে বলে এসবের কিছুটা কমতি হয়েছে আমার, কিন্তু তবুও ক্যাপ্টেন ফিশার অথর্ব হয়ে যায়নি। বরং উঠতি আজকালকার অ্যাকুয়েনটস্‌দের চেয়ে খারাপ হব না আমি।

—কিন্তু স্যার, আপনার সি-বটমে যাওয়া কি একান্তই দরকার? আপনি যতই বলুন, সমুদ্রতলের বিরাটাকার হাঙ্গর, তিমি, ল্যানটার্ন-ফিস্, ভাইপার ফিস, পেল্লাই দাড়া-ওয়ালা চিংড়িরা প্রতি মুহূর্তেই আপনাকে বিপদে ফেলবে। আপনিই বলুন, ব্যাপারটা চিন্তার নয় কি ?

—ইয়েস্ ম্যাকহোলি, ব্যাপারটায় ঝামেলা আছে, বিপদ আছে জানি। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবত সবকিছু। ১৬২২ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল, অর্থাৎ এই ৩৪৭ বছর সময়টা তো খুব কম নয়। কম লোক তো এই জাহাজ উদ্ধারের ব্যাপারে চেষ্টা চালায় নি। কিন্তু তোমরাই বল, কেউ কেন হদিস পেল না ডুবন্ত ডি-অ্যাটোচার ? ম্যাজিকের মত সোনা-রুপো ভর্তি ঐ গ্যালিয়ন ডি-অ্যাটোচা তো উবে যেতে পারে না, কিংবা হারিয়েও যেতে পারে না।

—নাঃ, উবেও যায় নি, হারায়ও নি, এটা ঠিক। সমুদ্রতলে ডি-অ্যাটোচা কোনও ভাবে চাপা পড়ে যেতে পারে তো।

—ম্যাকহোলি তোমার আন্দাজ কিছুটা তো ঠিকই। ব্যাপারটা নিয়ে আমিও ভেবেছি। তবে জিওলজিস্ট হিসাবে তোমার মতামতের দামও কম নয় এই ব্যাপারে।

—ক্যাপ্টেন, বে-অফ-ফ্লোরিডা থেকে হাভানা পর্যন্ত সমস্ত জলপথ আমি ভালভাবে বারবার ঘুরেছি। নিকোলাস-চ্যানেল, অ্যানটারিন চ্যানেল দুটোই পরীক্ষা করেছি। এই দুই জায়গাতেই বায়ুপ্রবাহ অত্যাধিক। জলে ঘূর্ণিও আছে। তাই এইসব জায়গায় জাহাজ ডুবি হলে সমুদ্রতলে ড্র্যাগড্ হয়ে কিছু দূরে সরেও যেতে পারে। কিংবা, কোনওভাবে সমুদ্রতলে বালি মাটিতে চাপাও পড়ে যেতে পারে।

—রাইট ম্যাকহোলি। সমুদ্রতলে অনেক কিছুই হতে পারে। কিন্তু কি হতে পারে তার প্রারম্ভিক ছবিটা জানবার জন্যই সমুদ্রতলে আমার যাওয়া দরকার।

—ট্রেজার স্যালভোর্স কোম্পানির প্রেসিডেন্টকেই তা জানতে হবে? তার তিন অ্যাকোয়েনটসরা কি অপদার্থ ?—এবার বেশ রেগেই যান মিস্ ম্যাকহোলি।

—নাঃ, নাঃ, ম্যাক স্যাণ্ডো-জনসন কেন অপদার্থ হবে। শুধু আমাদের পরীক্ষার কাজ খুব দ্রুত হওয়া দরকার। ম্যাকহোলি, তোমার মামা পাঁচ লাখ ডলার আমাদের কোম্পানিতে ঢেলেছেন। শেয়ার হোল্ডারদের পাঁচ লাখ ডলার আছে এই

কোম্পানিতে। বুঝছ না কেন ম্যাকহোলি, এত টাকার রিস্ক যেখানে, সেখানে ধীরে-সুস্থে, ভেবে-চিন্তে কাজ করার সময় কই? আমাকে ডেয়ারিং হতেই হবে।

—ম্যাকহোলি, তুমি ক্যাপ্টেনকে বাধা দিও না। মনে রেখ, ও সাকসেসফুল না হলে শুধু ট্রেজার স্যালভোর্স কোম্পানিই ডুবে যাবে তা নয়, আমরা, তুমি, সবাই পথের ভিখারী হয়ে যাব।—সমস্ত ব্যাপারটা উপলব্ধি করে বলে ডোলারিস ফিশার।

—ঠিকই ডোলারিস, বাঁচার জন্যই এই ডেয়ারিং অ্যাটেমপট। নিজে সমুদ্রতলে গিয়ে দেখতে চাই কেন হারিয়ে গেল সমুদ্রতল থেকে স্প্যানিশ গ্যালিয়ন নিউস্ট্রা-সেনহারা ডি-অ্যাটোচা।

দীর্ঘ বাদানুবাদের পর সী-ঈগলের ক্যাপ্টেনের কেবিনে নিস্তব্ধতা নামে। কিন্তু বোঝা যায় ডোলারিস ও ম্যাকহোলির দুজনের মুখেই উদ্বিগ্নতা।

—হ্যাঁ, এবার কাজের কথায় আসা যাক। আমি মাত্র একদিন বা দুদিন সমুদ্রতল ষ্টাডি করব। কতটা জায়গা জুড়ে পরীক্ষা করব আমরা প্রথমে সেটা ঠিক করব। তারপর সমুদ্রতলের ঐ অনুসন্ধানের জায়গাটাকে ছোট ছোট এরিয়ায় ভাগ করে নেব। তারপর ঐ ছোট এরিয়া যাকে আমরা বলব গ্রীড, তাকে বিশেষ নামে চিহ্নিত করব। তারপর এক একটি গ্রীড থাকবে এক একজন অ্যাকোয়েনটসের অধীনে। সমস্ত ছোট ছোট এই গ্রীড-এরিয়ার ছবি যেই পেয়ে যাব তখন আমরা সমুদ্রতল অনুসন্ধানের জায়গার চেহারাটা কি বুঝতে পারব। তারপর ঠিক করব এর পরে কি করা দরকার। কি ম্যাক, স্যাণ্ডো, জনসন, আমার প্রাথমিক কাজের ছবিটা তো বুঝলে?

—ইয়েস ক্যাপ্টেন। কিন্তু নীচে গিয়ে একদিন দুদিন আপনি থাকবেন, ফলে আপনার সঙ্গে তখন যোগাযোগ থাকবে। কিন্তু তারপর?—প্রশ্নটা করে ম্যাক গ্রভেন, তিন অ্যাকোয়েনটসের একজন।

যোগাযোগ সব সময়েই তোমাদের তিনজনের সঙ্গে আমার থাকছে। প্রথম দিকে তোমাদের সবার সঙ্গেই থাকছে মিনি ওয়ারলেসে। সেই ওয়ারলেসের সংযোগ থাকবে মাষ্টার সীপ এই সী-ঈগলের সঙ্গে। মাষ্টার সীপ থাকবে আমার কণ্ট্রোলে। এরপর তোমাদের তিনজনের জন্য আলাদা সার্চ-ভেসেল থাকবে। তখন, সার্চ-ভেসেলের সঙ্গে সংযোগ থাকবে মাষ্টার-সীপ সী-ঈগলের। মনে রাখতে হবে, খুব দ্রুততালে এই ডি-অ্যাটোচা জাহাজকে খুঁজে বার করতে হবে। তা না হলে আমাদের পুঁজিতে ঘাটতি ঘটবে, তখন এই সার্চের কাজ হয়ত মাঝপথেই বন্ধ করতে হবে।

—স্যার, প্রোগ্রাম যখন ছকেই ফেলেছেন তখন শুধু শুধু সমুদ্রতলে আপনি যাচ্ছেন কেন? আপনি আমাদের ভরসা করতে পারেন।—অ্যাকোয়েনট স্যাণ্ডো ফ্রেজার বলে।

—ভরসা নিশ্চয়ই তোমাদের করি স্যাণ্ডো। শুধু শুধুই সমুদ্রতলে যাচ্ছি ভাবছ? নাঃ, তা নয়। সমুদ্রতলে না গেলে বুঝব কি করে আমাদের সমুদ্রতলের এক্সপ্লোরেশন এরিয়াকে কটা ভাগে ভাগ করতে হবে। সমুদ্রতলে যেখানে পাহাড় থাকবে, সেখানে ষ্টাডি এরিয়া ছোট হবে। আর যেখানে সমুদ্রতল সমতলে থাকবে, সেখানের গ্রীড এরিয়া বড় হতে পারে।

—সেটা কি আমরা ঠিক করতে পারি না ক্যাপ্টেন? স্যাম জনসন, তৃতীয় অ্যাকোয়েনট কথাটা না বলে পারে না।

—এ ব্যাপারটা আমি নিজের হাতেই রাখতে চাই জনসন। তোমাদের ভরসা করি না, তা নয়। এর কারণ আমি সঠিক পদ্ধতিতে, ধাপে ধাপে এগুতে চাই। খাপছাড়া ভাবে আগের দলরা কাজ করেছিল বলেই তারা ডি-অ্যাটোচার কোনও হদিস করতে পারেনি। কিন্তু আমার কাজ হবে সঠিক ধাপে ধাপে। মনে রাখতে হবে একটা কথাই, ডুবন্ত জাহাজ ডি-অ্যাটোচা ম্যাজিকে মিলিয়ে যেতে পারে না। আছে, নিশ্চয়ই আছে। বে-অফ-ফ্লোরিডা থেকে হাভানার উপকূল, এর মাঝে, বা ধারে-কাছে কোথাও। ডুবে যাওয়া গ্যালিয়ন নিউষ্ট্রা-ডি-অ্যাটোচাকে আমি খুঁজে বার করবই।

—বন্ধুগণ, আগামীকাল আমরা সমুদ্রতলে প্রথম নামছি ট্রেজার হাণ্টিং-এর জন্য, হারিয়ে যাওয়া গ্যালিয়ন ডি-অ্যাটোচাকে খুঁজে বার করার জন্য। সমুদ্রতলে যাওয়ার আগে বে-অফ-ফ্লোরিডা আর হাভানা উপকূলের মাঝখানের সমুদ্র ও তার চারপাশের চেহারাটা ভাল করে বুঝে নাও। টেবিলের উপরে খুলে ধরেন ক্যাপ্টেন মিল ফিশার ফ্লোরিডা-কিইস এরিয়ার ম্যাপ। ছবির দিকে তিন অ্যাকোয়েনটসু ঝুঁকে পড়েন।

—দেখছ, ঝামেলাটা কোথায়? দুধারের মহাদেশীয় কণ্টিনেণ্টাল অঞ্চলের পরেই কণ্টিনেণ্টাল সেলফ। তারপরই শুরু হয়েছে মহাদেশীয় ঢাল অর্থাৎ কণ্টিনেণ্টাল স্লোপ। দুই মহাদেশীয় ঢালের মাঝখানেই আছে সমুদ্র।

সমুদ্রপ্রান্তের ভূখণ্ড থেকে বৃষ্টি-ধোয়া জল নেমে আসে কণ্টিনেণ্টাল সেলফে। তারপর কণ্টিনেণ্টাল সেলফের প্রান্তে এসে ঝর্ণাধারার মত উপর থেকে মহাদেশীয় ঢাল বেয়ে নেমে আসে অগভীর সমুদ্রাঞ্চলে। এই প্রবাহিত জলধারা মাটিও বয়ে নিয়ে আসে আর সমুদ্রতলেই তা জমা হয়। ফলে ঐ সমুদ্রতলে পড়ে থাকা বহু কিছুই ঢাকা পড়ে যায়। বুঝেছ, এভাবে হয়ত ডি-অ্যাটোচা ঢাকা পড়ে যেতে পারে।

—বুঝেছি স্যার। তিন অ্যাকোয়েনট বলে উঠে।

—অন্য কারণও থাকতে পারে কিন্তু। সমুদ্রঝড়ে, ভূমিকম্পেও উলট-পালট হতে পারে। তার ফলে সমুদ্রের বুকে ডি-অ্যাটোচা আরও বসে যেতে পারে। সমুদ্রঝড়ে সমুদ্রবুক থেকে দূরে হিচড়ে সরে যেতে পারে। এমনিতর অনেক কিছুই হতে পারে। ঠিক

কি হয়েছে তা বার করাই হবে আমাদের প্রথম কাজ। বুঝেছ তোমরা? সেটাই যাচাই করব আমি।

—ইয়েস ক্যাপ্টেন।

—আমার শেষ উপদেশ, সমুদ্রের বুকে কত গভীরে যাচ্ছ চট্ করে জানতে হলে খেয়াল রাখবে সামুদ্রিক জীবের উপর। এক এক গভীরতায় এক এক ধরণের জলজপ্রাণী থাকে। কোন গভীরতায় কোন জলজপ্রাণী থাকে তা এই ছবি থেকেই জানতে পারবে। বলেই টেবিলে স্কেচটা বিছিয়ে দেন ক্যাপ্টেন ফিশার। তিন অ্যাকোয়েনট, ম্যাক-স্যান্ডো-জনসন ভালভাবে ছবিটা দেখে নেয়। বেশী গভীরে যাবার আগে দেখে নিও তোমার অক্সিজেন ভান্ডার কত থাকছে।

পরের দিন সকালেই ডুবন্ত সমুদ্রযান টেকটাইটকে জলে নামানো হোল। সিলিন্ড্রিক্যাল ধাতব পদার্থে মোড়া টেকটাইট ধীরে ধীরে সমুদ্রতলে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল। টেকটাইটের বাইরের সাদা রঙের আকর্ষণে বিচিত্র চেহারার নানান্ মাছেরা এসে টেকটাইটের গায়ে এসে ঠোক্কর মেরে দেখতে লাগল এই বস্তুটা কি? নতুন ধরণের জন্তু নাকি? টেকটাইটের ভিতরে বসে অবসারভিং হোল দিয়ে ক্যাপ্টেন ফিশার আর তার তিন সঙ্গী অ্যাকোয়েনটস এসব লক্ষ্য করছিল।

সমুদ্রতলে টেকটাইট এসে স্থির হয়ে দাঁড়াতেই ক্যাপ্টেন ফিশার সী-ঈগলের সঙ্গে ওয়ারলেশ যোগাযোগ চালু করলেন।

—সী-ঈগল? সী-ঈগল?—সমুদ্রতল থেকে শব্দতরঙ্গ ধ্বনিত হোল সী-ঈগলের ওয়ারলেশে।—বুপ—বুপ—বুপ।

—সী-ঈগল স্পীকিং। ম্যাকহোলি স্পীকিং।

—সী-বেড থেকে ক্যাপ্টেন ফিশার বলছি। সী-ঈগলের সব ঠিক আছে?

—ইয়েস ক্যাপ্টেন। হ্যালো ক্যাপ্টেন, মাষ্টার নীল কথা বলতে চায়।

—ম্যাকহোলি, ওকে লাইন দাও। হ্যালো নীল?

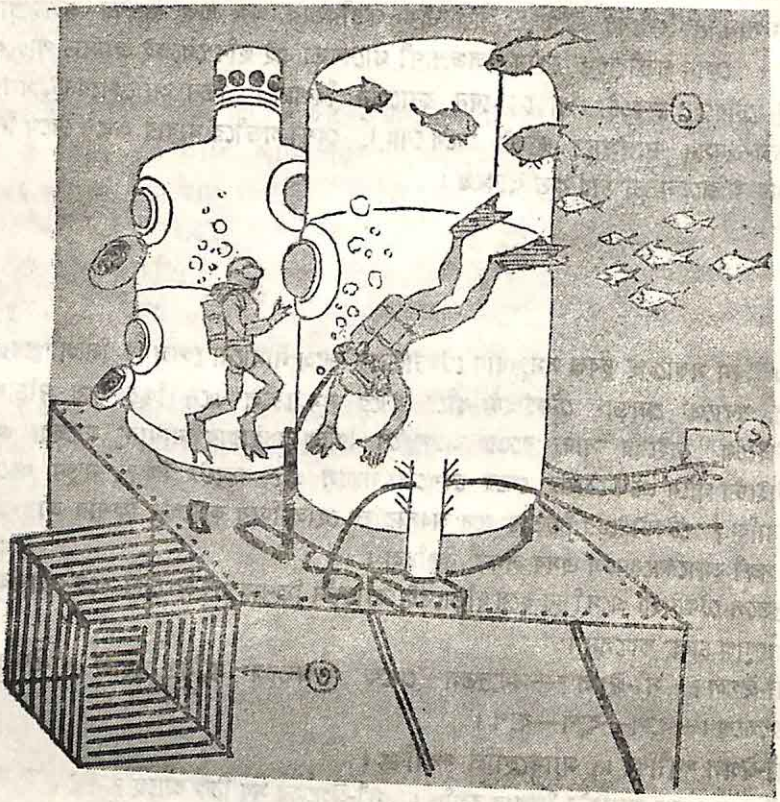
—ড্যাডি, নীল বলছি। কেমন মজা লাগছে সমুদ্রের তলে? আহ্! আমি যদি যেতে পেতাম।

—বড় হও, তখন আসতে পারবে। দুষ্টুমি কর না। মামির কথা শুনে চলবে।

—ড্যাডি, কিচ্ছু ভেব না। মামি, আণ্টিকে আমিইতো খেয়ালে রাখছি। সী-ঈগলের উপর নজর রাখছি। তুমি কিন্তু নীচে ভয় পেও না।

—থ্যাঙ্ক ইউ সান।—মিষ্টি হেসে ওয়ারলেস কানেকশন অফ করেন ক্যাপ্টেন ফিশার। এবার টেকটাইট থেকে ক্যাপ্টেন ফিশার বাইরে এলেন ম্যাককে নিয়ে। দুজনেই

গায়ে ওয়েট-ডাইভিং স্যুট। পিঠে ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা অ্যাকুয়েলাংগ। অ্যাকুয়েলাংগের সিলিণ্ডারে ভর্তি অক্সিজেন। ইলেসটিক পাইপ সংযোগ রয়েছে পিঠের ঐ অক্সিজেন সিলিণ্ডারের সঙ্গে মাউথপিসের।



ডুবন্ত সমুদ্রযান টেকটাইট।

(১) টেকটাইটের সাদা রঙের বর্হিগাত্রে মাছেরা এসে ঠোকর মারছে। (২) এই পাইপ ও কেবল বাতাস জল ও বিদ্যুত বহন করে। (৩) হাঙ্গর দেখলে ডুবুরীরা এই খাঁচায় ঢুকে যায়। টেকটাইট থেকে ডুবুরীরা বেরুবার সময় ভেজা স্যুট ও অ্যাকুইলাগস্ ব্যবহার করে। টেকটাইট সমুদ্রতলে ১৫ মিটার গভীরে চলে যেতে পারে।

—ম্যাক, অ্যাকুয়েলাংগ, ড্রেস, সব ভাল করে চেক্ করে নাও। দেখ, সব ভালভাবে ফিট করেছ কিনা।

—ইয়েস স্যার। সব চেক আপ করা আছে।

—অ্যাকুয়াল্যাগে অক্সিজেন খুব বেশী থাকে না বলে জরীপ এরিয়ার-গ্রীড ছোট হবে। এর ফলে একঘণ্টাতেই এরিয়াটা দেখে আসা যাবে। ফলে কোনও বিপদের ভয় থাকবে না। ও-কে ?

—ও-কে ক্যাপ্টেন।

—কম্পাস আর ডটোগ্রাফ এনেছ ? কম্পাস দেখে আমরা উত্তর দিক থেকে পরীক্ষা শুরু করব। তারপর পূব-দক্ষিণ-পশ্চিম হয়ে ফিরে আসব আবার উত্তরে। এইভাবে এক একটি গ্রীড ষ্টাডি শেষ করব এক ঘণ্টায়। আর এই সময়েই ডটোগ্রাফ প্ল্যাষ্টিক-সীটে পয়েণ্টার পাঞ্চিং করে জায়গাটার নক্সা তৈরী করে ফেলবে। এইভাবে এক একটা গ্রীডের নক্সা তৈরী হলে, সমুদ্রতলের প্রয়োজনীয় জায়গার নক্সাটা তৈরী হবে। সিস্টেমটা তো বুঝলে ম্যাক।

—ইয়েস স্যার।

—চল, এবার শুরু করি জরীপের কাজ।—ক্যাপ্টেন ফিশার আর ম্যাক জরীপের কাজ শুরু করে দেয়।

ঘণ্টাখানেকের পরে ফিশার আর ম্যাক ফিরে আসে টেকটাইটে।

সমুদ্রতলে টেকটাইটের ভিতরে বসে কফি খেতে খেতে ফিশার বলে—দেখলে ম্যাক, স্রেফ সমতলভূমি ছাড়া কিছু দেখতে পেলাম না। যদি জাহাজ মাটি-নুড়িতে ঢেকেও থাকত, তবে তো উঁচু ঢিবির মত কোনও জায়গা দেখতে পেতাম। কিন্তু কৈ, সেরকম জায়গা পেলাম কৈ ?

—ক্যাপ্টেন, সবে তো ষ্টাডি শুরু করেছি। তাও একটা ছোট্ট গ্রীড ধরে। সমস্ত এরিয়া জরীপ হলে ভাল খবরও পেতে পারি।

—ম্যাক, লেট আস হোপ সো। দেখা যাক্, সেরকমটি হয় কিনা।

দুপুরের লাঞ্চের পর, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পরে স্যাণ্ডোকে নিয়ে রওনা হল ক্যাপ্টেন ফিশার। রওনা হবার সময় ম্যাককে বলে যান—যেটুকু এরিয়া তোমাকে বলেছি, সেটুকু এরপর তুমি কভার কর। বিকেলে এসে খবর নেব কি রেজাল্ট হোল তোমার।

ফিশার ও স্যাণ্ডো অন্যদিকের গ্রীডে জরীপের কাজ শুরু করে। বিকেলে যখন মিক-স্যাণ্ডো আবার জমায়েত হোল টেকটাইটে, তখন দুজনের মুখেই হতাশার ছাপ। এমন কিছুই দেখতে পায় নি তারা যাতে ডি-অ্যাটোচা জাহাজের খবর তারা বার করতে পারে।

দ্বিতীয় দিনে ম্যাক, স্যাণ্ডো আলাদা আলাদা ভাবে বেড়িয়ে পড়ে ডুবুরীর পোষাক পড়ে। আজকে জনসনকে নিয়ে চলেন ফিশার। জনসন কোন জায়গা জরীপ

করবে দেখিয়ে দেন ক্যাপ্টেন ফিশার। কিভাবে জরীপ হবে তাও বুঝিয়ে দেন ক্যাপ্টেন।

দ্বিতীয় দিনও কেটে যায় হতাশায়। সমুদ্রতল নেহাতই মসৃণ, সামান্য উচু-নীচু সমতল ছাড়া আর কিছু নয় দেখতে পায় তিন অ্যাকুয়েনট। সমুদ্রতলে তারা শুধু দেখেছে মরা মাছ ও সামুদ্রিক জলজ গুল্মের ধ্বংসাবশেষ মাঝে মাঝে জমাট বেঁধে উঁচু ঢিবির সৃষ্টি করেছে। অত্যাশ্চর্য ধরণের আর কোন উঁচু ঢিবি তাদের চোখে পড়ে নি।

তৃতীয় দিনে ক্যাপ্টেন ফিশার থেকে যান টেকটাইটে। ম্যাক-স্যান্ডো-জনসন তিনজনে পৃথকভাবে বেরিয়ে পরে তিন দিকে। নাঃ, এ বেলাতেও কোনও উত্তেজক খবর পেল না। হতাশা নিয়ে ফিরে এল বিকেলে টেকটাইটে।

সেদিন রাত্রে ডিনার টেবিলে বসে ক্যাপ্টেন ফিশার বলে,—মাই বয়েস, দেখলে তো, এই তিনদিন সী-ফ্লোর সার্ভে করে তেমন কিছুই পেলাম না। তবুও তোমরা সমস্ত জায়গাই জরীপ কর, ঠিক যেভাবে ছবিতে বুঝিয়েছি, সেভাবেই। আমার ধারণা, কিছু না কিছু আমরা দেখতে পাবই।

হতাশার মধ্যেও এই কথাই ঐ তিন ডুবুরীকে আশার বাণী শোনায়। ক্যাপ্টেন ফিশার চতুর্থ দিন সকালে ফিরে আসেন মাষ্টার-সীপ সী-ঈগলে। আর তিন অ্যাকুয়েনট ম্যাক-স্যান্ডো-জনসন থেকে যায় সমুদ্রতলে টেকটাইটের মধ্যেই।

একমাসের দীর্ঘ পরীক্ষা চলে সমুদ্রতলে। গ্রীড সার্ভে শেষ করে ম্যাক-স্যান্ডো-জনসন। বে-অব-ফ্লোরিডা থেকে হাভানার উপকূল পর্যন্ত সমুদ্রতল জরীপ শেষে তার ছবিও তৈরী করে তারা। তিন অ্যাকোয়েনট ফিরে আসে সী-ঈগলে। সী-ঈগলে বসে ট্রেজার-স্যালভোর্সের মিটিং। মিটিং-এ উপস্থিত ক্যাপ্টেন ফিশার, মিস ম্যাকহোলি, মিসেস ডোলারিস, তিন অ্যাকোয়েনট ম্যাক-স্যান্ডো-জনসন। মাষ্টার নীলও উপস্থিত সেখানে। শুরু হয় মিটিং।

—অ্যাকোয়েনটস্ বন্ধুরা, তোমাদের কঠিন পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ। সমুদ্রতল জরীপ করে সমুদ্রতলের অবস্থা সম্বন্ধে তোমাদের মতামত কি?

—ইয়েস ক্যাপ্টেন, আমিই বলি, কারণ জরীপ কাজ প্রথমে আমাকে দিয়েই আপনি শুরু করেন। বে-অফ-ফ্লোরিডা আর হাভানার মাঝখানে ছোট বালিয়ারী স্তূপ কেইস্যাল-ব্যাঙ্ক থাকায় সমুদ্রতলে মাটি-নুড়ির স্তর জমেছে মোটা হয়ে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছুই নজরে আসেনি। সমুদ্রতল নেহাতই সাদামাটা সমতলভূমি মনে হয়েছে। ম্যাক আস্তে আস্তে গুছিয়ে বলে কথাগুলো।

—তাহলে সাড়ে তিনশো বছরের সেই স্প্যানিশ গ্যালিয়ন, সোনা-রুপো নিয়ে সমুদ্রতল দিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল? সোজা প্রশ্ন ক্যাপ্টেন ফিশারের।

—আচ্ছা স্যার, এমনও তো হতে পারে, জাহাজটা হয়ত এই জায়গার মধ্যেই ডুবেছে,

কিন্তু পরে সমুদ্রস্রোতে ধাক্কা খেয়ে অন্য জায়গায় সরে গেছে।

—জনসন, কথাটা সম্ভব হতেও পারে। কিন্তু অতবড় ওজনভর্তি জাহাজকে সমুদ্রতল থেকে সরানো কি চাট্টিখানি কথা। নড়তে পারে, সরতে পারে গ্যালিয়ন। কিন্তু কতটুকু দূর পর্যন্ত, সেটা ভাব। একমাইল—দুমাইল সরে যাবে?

ক্যাপ্টেন ফিশারের কথায় তিন অ্যাকোয়েনট মুখ চাওয়া-চাওই করে। অন্যরা চুপ করে বসে থাকে নিথর মুখে। শুধু নিরুদ্বিগ্ন ক্যাপ্টেন ফিশার। আর ভ্রূক্ষেপহীনভাবে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে মাষ্টার নীল ফিশার।

—বন্ধুরা, হতাশায় ভেঙে পড়লে চলবে না। মনে রেখ, সাড়ে তিনশ বছরে যে ট্রেজার উদ্ধার করা যায় নি, তা কি মাত্র কয়েক মাসে উদ্ধার হবে? প্লিইজ, ব্যাপারটা নিয়ে সবাই চিন্তা কর, ভাব। নিউষ্ট্রা-সেনহারা-ডি-অ্যাটোচা ম্যাজিকের মত উবে যেতে পারে না। আছে, সমুদ্রতলেই কোথাও আছে। কিন্তু জায়গাটা কোথায়?

ক্যাপ্টেন ফিশারের প্রশ্নে সবাই ওর মুখের দিকে তাকায়।

হঠাৎ আচমকা কথা ভেসে আসে—আমি বলব, কোথায়?

মাষ্টার নীলের কথায় সবাই অবাক হয়ে তাকায় ওর দিকে। ক্যাপ্টেন বলে—তুই পুঁচকে ছেলে, তুই কি বলবি রে?

—ড্যা-ডি। বলিনি, আমাকে বাচ্চা ছেলে, পুঁচকে ছেলে, এসব বলবে না। আমি হচ্ছি মাষ্টার নীল। জাহাজ কোথায় পাবে জান?

—কোথায়? অবাক হয়ে যান ক্যাপ্টেন, নীলের গম্ভীরভাবে বলা কচিকণ্ঠের ভঙ্গীতে।

—যেখানে জাহাজ ডুবেছে, জাহাজ সেখানে নেই। যেখানে সবাই খুঁজছে, সেখানেও জাহাজ নেই।

—তবে। সত্যি এবার অবাক হন ক্যাপ্টেন ফিশার। বলেন—তবে কোথায় পড়ে আছে জাহাজ?

—অত্ত ভারী জাহাজ, মাটির মধ্যে ঢুকে গেছে না। মাটি না খুঁড়লে তাকে পাওয়া যায়? তোমরা তো সব বুদ্ধু। হাঃ, হাঃ—হেসে উঠে মাষ্টার নীল।

নীলের কথায় ভ্রূ কুঁচকায় ক্যাপ্টেন ফিশার। কিছু পরে স্মিত হাসি ফুটে উঠে মুখে। তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বুকে জড়িয়ে ধরে মাষ্টার নীলকে। বলে—ওয়েল সান। ভাল পয়েণ্ট দিয়েছিস। ইয়েস, ইয়েস। ডি-অ্যাটোচা সমুদ্রবেডের নীচে বসে যেতে পারে। পারে কেন, তাই-ই হবে।

১৯৭১ সালের শুরুতেই ক্যাপ্টেন ফিশার নূতন ভাবে কাজ শুরু করলেন। ক্যাপ্টেন ফিশার বললেন,—দেখ, বাচ্চা ছেলে নীলের কথাটা হালকাভাবে আমি নিতে চাই না। সত্যিই, সী-বেড ড্রিল করে দেখা দরকার। ড্রিলিং হবে সী-বেডের দশ থেকে পনের মিটার গভীরতা পর্যন্ত।

—ক্যাপ্টেন, কাজটা ঠিক কোথা থেকে শুরু হবে ?—প্রশ্ন করে ম্যাক।

—ফ্লোরিডা কিইস থেকে হাভানা উপকূল পর্যন্ত সব জায়গাতেই চলবে ড্রিলিং। তোমাদের তিনজনের গ্রীড এরিয়াতেই একে একে ড্রিলিং চলবে।

—স্যার, সেতো বিরাট খরচার ব্যপার !—অবাক গলায় বলে স্যাণ্ডো।

—ট্রেজার খোঁজা সহজ কাজ নয় স্যাণ্ডো। এর জন্য ধৈর্যও চাই, অর্থও চাই। কাজটা দ্রুতও করা দরকার যাতে ট্রেজার বেহাত হয়ে না যায়। তাছাড়া বহুবারই বলেছি, সঠিক ধারায় অনুসন্ধান কাজ চালাতে হবে। শুধু ডুবুরী নামলেই কোন কাজ হয় না। অন্যেরা এই কারণেই বিফল হয়েছে।

এবারের কাজ চলল খুব ধীরে ধীরে। তিন মাসে বাইশটা ড্রিলিং হোল প্রথম গ্রীডে। রিপোর্টে দেখা গেল সমুদ্রতল থেকে পনের মিটার গভীরতায় আছে শুধু কিছু কিছু নরম বোল্ডার, মাটি আর বালি। ব্যাস্, আর কিছু পাওয়া যায় নি ঐ সমুদ্রতলের নীচের মাটিতে। ম্যাপের জরিপী সমুদ্রতলের নীচের মাটিতে কিছুমাত্র রহস্য আছে বলে আর মনে হোল না ক্যাপ্টেনের।

এবার খনন কাজ শুরু হোল দ্বিতীয় গ্রীডে, স্যাণ্ডোর এরিয়ায়। কাজ চল্‌ল মিয়ামী বীচ আর অ্যানটারিন চ্যানেলের মধ্যে। এবার কাজ চার মাস ধরে চলল। কিন্তু খনন কাজের ফলাফল আগের মতই হতাশাজনক। ডুবো জাহাজ ডি-অ্যাটোচায় কোনও হদিশই পাওয়া গেল না দ্বিতীয় গ্রীডের কাজ থেকে।

আগষ্ট ১৯৭১-এ আবার মিটিং বসল সী-ঈগলে। আগের মতই, সবাই উপস্থিত সেখানে। ক্যাপ্টেন এবার ইচ্ছে করেই ডাকলেন নীলকে। নীল এখন একটু বড় হয়েছে। বয়স হয়েছে চোদ্দ বছর।

—বন্ধুরা, আমি দেখছি আমাদের এই ট্রেজার-স্যালভোর্স কোম্পানির ছোট্ট-মালিক নীল ফিশারের কথাই ঠিক হতে চলেছে। যেখানে জাহাজ ডুবেছিল সেখানেই, বা, তার ধারে কাছে বেশী গভীরতা পর্যন্ত খুঁড়ে দেখতে হবে জাহাজ পাওয়া যায় কিনা। অন্যদিক খুঁজে তো কিছুই পাওয়া গেল না। জনসন, তোমার তিন-নম্বর গ্রীডই হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে গ্যালিয়ন ডি-অ্যাটোচা ডুবেছিল। আমি এই গ্রীডের পরীক্ষা অন্যভাবে করতে চাই।

—অন্যভাবে ! কেন ক্যাপ্টেন ?— স্যাম জনসন বেশ অবাক্ হয়ে যায়।

—স্যাম, তোমার এরিয়া হচ্ছে ফ্লোরিডা-কিইস্ আর নিকোলাস চ্যানেলের মধ্যে, এখানেই ডুবেছিল গ্যালিয়ন ডি-অ্যাটোচা। তাই এই জায়গাটার পরীক্ষা করবে তোমরা তিনজনে, একসঙ্গে। ড্রিলিং হবে ১৫ মিটার সমুদ্রতলের চেয়েও গভীরে। পঞ্চাশ মিটার পর্যন্ত ড্রিলিং কাজ চলবে।

—এতটা গভীরে কি যাওয়া খুবই দরকার ?—অবাক হয়ে যায় স্যাম জনসন।

নিশ্চয়ই। দেখ, ড্রিলিং যখন চলবে, ড্রিলিং ওয়ার্কাররা, মানে যাদের তোমরা বল রাফনেকস্ ওয়ার্কার, তাদের সঙ্গেই তোমরা থাকবে। দেখবে, ড্রিল করার সময় ড্রিল-রডের কম্পন হঠাৎ বেড়ে গেছে কিনা। দেখবে, সামুদ্রিক জলজ প্রাণীরা কেমন ব্যবহার করছে। মনে রেখ, জলজ-প্রাণীরাও একটি ভাল নির্দেশকের কাজ করে। মোদ্দা কথা, তোমাদের সবাইকে চোখ কান খুলে কাজ করতে হবে।

—ক্যাপ্টেন, আমার গ্রীডে অন্য অ্যাকেয়েনটনদের না আনলেই ভাল করতেন। এতে এই মনে হচ্ছে আপনি আমাকে ভরসা করতে পারছেন না।

—জনসন! প্লিইজ, স্পোর্টিং হও। আমরা তাড়াতাড়ি ট্রেজার খুঁজে বার করতে চাই। তারজন্য যা করার তাই করছি। এর মধ্যে ভরসা অভরসার কথা আসছে না।

—ঠিক আছে। —গম্ভীরভাবে প্রত্যুত্তর দেয় জনসন। অস্বস্তির মধ্যে সেদিনের সভা শেষ হয় সী-ঈগলের মিটিংরুমে।

১৯৭২ সাল এসে গেল। ১৯৭১ সাল কেটে গেল শুধু ফ্লোরিডা-কিইস আর নিকোলাস চ্যানেলের মধ্যে সমুদ্রতল ড্রিলিং করতেই। ১৯৭২-এর মার্চমাসে আবার জরুরী মিটিং বসে সী-ঈগলে। ড্রিলিং-এর বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করে তিন অ্যাকোয়েনট। মিটিং শুরু হতেই ক্যাপ্টেন ফিশার বলেন—

—বন্ধুগণ, এবার কিছু ভাল ফল পেয়েছি। ড্রিলিং ফ্লোরের মধ্যে কিছু ধাতব পদার্থের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এক পিস্ জেমস্-ষ্টোন পাওয়া গেছে। স্পষ্ট সী-উইডের চিহ্নও দেখা গেছে। অর্থাৎ উপরের মাটি চাপা পড়েছে নীচে, এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। ধাতব পদার্থের চিহ্ন মানে মনে হয় সমুদ্রতলের নীচে ধাতব ভূস্তর আছে, অথবা, ধাতব জিনিষ চাপা পড়েছে।

—ক্যাপ্টেন, দীর্ঘ দুবছর পরে তবে কি সত্যিই-আশার আলো দেখতে পাচ্ছে ট্রেজার-স্যালভোর্স কোম্পানি?

—মিস ম্যাকহোলি, এটা আশার আলো কিনা বলতে পারছি না, তবে সম্পূর্ণ নিরাশা নয় তা বলতে পারি। কিন্তু এর মধ্যে নূতন সমস্যা দেখা দিয়েছে।

—নূতন সমস্যা! —অবাক হয় ম্যাকহোলি। ম্যাক-স্যান্ডো-জনসনও বিস্মিতভাবে তাকায় ক্যাপ্টেন ফিশারের দিকে।

—হ্যাঁ ম্যাকহোলি। দশ লাখ ডলার নিয়ে কাজ শুরু করি। সে পুঁজি প্রায় শেষের দিকে। বাজারে নূতন শেয়ারও বিক্রী হচ্ছে না। এ অবস্থায় টাকা না পেলে যতটা কাজে এগিয়েছি সবই বিফল হয়ে যাবে।

—তার মানে এখানেই কাজ বন্ধ হয়ে যাবে! —মিসেস ডোলারিস চিন্তিত গলায় বলেন।

—নাঃ, নাঃ, তোমরা এত ঘাবড়াচ্ছ কেন? দু-এক বছরের কাজের মত টাকা কোম্পানিতে

আছে। কিন্তু এই বছরের মধ্যে কিছু টাকা আবার যোগাড় করতে হবে। তোমরা এখুনি এমন ভাবে হতাশ হোচ্ছ কেন ?

—ড্যাডি, যদি এই বছরেই ট্রেজার পেয়ে যাও? —দুম করে বড়দের কথায় মাঝে পনের বছরের নীল কথাটা বলে ওঠে।

—ট্রেজার! সেতো তাহলে সাংঘাতিক ব্যপার হবে। কিন্তু পাচ্ছি কি করে? —ছোট ছেলেকে প্রশ্ন করেন ক্যাপ্টেন ফিশার।

—বারে, জেমস্ ষ্টোন পাওনি এবার? তাহলে? ট্রেজারও পাবে, তোমরা চেষ্টা কর। —বেশ ভারিক্কী মেজাজ পনের বছরের নীল ফিশারের।

—ও কে বস্, চেষ্টা করব আমরা। —অ্যাকোয়েনট ম্যাক গ্রভেল হেসে নতমস্তকে উত্তরটা দেয়।

হাঃ, হাঃ, হাঃ, সবাই একসঙ্গে হেসে উঠে। শুধু লজ্জায় মাথা নীচু করে নীল। তারপর ছুটে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়।

তিনটি বছর আরও পার হয়ে গেছে। এসেছে ১৯৭৫ সাল। ট্রেজার-স্যালভোস আজ সত্যিই সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ট্রেজার খোঁজার মত টাকা কোম্পানির তহবিলে নেই বল্লেই হয়। ক্যাপ্টেন ফিশার, মিস ম্যাকহোলি, মিসেস ডোলারিস ভাবতে বসেন, কি করা যায়।

—ক্যাপ্টেন, আর কত ডলার চাই আপনার? —চিন্তিত গলা ম্যাকহোলির।

—ম্যাকহোলি, কতদিন ধরে চলবে এ কাজ কে জানে। তবে এখন তিন অ্যাকোয়েনটের জন্য চাই তিনটে সার্চ-ভেসেল। নূতন যন্ত্রপাতিও চাই। দশ লাখ ডলার হাতে না এলে কোম্পানিকে বন্ধ করা ছাড়া উপায় নেই। —বিব্রত স্বরে বলেন ক্যাপ্টেন মিল ফিশার।

সী-ঈগলে ক্যাপ্টেনের ঘরে নামে নিথর নীরবতা। কোম্পানির অন্ধকারময় ভবিষ্যতের কথায় তিনজনেই আতঙ্কিত হয়ে উঠেন।

ঘরের এককোণে এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল নীল ফিশার। নীল এখন আঠারো বছরের তরুণ। আগের মত চাঞ্চল্য আর নেই তার। বাবা-মা-আণ্টি তিনজনের সব কথাই কানে আসে তার। সবাইকে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে দেখে আস্তে আস্তে বলে,—ড্যাড, আমাদের তো আর একজন বন্ধু আছেন। তার সঙ্গে কথা বলছ না কেন?

—বন্ধু! আর কে বন্ধু আমাদের? —অবাক হন ক্যাপ্টেন ফিশার।

—বারে! সব ভুলে গেলে? আণ্টির মামা কার্ল প্যাফিলড্রফের টাকায় তো কোম্পানি কাজ শুরু করে, তাই না? তবে তার কাছে যাচ্ছ না কেন একবার?

ভ্রূ কুঁচকে নীলের দিকে তাকাল মিল ফিশার। ভাবেন কিছুক্ষণ। তারপর বলেন,—কথাটা মন্দ বলে নি নীল। ঠিক আছে, আমি আর ম্যাকহোলি কালই সকালের প্লেনে

নিউইয়র্ক যাচ্ছি। দেখি ভাগ্য সহায় হয় কি না। কিন্তু,—
—কিন্তু কি? —অবাক হয়ে প্রশ্ন করে নীল।
—ফিরতে দু-তিনদিন দেরী হবে। কিন্তু সেই কয়দিন সী-ঈগলের নেতৃত্ব করবে কে? তিন অ্যাকোয়েনট ম্যাক-স্যান্ডো-জনসন থাকবে সমুদ্রের নীচে। উপরে থাকবে শুধু তোমার মা আর সী-ঈগলের চার্জম্যান, বাবুর্চিরা। তাহলে,—
—ড্যাড, মিথ্যে ভাবছ কেন? আমি সী-ঈগলের চার্জ নেব। আমি তো এখন বড় হয়ে গেছি। অ্যাডাল্ট হয়ে গেছি আজ, নয় কি ড্যাড?
ইয়েস মাই বয়। সী-ঈগল, ট্রেজার-স্যালভোর্স দুটোকেই তুমি ভালবেসে ফেলেছ। তোমার হাতে দায়িত্ব দিতে পারি। বয়স মাত্র আঠারো হলেও তোমার চিন্তাধারা বড়দের চেয়েও তীক্ষ্মধার। অলরাইট মাই সান, আমি কাল রওনা হলে তুমিই সী-ঈগলের চার্জ নেবে। সেরকম অর্ডারই থাকবে আমার।
খুশীর ঝলক খেলে যায় তরুণ নীল ফিশারের চোখে মুখে। সেই খুশী ছড়িয়ে পড়ে মিসেস ডোলারিসের মুখে, মিস ম্যাকহোলির চোখের তারায়।
পরদিন সকালে ক্যাপ্টেন ফিশার আর মিস ম্যাকহোলি রওনা হয়ে যান নিউইয়র্কে।

দুর্যোগ কেটে গেছে ট্রেজার-স্যালভোর্সের। কার্ল প্যাফিলড্রফ সবকিছু শুনে ক্যাপ্টেন ফিশারের দলকে সাহায্য করতে রাজী হয়েছেন। তিনি দশ লাখ ডলার দিতে রাজী হয়েছেন। ঠিক হয়েছে এই ১৯৭৫ সালে পাঁচ লক্ষ ডলার দেবেন। ১৯৭৬ সালে দেবেন আবার পাঁচ লক্ষ ডলার। প্রয়োজনে ১৯৭৭ সালে আরও পাঁচলাখ ডলার পেতে পারে ট্রেজার-স্যালভোর্স কোম্পানি। তাই ট্রেজার-স্যালভোর্সের কাজ শুরু হয়েছে পুরোদমে। এসে গেছে তিন অ্যাকোয়নটের জন্য তিনটি পৃথক সার্চ-ভেসেল।
ম্যাক, স্যান্ডো, জনসন তাদের সার্চ ভেসেল থেকে সমুদ্রতলে খোঁড়াখুঁড়ি করে চলেছে প্রতিদিন ড্রিলিং মেশিন দিয়ে। নূতন কোনও খবর নেই ডি-অ্যাটোচার। ড্রিলিং-এর রিপোর্ট থেকে ভাল কোনও খবর পেল না ট্রেজার-স্যালভোর্স কোম্পানি। অস্থিরতা, নিরাশা এর মধ্যেই কেটে গেল ১৯৭৫ সাল।

১৯৭৬ সালেও চলল ড্রিলিং এর কাজ। এই বছরে নীল ফিশারও মাঝে মাঝে সমুদ্রে ডাইভিংএ যেতে শুরু করল। উনিশ বছরের নীল এখন সী-ঈগল আর ট্রেজার-স্যালভোর্স কোম্পানির অনেকটা জুড়েই থাকছে। ধীর-স্থির, লম্বা-চওড়া নীল ফিশার ট্রেজার-স্যালভোর্স কোম্পানির এক উজ্বল নক্ষত্রের মত। সবার প্রিয় এই নীল ফিশার। সবাই লক্ষ্য করেছে সেই ছোট্ট-বেলা থেকে নীল যা বলেছে, তাই হয়েছে। আর শুধু হয়েছে নয়, ভালই হয়েছে ট্রেজার-স্যালভোর্স কোম্পানির।

এই ভাবেই এসে গেল ১৯৭৭ সাল। কোনও আশার কথা নেই অ্যাকোয়েনটসদের

কাছ থেকে। সমুদ্রতলের অনেকটাই ড্রিলিং করা হয়ে গেছে। কিন্তু ঠিক এই সময়েই ঝামেলাটা হল।

স্যাণ্ডো সেদিন অনেকটা সময় জলের তলায় আছে। সমুদ্রতলের মাটি-নুড়ির চেহারা কেমন দেখবার জন্য তুরপুন দিয়ে মাটিতে গর্ত করে চলেছে। যেসব মাটি-নুড়ি তুরপুনের মুখে উঠে এল সেগুলোকে হাতে নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল স্যাণ্ডো। কিন্তু এগুলোর চেহারা কেমন অন্য ধরণের মনে হতে লাগল। নাঃ, ব্যাপারটা আরও ভাল করে দেখতে হচ্ছে। স্যাণ্ডো সমানেই পরীক্ষা চালাতে লাগল। খেয়াল নেই এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। পিঠের অ্যাকুয়ালাংগ ট্যাঙ্কের অক্সিজেন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ম্যাক গ্রভেন এক মনে কাজ করেই চলেছে।

ম্যাকের সী-অগার আরও কিছুটা মাটি কেটে আনল। মাটি-বালি অগারের মুখ থেকে বের করে আনতেই চম্‌কে উঠল ম্যাক।

—একি! মাই গড! এযে গোল্ড সভরীণ! এগুলো কি তবে ডুবে যাওয়া গ্যালিয়ন ডি-অ্যাটোচার ট্রেজারের অংশ!

ওয়ারলেস অন করল ম্যাক।—সি ঈগল! সি-ঈগল! ম্যাক স্পীকিং।

—পিপ্‌-পিপ্‌। সী-ঈগল স্পীকিং। কি খবর ম্যাক?

—পিপ্‌। ক্যাপ্টেন আমি গোল্ড সভরীণ পেয়েছি। পুরোনো সোনার কয়েন। নিশ্চয়ই ডুবো গ্যালিয়ন ডি-অ্যাটোচার ট্রেজারের অংশ।

—ওয়াণ্ডারফুল। চমৎকার। সী-ঈগলের উত্তর আসে।

—গোয়িং ডীপার। আরও গভীরে যাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি আশ্চর্যজনক কিছু। তাই আরও গভীরে যাওয়া দরকার। ট্রেজার-স্যালভোর্সের সুদিন এল মনে হচ্ছে।

—ম্যাক, সময়ের দিকে খেয়াল রেখো। এক ঘণ্টারও বেশী একসঙ্গে জলে আছো। গ্যাস-সিলিণ্ডারের দিকে নজর দিও। গ্যাস কমতি না হয়।—সী-ঈগল থেকে ওয়ারলেসে সতর্ক করে দেন ক্যাপ্টেন মিল ফিশার।

—ওকে স্যার। আমি যাচ্ছি। কাট—ম্যাক ওয়ারলেস কানেকসন অফ করে।

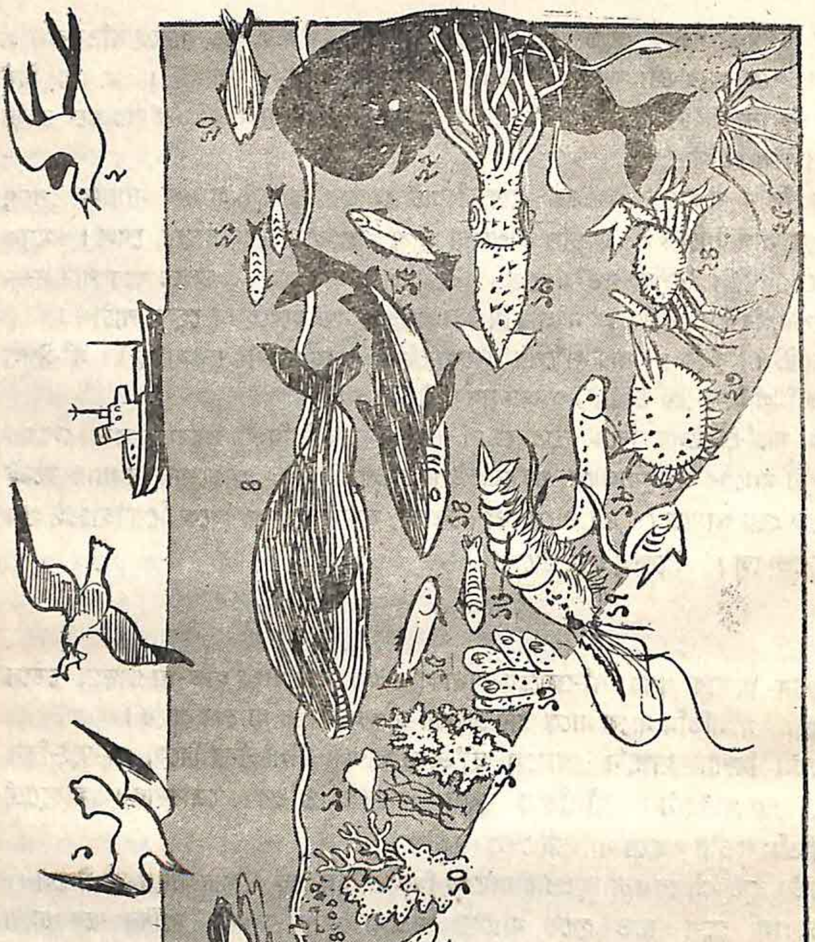
ম্যাক সাঁতরে চলে গভীর সমুদ্রের দিকে। ঠিক আসল ঘটনাটা শুরু হল তখনই। চল্লিশ মিটার লম্বা নীল তিমি আক্রমন করল ম্যাককে।

সোনার কয়েন পাবার আনন্দে অন্য দিকে খেয়ালই রাখেনি ম্যাক। আর তারই ফলে নীল তিমি এসে দাঁত বসালো অ্যাকুয়ালাংগ ও মাউথপিসের সংযোজক রাবার পাইপে। পাইপ ফুটো হয়ে হু হু করে অক্সিজেন বেরিয়ে যেতে লাগল।

হঠাৎ এই ব্যাপারটা ঘটবে বুঝতে পারেনি ম্যাক। কিন্তু এই মুহূর্তে সে বুঝতে পেরেছে তার বিপদটা কোথায়। অক্সিজেন শেষ হয়ে আসছে। দ্রুত ফেরা দরকার সার্চ-সীপে। ম্যাক দ্রুত ঘুরল। ভেসে চলল নক্ষত্রবেগে তার সার্চ-সীপের দিকে।

নীল তিমিও পলকে ছুটে এল ম্যাকের দিকে। ম্যাক বুঝতে পারছে সাঁতারে নীল তিমির সঙ্গে পেরে উঠা সম্ভব হবে না। তাই ঘুরল তিমির দিকেই। মাথায় ফিট করা ফ্ল্যাস্ লাইটকে তিমির মুখের দিকে ফেলল। পিঠে বাঁধা হাপুর্ণ বার করে তাড়া করল নীল তিমিকে।
নীল তিমি মুহূর্তে একচক্কর ঘুরে বিরাট লেজের ঝাপ্‌টা লাগল ম্যাকের পিঠে, অ্যাকুয়ালাগ ট্যাঙ্কে। একরাশ অক্সিজেন আবার হু-হু করে বেরিয়ে গেল। ম্যাক বুঝতে পারল বিপদ গভীর হচ্ছে। ওয়েরলেস অন্ করল। উপরে খবর পাঠাল—ক্যাপ্টেন, বিপদে পড়েছি। নীলতিমি অ্যাকুয়েলাগ নষ্ট করেছে। হেল্প পাটাও।
—রিট্রিট। কুইক! সার্চ-শীপের দিকে ঘোর। ডোণ্ট ওরি! যাচ্ছি। সী-ঈগল থেকে মিল ফিশারের উপদেশ ও আশ্বাসবাণী আসে।
ম্যাক সার্চ-ভেসলের দিকে দ্রুত ভেসে চলে। নীলতিমিও বারবার তার লেজের ঝাপ্‌টা ম্যাকের অ্যাকুয়ালাগে, শরীরের উপর চালিয়ে যায়। অক্সিজেনহীন ম্যাক ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে আসছে। তবুও সে ভেসে চলেছে, সার্চ-ভেসেলের দিকে। পেঁছাতেই হবে সার্চ-ভেসলে। বাঁচতেই হবে তাকে।

ক্যাপ্টেন ফিশার যখন সী-ফ্লোরের কাছাকাছি এল দেখে ম্যাক হাত-পা ছড়িয়ে ভেসে যাচ্ছে। নীলতিমি মাঝে মাঝে তার লেজের ঝাপটা মারছে ম্যাকের গায়ে।
ক্যাপ্টেন ফিশার হাপুর্ন—অ্যারো ছুঁড়তে লাগল নীলতিমির দিকে, এক-দুই-তিন করে, পরপর কয়টা। নীলতিমি বুঝল এবারকার প্রতিপক্ষ জোরদার। মুহূর্তে নীলতিমি গভীর সমুদ্রে পালিয়ে গেল।
ক্যাপ্টেন দ্রুত সাঁতরে এল মৃতপ্রায় ম্যাকের দিকে। ম্যাককে উঠিয়ে আনল সী-ঈগলে। মেডিক্যাল গ্রুপ দ্রুত হাতে ম্যাকের শুশ্রূষা শুরু করল। দুদিন ধরে চলল লড়াই। কিন্তু নাঃ, কিছুই করা গেল না। মারা গেল অ্যাকুইনট ম্যাক।
সী-ঈগলের ডেকের উপর শোয়ানো রয়েছে ম্যাককে। ম্যাকের ইনার জ্যাকেটের মধ্যে ঊনিশটা গোল্ড কয়েন।
—পুওর বয়! বেদনার্ত কণ্ঠ মিসেস ডোলারিশের।
—বড় দুঃখের দিন আজ ট্রেজার-স্যালভোর্স কোম্পানির। মিস ম্যাকহোলির গলাও ভারী হয়ে আসে।
মৃত ম্যাকের মুখের দিকে নিথর হয়ে তাকিয়ে আছে তরুণ নীল ফিশার। খবর পেয়ে আর দুজন অ্যাকুইনট স্যাণ্ডো ও জনসনও চলে এসেছে সী-ঈগলের ডেকে। ওদের দুজনের মুখেও উদ্বেগের ছায়া।
—বন্ধুরা, সত্যিই আজ আমাদের বড় দুঃখের দিন। মৃত ম্যাকের আত্মার জন্য



সমুদ্রতলে কত গভীরে কোন জলজ প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে।

[১] মৎসভোজী সী-বার্ড [২] প্ল্যানকটনভোজী সী-বার্ড [৩ ডলফিন
[৪] ৩০ মিটার লম্বা নীল তিমি [৫] সি-উইড (ভূখণ্ডের কাছে পাওয়া যায়) ←

এস আমরা প্রার্থনা করি। ম্যাকের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য আজ আমাদের সব কাজ বন্ধ থাকবে। গভীর বেদনার্ত গলায় বলে ক্যাপ্টেন ফিশার।

সবাই করুণ মুখে বসে থাকে মৃত ম্যাককে ঘিরে। কারুর মুখেই কোন কথা নেই। ক্যাপ্টেন শুধু বলে—ম্যাক আরও আগে যদি খবর পাঠাত তবে ওকে বাঁচাতে পারতাম। ইস, বড় লেটে খবর দিল। কিছু করার ছিল না। যখন পেঁছালাম, তখন যে ম্যাক প্রায় শেষ।

—স্যার, আপনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তা আমরা জানি। কিন্তু ম্যাকের মত পাকা অ্যাকুইনট এত বেখেয়ালী হল কেমন করে? অবাক হয়ে প্রশ্ন করে স্যাণ্ডো।

—স্যাণ্ডো, ম্যাক কেন, যেকোন অ্যাকুয়েনটই সেই অবস্থায় বেখেয়ালী হতে পারে। এই দেখ ঊনিশটা গোল্ড কয়েন পুরোনো দিনের। সাড়ে তিনশ বছর আগে ডুবে যাওয়া ডি-অ্যাটোচার ট্রেজারের অংশই যে এই মুদ্রা তা অনুমান করেই উত্তেজিত হয় ম্যাক। তা কি হওয়া অস্বাভাবিক?

—নাঃ, নাঃ, এ অবস্থায় সবাই উত্তেজিত হবে। বলে স্যাণ্ডো।

—ম্যাকের এই আবিষ্কার হয়ত ট্রেজার-স্যালভোর্স কোম্পানির ভাগ্যই খুলে দেবে। ম্যাক তার জীবন দিয়ে আমাদের জন্য হয়ত বিজয়ের পথ খুলে দিয়ে গেল। বেদনাঝরা গলায় বলেন ক্যাপ্টেট ফিশার।

ম্যাকের মৃত্যুর দুদিন পরে সী-ঈগলের মিটিং রুমে ট্রেজার-স্যালভোর্স কোম্পানীর সবাই মিলিত হয়। আজকের সভায় সবাই গম্ভীর। ম্যাকের মৃত্যুর বেদনার ছাপ সবারই মনে।

—বন্ধুরা, কঠোর হলেও আমাদের আবার ট্রেজার হ্যান্টিং-এর কাজে নামতে হবে। যদি তা না করি ম্যাকের মৃত আত্মারই অপমান করা হবে।

ক্যাপ্টেন ফিশারের কথায় সবাই মাথা নীচু করে চুপ করে থাকে। ক্যাপ্টেন ফিশার আবার বলে—আমাদের মৃত বন্ধু ম্যাক কভার করছিল ফ্লোরিডা কিইসের পশ্চিমদিকটা, টেন থাউজেণ্ড আইল্যাণ্ড আর হাভানার মধ্যের অংশটা। কিন্তু লক্ষ্য কর, আজ সকালে যে পয়েণ্টে ওকে নীল তিমি অ্যাটাক করে মেরে ফেলে, তা হচ্ছে ফ্লোরিডা-কিইস-ওয়েষ্টের দক্ষিণ-পশ্চিমের কোনও জায়গা। সেখানে তো ম্যাকের যাবার কথা ছিল না। তাহলে ম্যাক ওজায়গায় গেছিল কেন?

→ [৬] সামুদ্রিক গুল্ম [অ্যানিমন] [৭] প্ল্যাট-প্ল্যাঙ্কটন [৮] জু প্ল্যানকটন [৯] ষ্টারফিস্ [১০] কোরালস্ [১১] জেলী ফিস্ [১২] কোরালস [১৩] স্পঞ্জ [১৪] তিমি [১৫] হেরিং [১৬] গভীর সমুদ্রের বিরাটকায় চিংড়ি [১৭] ল্যানট্যান ফিস [১৮] র‍্যাট-টেইলফিস [১৯] বিরাটকায় স্কুইড [২০] টুনা [২১] ম্যাকরেল [২২] স্পার্ম-হুইল [২৩] সি-কিউকম্বার [২৪] গভীর সমুদ্রের কাঁকড়া [২৫] গভীর সমুদ্রের মাকড়সা।

—হয়ত ম্যাক ওখান থেকেই গোল্ড কয়েন পেয়েছে।—বলে নীল ফিশার। ওখানেই হয়ত এমন আশ্চর্য কিছু দেখেছিল যা দেখে ম্যাক বেসামাল হয়ে এগিয়ে যায়।

—তাহলে ঐ পয়েন্ট আমাদের দেখা দরকার। ম্যাকের দেখা নূতন পয়েন্টে একজনের যাওয়া দরকার। তাছাড়া স্যান্ডো-জনসনের পয়েন্টেও কাজ বন্ধ হওয়া উচিত নয়। কিন্তু মাত্র দুজন অ্যাকোয়েনটস্ দিয়ে তিনদিক সামলাবো কি করে? প্রশ্নটা স্যান্ডো ও জনসনের দিকে ছুঁড়ে দেন ক্যাপ্টেন।

—কেন, আমিও ডাইভিং-এ যেতে পারি। ডাইভিং তো আমিও প্র্যাকটিস করেছি ড্যাডি।

—সোঁক নীল! তুই কেন সমুদ্রের নীচে যাবি? ক্যাপ্টেন বিস্মিত হয়ে বলেন।

—বাঃ, স্যান্ডো, জনসন এরা যেতে পারে, আমি পারি না? আমি কি ওদের চেয়ে খারাপ ডাইভিং দিই। আমার হেলথ কি ওদের থেকে খারাপ?—বেশ জোর গলায় বলে তরতাজা কুড়ি বছরের নীল।

—নাঃ, নাঃ, সেকথা নয়। তোর তো অ্যাকোয়ানটসের সার্টিফকেট নেই। ওটা ছাড়া জলে এক্সপ্লোরেশনে যাওয়া নিষেধ। ক্যাপ্টেন ছোট ছেলেকে বোঝাতে চায়।

—ড্যাডি, তোমার মত সাহসী অ্যাকোয়েনট ও ক্যাপ্টেনের মুখে একথা ঠিক শোনাচ্ছে না। তোমার সার্টিফিকেট পেলে অ্যাকোয়েনট লাইসেন্স পাওয়া যায় তা আমি জানি। কিন্তু তুমি ভয় পাচ্ছ বুঝতে পারছি।

—নাঃ, ভয় কেন,—অস্পষ্টভাবে বলে ক্যাপ্টেন ফিশার।

—নাঃ, নীলের ডাইভিং যাওয়া হবে না। মিসেস ডোলারিস এতক্ষণ চুপ করে থেকে এবার বেশ রেগেই উঠেন।

—কেন মামী। আমি তোমার ছেলে বলে তোমার চিন্তা হচ্ছে? কিন্তু স্যান্ডো, জনসন এইসব অ্যাকোয়েনটসরাও তো তোমার ছেলের মত। তারাও তো সমুদ্রতলে যাচ্ছে। তাদের তো বাধা দাও নি তুমি?

ছেলের কথায় কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন ক্যাপ্টেন ফিশার। তারপর বলেন,—নীল ঠিকই বলেছে। ডোলারিস, এখানে যারা কাজ করছে, যেসব অ্যাকোয়েনটস আছে, সবাই ছেলের মতই। সত্যি কথাই বলেছে নীল। এতদিন ডাইভিং-এ ওকে স্যান্ডোদের সঙ্গে যেতে না দিয়ে অন্যায় করেছি।

—ক্যাপ্টেন! এইটুকু ছেলে নীল, তাকেও সমুদ্রে পাঠাবেন! ম্যাকের কথা ভুলে গেলেন! মিস ম্যাকহোলি চমকে উঠেন।

—নীল সমুদ্রে না গেলে স্যান্ডো, জনসন এরা সাহস পাবে কোথা থেকে? নীল, কাল থেকে এই সমুদ্রতলের কাজ শুরু হবে। তবে ম্যাকের পয়েন্টটা খুব ভাইট্যাল। তাই ওখানে এবার চার্জ নেবে স্যান্ডো। স্যান্ডোর জায়গায় যাবে জনসন। আর জনসনের জায়গায় এবার নামবে নীল।

—ক্যাপ্টেন, এ ব্যাপারে আমার কিছু আপত্তি আছে। হয় ম্যাকের পয়েণ্টে আমায় যেতে দিন, অথবা আমার পয়েণ্টেই আমায় কাজ করতে দিন। বেশ উদ্ধত গলা জনসনের।
—জনসন, তোমার চেয়ে স্যাণ্ডো সিনিয়র, তাই স্যাণ্ডোই যাবে ম্যাকের জায়গায়। এটাই হবে। ক্যাপ্টেন ফিশার এই প্রথম কড়া গলায় কথা বলেন।
—তাহলে আমার পয়েণ্টেই আমি কাজ করব। স্যাণ্ডোর পয়েণ্টে কাজ করব না। কথাটা বলে জনসনও রুখে দাঁড়ায়।
জনসনের রুক্ষ মেজাজী ভাবটা ভাল করে লক্ষ্য করেন ক্যাপ্টেন ফিশার। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলেন,—ও কে, তোমার পয়েণ্টেই তুমি কাজ কর। নীল, তুমি স্যাণ্ডোর পয়েণ্টে যাবে।
এক চাপা অস্বস্তির মধ্যে সেদিনের ট্রেজার-সালভোর্সের মিটিং শেষ হয় সী-ঈগলে। অশান্তি আর অস্থিরতায় শেষ হোল ১৯৭৬ সাল।

ধীরে ধীরে পার হল ১৯৭৭ সাল। একে একে কেটে গেল ১৯৭৮ সাল, ১৯৭৯ সাল। এমন কি ১৯৮০ সালও শেষ হয়ে গেল। কিন্তু নূতন কিছুই আর পেল না ট্রেজার-স্যালভোর্সের অ্যাকুইনটসরা।
কার্ল প্যাফিলড্রফের দেওয়া দশ লাখ ডলারও শেষ হয়ে গেছে। এমন কি তারপর আরও পাঁচ লাখ ডলারও শেষের মুখে। সমস্ত পুঁজিই শেষ। ট্রেজার-স্যালভোর্স কোম্পানি ধার-দেনায় জর্জরিত। ক্যাপ্টেন মিল ফিশারের মত হাসিখুশী মানুষও চিন্তিত। মিস ম্যাকহোলির চোখেও ঘুম নেই। ম্যাকহোলিই তো ক্যাপ্টেন ফিশারকে ট্রেজার হাণ্টিং-এ নিয়ে এসেছে। এখন কি হবে? সবাই যে আজ পথের ভিখারী হয়ে যাবে। কিন্তু কোথায় তলিয়ে গেল ঐ স্প্যানিজ জাহাজ নিউণ্ট্রা-সেনহারা-ডি-অ্যাটোচা? কোথায় গেল সেই জাহাজ ভর্তি সোনা রুপো?
হতাশা এসেছে স্যাণ্ডোর মনে। জনসন প্রতিদিনই চোখ রাঙাচ্ছে ক্যাপ্টেন ফিশারকে। ছোট্ট বার বছরের নীল আজ তেইশ বছরের যুবা। সেই সামলাচ্ছে অন্য দুজন অ্যাকুইনটস্‌কে।

ট্রেজার-স্যালভোর্স কোম্পানী প্রায় ভাঙ্গনের মুখে। এই ভাবেই এসে দাঁড়াল ১৯৮১; কার্ল প্যাফিলড্রফ জানিয়েছেন আর টাকা ঢালা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে তিনি জানিয়েছেন ২০ লক্ষ ডলার তিনি দিয়েছেন ট্রেজার স্যালভোর্সকে। তার বদলে হতাশা ছাড়া কোন আশার খবরই পান নি।

সব কেমন যেন বেসামাল হয়ে যাচ্ছে। ভাবতে বসেন ক্যাপ্টেন মিল ফিশার আর তার ছেলে তেইশ বছরের নীল ফিশার। সেই কবে সী-ঈগলে এসে উঠেছিল বাবা-মায়ের সঙ্গে ছোট্ট বার বছরের নীল। তারপর এগারোটা বছর কেটে গেছে। নীল ফিশারের

কাছে সী-ঈগল যেন তার স্বপ্নের রথ। ট্রেজার-হাণ্টিং যেন স্বপ্নের সমস্ত কামনা।

—ড্যাড, আজ কিছুদিন ধরে একটা কথা মাথায় ঘুরছে। কথাটা বলব বলব করে বলতে পারিনি। তবে মনে হচ্ছে আজ সে কথাটা বলা দরকার।

—কি কথা নীল ?—ক্যাপ্টেন এটুকু জানে নীল আজ পর্যন্ত যেসব পরামর্শ দিয়েছে সে সবই ভীষণ ভাবে প্রয়োজনীয় হয়েছে ট্রেজার স্যালভোর্স কোম্পানির কাছে। তাই নীলের কথায় অবাকই হন ক্যাপ্টেন।

—দেখ ড্যাড, ম্যাকের পর স্যাণ্ডোই হচ্ছে আমাদের অ্যাকুইনটসদের মধ্যে অভিজ্ঞ ও কাজের লোক। জনসনকে আমার কিন্তু ভাল লাগে না। লোকটা সুবিধের নয়। খুব উদ্ধত।

—তা জানি নীল। তবু এই অবস্থায় নূতন কাউকে আনতে সাহস পাচ্ছি না। কোম্পানি চলবে কি না চলবে তাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেটা তো বুঝেছিস।

হ্যাঁ ড্যাড, বুঝছি সব। তাই এই সময়ে স্যাণ্ডোকে আটকে রাখা একান্তই দরকার, নয় কি ?

—হ্যাঁ। তা তো দরকারই। কিন্তু চলে গেলে আটকাচ্ছি কি করে ?—অবাক হন ক্যাপ্টেন।

—পারো বাবা আটকাতে। দিদির সঙ্গে স্যাণ্ডোর বিয়ে দাও। ও তখন আপনা থেকেই থেকে যাবে আমাদের সঙ্গে।

—রোজারিনার সঙ্গে বিয়ে !—চমকে যান ক্যাপ্টেন ফিশার। একটু থেমে বলেন,—কিন্তু রোজারিনাকে ও বিয়ে করবে কেন ?

—করবে বাবা। দিদির অনেক গল্প ওকে করেছি। তুমি বললে ও রাজী হবে। দেখো। স্যাণ্ডো থেকে গেলে জনসনও থাকবে।

ক্যাপ্টেন ফিশার বহুক্ষণ ভাবেন। স্ত্রী ডোলারিস, কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিস ম্যাকহোলির সঙ্গেও আলোচনা করেন। নীলের মতেই সবাই শেষে মত দিতে রাজী হল।

১৯৮১ সালের জুলাই স্যাণ্ডো আর রোজারিনার বিয়ে হয়ে যায়। ট্রেজার-স্যালভোর্স কোম্পানির সংসারে আবার আনন্দের হাওয়া বয়ে যায়। এবার স্যাণ্ডো ভীষণভাবে উঠে পড়ে লাগে ডি-অ্যাটোচাকে খুঁজে বার করার জন্য।

স্যাণ্ডো-জনসন জোরদার কাজে নামলে কি হবে, পুঁজি যে শেষ হয়ে এল। কি হবে এখন এই দুশ্চিন্তায় ঘুম প্রায় বন্ধ হয়ে আসে ক্যাপ্টেন মিলের। নীল শুধু বলে —ভেবো না ড্যাড, সমুদ্রতলে ওদের আমি ট্যাক্‌ল করছি। কেন জানি, মন বলছে, কিছু একটা ভাল হবেই। ট্রেজার, বা ডি-অ্যাটোচা কারুর না কারুর দেখা আমরা পাবই।

—আমি ভাবি নি নীল। সাড়ে তিনশ বছরের হারানো জাহাজ পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। আমরা তো মাত্র বারো বছর চেষ্টা করছি। শুধু টাকার কথাই আমাকে ভাবাচ্ছে।

—ডোন্ট ওরি ড্যাড। জিসাসে বিশ্বাস রাখ। তুমিই তো আমাদের শিখিয়েছ সিন-সিয়ার লেবারকে জিসাস আশীর্বাদ দেন। তবে ভাবনা কিসের? দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে।

এতদিন যত পরীক্ষা হয়েছে সমুদ্রতলে তা ফ্লোরিডা কিইস ওয়েষ্টে, নিকোলাস চ্যানেল আর হাভানা উপকূলের মধ্যে। কিন্তু পঞ্চাশ মিটার সমুদ্রতলের নীচে ড্রিল করেও আর কিচ্ছু পায়নি স্যাণ্ডো-জনসন-নীলরা। অথচ ম্যাক সমুদ্রতলে নীল তিমির হাতে পড়ে মারা যাবার আগে জানিয়ে গেছে, 'গোয়িং ডীপার। দেখতে পাচ্ছি আশ্চর্যজনক কিছু। তারই জন্য আরও গভীরে যাওয়া দরকার। ট্রেজার-স্যালভোর্সের সুদিন এল মনে হচ্ছে'।

অর্থাৎ ম্যাক ডুবো জাহাজ ডি-অ্যাটোচার ব্যাপারে কিছু আশার আলো নিশ্চয়ই দেখেছিল। তা না হলে ওকথা বলবে কেন? ওর কাছে উনিশটা গোল্ড সভারিণ পাওয়াই বা গেল কেন? সবচেয়ে বড় কথা, নীল তিমির দেখা পেল কি করে? আমরা যে জলস্তরে কাজ করছি সেখানে সমুদ্র তত গভীর নয়। এ গভীরতায় নীল তিমি থাকে না। সেজন্য আমরা তো নীল তিমির দেখা পাই নি। কিন্তু ও পেল কি করে?

এসব কথা চিন্তা করে চব্বিশ বছরের তরতাজা যুবক নীল ফিশার। সব কিছু বিশ্লেষণ করে বুঝতে চায়। ম্যাক নিশ্চয়ই অন্য কোনও দিকে গেছিল সমুদ্রতল পরীক্ষা করতে। কিন্তু সেটা কোন দিক? ভাবতে থাকে নীল।

নীল বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে। দীর্ঘ আলোচনার পর ঠিক হয় ফ্লোরিডা কিইস ওয়েষ্ট থেকে টেন থাউজেণ্ড আইল্যাণ্ড-এর মধ্যেই চলবে সমুদ্রতল পরীক্ষা। প্রয়োজনে আরও পশ্চিমে সরে যাবে গালফ অফ মেক্সিকোর দিকে। ডি-অ্যাটোচা বে-অফ-ফ্লোরিডার পশ্চিমে ডুবে দক্ষিণে না উত্তরে, পূবে না পশ্চিমে সরে গেছে, বোঝা যাচ্ছে না। তবে যেখানে ডুবেছে ঠিক সেইখানেই পড়ে নেই, সে বিষয়ে নীল ও তার সঙ্গী ডুবুরিরা নিশ্চিত।

১৯৮১ সালের শেষ দিকে ট্রেজার-স্যালভোর্সের অ্যাকোয়েনটস্‌রা শুরু করল ড্রিলিংএর কাজ নূতন সমুদ্রতলের জায়গায়, ফ্লোরিডা-কিইস-ওয়েষ্ট ও টেন-থাউজেণ্ড আইল্যাণ্ডের মাঝখানে।

দু তিন মাস ধরে চলল পরীক্ষা। এইবার যেন নূতন কিছু দেখতে পাচ্ছে নীল ও তার দুই সঙ্গী। ভাঙ্গা ধাতব পদার্থ, কাঠের টুকরো ইত্যাদিও মাঝে মাঝে পেতে লাগল কর্তিত মাটির সঙ্গে। তবে কি নীলরা ক্রমেই ডি-অ্যাটোচার কাছাকাছি যাচ্ছে?

নীল মনে মনে প্রশ্ন করে।

ঠিক ডিসেম্বর ১৯৮১তে নীল পেয়ে গেল আবার ঠিক ম্যাকের মতই পাঁচটা গোল্ড কয়েন, পুরাণো দিনের সভারিণ। স্যান্ডো পেল দুটো হীরে, আর একটা দামী পাথরের আংটি। বেচারা জনসন, তার ভাগ্যে কিছুই উঠল না।

সী-ঈগলে খবর গেল। আবার পেয়েছি গোল্ড কয়েন। পেয়েছি ডায়মণ্ড, জেমস-ষ্টোনের আংটি। খবরটা নূতন আশার বাণী ছড়ালো সী-ঈগলে, ট্রেজার স্যালভোর্সে।

ভাগ্য বোধহয় এমনি করেই সাহসী লোকদের সাহায্য করে। তা না হলে ঠিক এমনি সময়েই নিউইয়র্ক থেকে কার্ল প্যাফিলড্রফ কেন আসবে ফ্লোরিডা কিইসে। কার্ল যখন সী-ঈগলে আছে ঠিক তখনই নীলের এই ম্যাসেজ সমুদ্রতল থেকে ভেসে এল উপরে, সী-ঈগলে।

—ক্যাপ্টেন, ম.ন হচ্ছে এবার সত্যি করেই ডি-অ্যাটোচাকে দেখতে পাবে। গুড নিউজ। খুশীতে বলেন কার্ল প্যাফিলড্রফ।

—না মামা, বোধহয় সব করেও শেষ রক্ষা হচ্ছে না। গ্যালিয়ন ডি-অ্যাটোচার কাছাকাছি এসেও এবার বোধহয় কাজ বন্ধ করতে হবে। মিস বার্থ ম্যাকহোলি করুণ মুখে কথাটা বলে মামা কার্ল প্যাফিলড্রফকে।

—কেন! কাজ বন্ধ হবে কেন? অবাক হন কার্ল।

—মামা, বুঝছ না কেন, টাকা চাই যে। বল, আর কে টাকা দেবে আমাদের? তোমার কাছ থেকে কুড়ি লাখ ডলার নিয়েছি। তার বদলে কিছুই তো ফেরৎ দেই নি আজ পর্যন্ত। তোমার কাছে আর টাকা চাই কি করে?

কার্ল প্যাফিলড্রফ ভাগ্নীর কথা শুনে মুচকি হাসেন। বলেন,—ক্যাপ্টেন, ভয় নেই, কার্ল প্যাফিলড্রফ পাক্কা ব্যবসাদার। ব্যবসায় লাভ লোকসান বোঝে। ভাগ্যকেও মানে। ট্রেজার স্যালভোর্সে টাকা ঢেলেছি অনেকটা জুয়া খেলেছি ভেবেই। জানি পুরো টাকাই জলে যেতে পারে। আর ভাগ্য যদি সহায় হয়, তাহলে—প্রশ্নটা মেলে ধরে ক্যাপ্টেন ফিশারের দিকে।

—ভাগ্য সহায় হলে আপনিও তার ফল পাবেন। দ্রুত উত্তর দেয় ক্যাপ্টেন ফিশার।

—ঠিক আছে, আপনারা কাজ চালিয়ে যান। টাকা আমিই দেব। তবে ট্রেজার যদি পান তবে তার দশ শতাংশ হবে আমার। ধীর গলায় বলেন কার্ল প্যাফিলড্রফ, পাক্কা ব্যবসাদারের মত।

—আর কিছুই যদি ভাগ্যে না উঠে।

—ক্যাপ্টেন, তাহলে বুঝব আমাদের ব্যাড লাক। আমার টাকা গ্রেটার আনটিলিস আর ক্যারাবিয়ান সমুদ্রেই চলে গেল, ব্যাস। তার জন্য ট্রেজার স্যালভোর্স কোম্পানির

কোনও দায় দায়িত্ব থাকছে না। কি, আমার প্রস্তাবে রাজী?

—ইয়েস কার্ল। ট্রেজার পেলে দশ শতাংশ হবে আপনার। এর বদলে কোম্পানিরও কোন ধার বলে কিছু থাকছে না আপনার কাছে।

—নিশ্চয়ই ক্যাপ্টেন। আপনারা ঋণ মুক্ত, ফ্রি-মাইন্ডে কাজ করুন। এক লাখ ডলার দু এক দিনের মধ্যেই পেয়ে যাবেন। টাকার দরকার হলেই জানাবেন, আপনি তা পেয়ে যাবেন। বাট, ডি-অ্যাটোচাকে চাই-ই।

—কার্ল, বারোটা বছর, এই সমুদ্রে খুঁজেই চলেছি ডি-অ্যাটোচাকে। আমাদের অ্যাকুইনটসদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। কিন্তু সমুদ্রের গভীরে যে রহস্য খেলা করে বিচার বিশ্লেষণে সব সময়ে তার হিসাব পাওয়া যায় না। সমুদ্রতলেও মরিচিকা খেলা করে, সেটা ভুলবেন না। তাই ডি-অ্যাটোচাকে পাবই এটা বলতে পারছি না। তবে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাব এটাই বলতে পারি।

—থ্যাংকস্ ক্যাপ্টেন। আমি জানি আপনি পারবেন। ডি-অ্যাটোচাই টেনে নিয়ে যাবে আপনাদের তার কাছে তা আমি জানি। চলি ক্যাপ্টেন, উইস ইউ সাক্সেস। এক ঝলক আশার আলো, খুশীর ঝলক ছড়িয়ে সী-ঈগল থেকে চলে যান মিস ম্যাক-হোলির মামা, নিউইয়র্কের পাক্কা ব্যবসাদার কার্ল প্যাফিলড্রফ।

আরও দু বছর কেটে গেছে। এসেছে ১৯৮৪ সাল। ক্যাপ্টেন ফিশার লক্ষ্য করেছেন, ফ্লোরিডা কিইস ওয়েস্ট থেকে যতই পশ্চিমে টেন থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডের দিকে এক্সপ্লোরেশন চালাচ্ছেন ততই যেন ভাল ফল পাচ্ছেন। ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত টুকটাক করে কিছু গোল্ড কয়েন, কিছু ধাতব পদার্থ সমুদ্রতল থেকে পাচ্ছেনই তার অ্যাকুইনটসরা। এখন সম্পূর্ণ হতাশার বদলে কিছু আশার ঝলকও দেখতে পাচ্ছেন।

এদিকে স্যান্ডো জনসনের সঙ্গে সমুদ্রতলে কাজ করে করে এতদিনে নীল ফিশার পাক্কা অ্যাকোয়েনটস্ হয়ে গেছে। নীল এখন সাতাশ বছরের তরতাজা যুবক। ওর সঙ্গে সমুদ্রতলে কাজ করায় অন্য দুই অ্যাকোয়েনট্সের কাজের গতিও বেড়েছে প্রচণ্ডভাবে। তাছাড়া নীলের পরামর্শে স্যান্ডোর সঙ্গে রোজারিনার বিয়ে হবার পর স্যান্ডোও ডি-অ্যাটোচা উদ্ধারের ব্যাপারে আরও সক্রিয় ও আগ্রহশীল হয়ে উঠেছে। নীল ফিশারের বুদ্ধি ও কাজের ধারা আজ তাই ট্রেজার স্যালভোর্স কোম্পানির কাছে অমূল্য সম্পদ। ক্যাপ্টেন ফিশার নূতন কিছু করার আগে নীলকে জিজ্ঞেস না করে সে কাজ করেন না।

ট্রেজার উদ্ধারের অভিযানে ক্যাপ্টেন ফিশার এত জড়িয়ে পড়েছেন বলে বড় ছেলে রেম্যানকে নিউইয়র্কে খবর পাঠিয়েছেন সী-ঈগলে এসে তাদের সঙ্গে এই অভিযানে যেন যোগ দেয়। রেম্যান এতদিনে পড়াশুনা শেষ করে কলেজে প্রফেসারী করছিল

ফিলাডেলফিয়াতে। ঠাণ্ডা শান্তশিষ্ট মানুষ রেম্যান এই ঝক্কি-ঝামেলা উত্তেজনার মধ্যে যেতে রাজী হল না। সে প্রফেসারী নিয়েই রয়ে গেল ফিলাডেলফিয়াতে। ফলেই সাতষট্টি বছরের ক্যাপ্টেন মিল ফিশার আর সাতাশ বছরের নীল ফিশারের কাঁধেই রয়ে গেল এই ট্রেজার অভিযানের যত ঝক্কি ঝামেলা, দায়-দায়িত্ব।

সমুদ্রতলে মূল জায়গায় এখন কাজ করছে অ্যাকোয়েনট স্যাণ্ডো। তার পরেই কিন্তু নীল। জনসনকে কাজ করতে হচ্ছে তৃতীয় স্থানে। এজন্য মাঝে মাঝেই জনসনের সঙ্গে স্যাণ্ডোর ঝগড়া বাধছে। নীল দুজনকে ঠাণ্ডা করছে বারবার।

একদিন জনসন বলল—আমার কদিন ছুটি চাই।

—কাজ ভাল এগুচ্ছে, এই সময়ে ছুটি নেওয়া ভাল? জনসনকে বোঝায় নীল।

—আমি না থাকলেও ক্ষতি নেই। ট্রেজার-স্যালভোর্স কোম্পানির প্রিয় অ্যাকোয়েনট স্যাণ্ডো তো রয়েছে। তাছাড়া নীল তুমিও তৈরী হয়ে গেছ। সমুদ্রতলের আসল জায়গার কাজ তো তোমরা দুজনেই করছ। আমাকে তো ফ্লোরিডা কিইস ওয়েষ্টের এক ধারে পড়ে থাকতে হচ্ছে।

—তাতে ক্ষতি কি জনসন। ডি-অ্যাটোচা তো ফ্লোরিডা কিইস ওয়েষ্টের যেখানে ডোবে, তুমি ঠিক সেখানেই কাজ করছ। জনসনকে বোঝাবার চেষ্ট করে নীল ফিশার।

—নীল, আমাকে বাচ্চা ছেলে পেয়েছ, নাঃ? আজ পর্যন্ত যতবার যতটা গোল্ড কয়েন, মেটালস পেয়ে, সবই অন্য জায়গা থেকে, ঠিক যেখানে স্যাণ্ডো কাজ করছে সেখান থেকেই। আমার জায়গা থেকে, কোন কিছু পাওয়া গেছে? ক্ষেপে উঠে বলে জনসন।

—তাতে ক্ষতি কি? আমরা সবাই তো একসঙ্গেই কাজ করছি। ট্রেজার পেলে ট্রেজারের সিকি শতাংশ প্রত্যেকেই বোনাস হিসাবে পাব। তুমিও পাবে জনসন।

—নীল, রাগিও না আমায়। ট্রেজার উদ্ধার করবে স্যাণ্ডো, আর তার দয়ায় ট্রেজারের সিকি শতাংশ ভিক্ষে পাব আমি, নাঃ, সেরকম ভিখারী অ্যাকুইনট আমি নই।

—আহা! বড় রেগে যাও তুমি। এতে ভিক্ষের কি আছে? সবাই একসঙ্গে কাজ করছি তবেই তো স্যাণ্ডা এগুতে পারছে। আমরা ওর পাশে না থাকলে ও কি সঠিক পথে চলতে পারত?

নীল, তোমাকে স্যাণ্ডোর হয়ে দরবার করতে হবে না। আমি জানি, ক্যাপ্টেন ফিশার আমাকে পছন্দ করেন না, তাই আমাকে সবচেয়ে খারাপ পয়েণ্টে পোষ্ট করেছেন। এসব দেখে আমি উত্তেজিত। তাই বিশ্রাম চাই কয়দিন।

জনসনের জেদাজেদীতে ও তার মনের ক্ষোভের কথা নীল ফিশার ক্যাপ্টেনকে বলাতে শেষে জনসন সাত দিনের ছুটি পায়। কোথায় যাচ্ছে এসব কিছু না বলে গম্ভীর মুখে জনসন সী-ঈগল ছেড়ে চলে যায় ছুটিতে।

দিন পনের পরে ফিরে এল জনসন। ফিরে এল জনসন ভারী হাসিখুসি মেজাজ নিয়ে। হৈ-হৈ করে সমুদ্রতলের অভিযানে নেমে পড়ল সে। জনসনের খুশীভরা মেজাজ দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লেন ক্যাপ্টেন ফিশার। ট্রেজার স্যালভোর্সের ট্রেজার হাণ্টিং অভিযান চলতে লাগল আগের চেয়েও দ্রুততালে। ১৯৮৪ সাল শেষ হয়ে এল। এল ১৯৮৫; ১৯৮৫ সালের জানুয়ারীও কেটে গেছে। সেদিন সকালে স্যাণ্ডো, জনসন ও নীল যথারীতি সমুদ্রে গেছে ডি-অ্যাটোচা আর তার হারানো সম্পদকে খুঁজতে। সী-ঈগলে ক্যাপ্টেন রুমে ওয়েরলেসের সামনে বসে দূর নীলিম সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছেন ক্যাপ্টেন। মাঝে মাঝে ভেবেও চলেছেন, তার এই সোনা-রুপো ভর্তি ডি-অ্যাটোচাকে খোঁজা কি মরিচিকা খোঁজা হয়ে দাঁড়াবে। ১৯৬৯ সালে তিনি এই ট্রেজার হাণ্টিং শুরু করেছিলেন। তারপর কেটে গেল পনের বছর। পঁয়ত্রিশ লক্ষ ডলার খরচা হয়ে গেছে। কিন্তু কতটুকু আশার আলো দেখতে পেলেন তিনি? কতদিন তার সমস্ত লোকজনকে বুঝিয়ে রাখতে পারবেন তিনি?

হঠাৎ রেড সিগন্যাল জ্বলে উঠল সী-ঈগলের কণ্ট্রোলরুমে। —পিপ-পিপ্, পিপ্।

ক্যাপ্টেন দ্রুত উত্তর করেন—সী-ঈগল স্পীকিং। ক্যাপ্টেন স্পীকিং।

—স্যাণ্ডো ইন লাইন। প্রব্লেম। সাহায্য চাই। —উত্তেজিত স্যাণ্ডোর কণ্ঠ সমুদ্রতল থেকে ভেসে আসে!

—প্রব্লেম! কি প্রব্লেম? কি সাহায্য চাও? —অবাক স্বরে প্রশ্ন করেন ক্যাপ্টেন সী-ঈগল থেকে।

—আপনাকে চাই। প্রব্লেম নীচে না আসলে বলা যাচ্ছে না। —স্যাণ্ডোর গলায় উত্তেজনা ক্রমেই বাড়তে থাকে।

—ও. কে.। যাচ্ছি। জনসন আর নীলকে খবর দিয়েছ?—ক্যাপ্টেন ব্যাপারটা সঠিক বুঝতে চান।

—যাকে যা খবর দেবার দিয়েছি। তাড়াতাড়ি আপনি আসুন। —ওয়েরলেস কানেকশন হঠাৎ কেটে যায়।

—হারি আপ ম্যাকহোলি। আমি ডাইভিংএ যাচ্ছি। তুমি সী-ঈগলের চার্জ নাও।—ক্যাপ্টেন ফিশারের কথার মাঝখানেই কণ্ট্রোল বোর্ডে আবার লাল আলো জ্বলে উঠে।

—ইয়েস্, ক্যাপ্টেন ফিশার বলছি।

—আমার পয়েণ্টে ডাইভিং না করে জনসনের নিকোলাস-চ্যানেল ফ্লোরিডা-কিইস পয়েণ্টে নামুন। —সমুদ্রতল থেকে ভেসে এল স্যাণ্ডোর উত্তেজিত গলা।

—কিন্তু কেন? বিপদ তোমার, অথচ তোমার পয়েণ্টে না গিয়ে জনসনের পয়েণ্টে নেমে লাভ কি?

—প্লিইজ স্যার, দেরী করবেন না। হারি আপ। আমি, আপনি, আমাদের কোম্পানি সবকিছুই বিপদের মুখে। জলদি আসুন। নষ্ট করার সময় নেই আর। ওভার—

সমুদ্রতল থেকে ওয়েরলেস কানেকশন কেটে যায়।
চিন্তিত মুখে ক্যাপ্টেন ফিশার ডাইভিং-কীটস্ পড়ে নেন। স্যাণ্ডোর গলায় কেমন যেন ভয় ও উত্তেজনা। ভাবেন, কেন এমন ভাবে কথা বল্ল স্যাণ্ডো ?
ঠিক ডাইভিং-এর আগে কি যেন মনে হয় ক্যাপ্টেন ফিশারের। সমুদ্রতলে নীলকে কণ্ট্যাক্ট করেন ওয়েরলেসে।
—নীল, স্যাণ্ডোর বিপদ। আমি জনসন পয়েণ্টে নামছি। ওখান থেকে স্যাণ্ডোর পয়েণ্টে যাচ্ছি। তুমি স্যাণ্ডোর পয়েণ্টে মুভ কর এখুনি।
—হ্যাঁ, আমিও খবর পেয়েছি স্যাণ্ডোর। কিছু ভেবনা ড্যাড। আমি স্যাণ্ডোর কাছে যাচ্ছি। কিন্তু তোমাকে কি আসতেই হবে ? এই বৃদ্ধ বয়সে সমুদ্রতলে ডাইভিং—
—নীল, তেমন জরুরী না হলে স্যাণ্ডো এমন করে বলত না। স্যান্ডো আমাকেই নীচে আসতে বলেছে। নিশ্চয় কারণ আছে। দেরী না করে মুভ করে স্যাণ্ডোর পয়েণ্টে। আমিও মুভ করছি। —৬৭ বছরের বৃদ্ধ ক্যাপ্টেন মিল ফিশার সমুদ্রে ডাইভ দেয়।
—ডোলা, মিলের কি নীচে না গেলেই চলতো না ? —ম্যাকহোলি চিন্তিত হয়ে বলে।
—হয়ত চলত না ম্যাকহোলি। শুনলে না, স্যাণ্ডো এস. ও. এস. পাঠিয়েছে।
—কিন্তু ডোলা, স্যাণ্ডো যদি বিপদের মুখেই থাকে তাহলে মিলও তো বিপদে পড়বে।
—ম্যাকহোলি, ভুলছ কেন, স্যাণ্ডো বিপদের মুখে রয়ে গেছে। স্যাণ্ডো শুধু অ্যাকোয়েনটসই নয়, আমার একমাত্র মেয়ে রোজারিনার স্বামীও। রোজারিনার ক্ষতি কি আমাদেরও ক্ষতি নয়। তাছাড়া এটাও কি শুনলে না, ছোট ছেলে নীলও যাচ্ছে স্যাণ্ডোর পয়েণ্টে।
—তাই তো, কি হচ্ছে নীচে বুঝতে পারছি না ! স্যাণ্ডোর কি হোল নীচে !

জনসনের পয়েণ্টে ক্যাপ্টেন ফিশার নেমে চমকে যায় ! জনসনের চিহ্ন নেই সেখানে। তবে কি স্যাণ্ডোর পয়েণ্টে গেছে জনসন ? কিন্তু ফ্লোর বেড এমন মসৃণ কেন ? ড্রিলিং-এর বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই এখানে ! জনসন কি এখানে কোন কাজই করে নি ?
পিছনে সামান্য শব্দ হয় ছলাৎ। দ্রুত পিছনে তাকায় ক্যাপ্টেন মিল ফিশার। ছোট ছেলে নীল সাঁতরে চলে এসেছে সেখানে।
—তুমি স্যান্ডোর পয়েন্টে যাও নি ? তোমাকেই তো সেখানে যেতে বল্লাম। —বেশ বিরক্ত হল ক্যাপ্টেন ফিশার !
—ড্যাড, এই বয়সে তুমি ডাইভিংএ এসেছ সেটা তো আমাকে খেয়াল রাখতে হবে। স্যান্ডোর পয়েন্টে না গিয়ে জনসনের পয়েন্টেই বা যাচ্ছ কেন জানতে হবে না ?

—কিন্তু স্যান্ডোর অবস্থা—

—ড্যাড, ভুলে যেও না, একজন স্যান্ডো, একজন নীল গেলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু ক্যাপ্টেন মিল ফিশার একটাই। তার বদলি পাওয়া সম্ভব নয়, পাওয়াও যাবে না। তার কিছু হলে ট্রেজার স্যালভোর্স যে শেষ হয়ে যাবে ড্যাড।

—স্নেহভরা অদ্ভুত চোখে ছেলের দিকে তাকায় ক্যাপ্টেন মিল ফিশার। —ও. কে.। কিন্তু জনসন কি কাজ করল এতদিন ?

—ড্যাড। জনসনকে আমি বুঝতে পারি না। জনসনের কথা পরে ভাবব। এখন চল স্যান্ডোর পয়েন্টে। —নীল সাঁতরে চলে স্যান্ডোর পয়েন্টে, ফ্লোরিডা কিইস ও টেন থাউজেন্ড আইল্যান্ডের মাঝামাঝি সমুদ্রের দিকে। নীলের পিছনে আসে ক্যাপ্টেন মিল ফিশার।

দুজনেই কিছুক্ষণ সাঁতরে চলে আসে স্যান্ডোর পয়েন্টের কাছে। নীল আগে চলেছে। বেশ কিছুটা পিছনে ক্যাপ্টেন ফিশার। দূর থেকে যেন আবছা কিছু নড়াচড়ার চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে নীল।

গগল্‌সের ভিতর দিয়ে চোখটা টানটান করে দূর সমুদ্রাঞ্চলের দিকে তাকিয়ে সাঁতরে চলে নীল। সাঁতরাতে সাঁতরাতে ভাবে, এত দ্রুত কি নড়াচড়া করছে? সাঁতরাবার গতি দ্রুততর করে নীল ফিশার। নীলের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে ক্যাপ্টেন ফিশার ক্রমেই পিছনে পড়ে যাচ্ছে।

স্যান্ডোর অনেকটা কাছে চলে এসেছে নীল। কিন্তু আর একটু কাছে আসতেই চমকে উঠে নীল। একি! কারা ঘিরে ধরেছে স্যান্ডোকে? ওরা কারা? কোথা থেকে এল ?

স্যান্ডোর অবস্থা দেখে নীল ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে। মুহূর্তে উল্কার বেগে সাঁতরে চলে স্যান্ডোর কাছে। স্যান্ডোর পাশে আসতেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায় নীল।

—জনসন! তুমি! তুমি স্যান্ডোকে অ্যাটাক করেছ ?

—ওঃ, তুমিও এসে গেছ, খুব ভাল হয়েছে নীল। মিল ফিশার তার জামাই স্যান্ডো ও ছেলে নীলকে নিয়ে ডি-অ্যাটোচার সমস্ত ট্রেজার একাই ঘরে তুলবে, তা কি হয়? ব্যাঙ্গ ঝরে পড়ে জনসনের গলায়।

—কিন্তু আর তিনজন কারা ? অবাক গলায় বলে নীল।

—এরা ইন্‌টারন্যাশনাল ট্রেজার কোম্পানির লোক। জনসন আমাদের সমস্ত খবর এই কোম্পানিকে বেচে দিয়েছে। তাকিয়ে দেখ, দূরে জনসন আলাদাভাবে ড্রিলিং ও সার্চ শুরু করেছে। স্যান্ডো ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নীলের কাছে।

—নীল, তুমিও এখন সবকিছুই জেনে গেলে দেখছি। স্যান্ডো কদিন ধরেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল, তাই ওকেই যা করার করব ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন তোমাকেও

তো আর ছাড়া যায় না নীল। জনসন লেসর গান তুলে ধরে স্যান্ডো ও নীল ফিশারের দিকে।

স্যাণ্ডো ও নীলও তাদের সুপার-সেনসার গান জনসনের দিকে এগিয়ে ধরে। নীল চেঁচিয়ে বলে—জনসন, তুমি আমাদের পনের বছরের পরিশ্রমের সুফলকে অন্যের হাতে তুলে দিতে পার না। আমি আর স্যাণ্ডো তা হতে দেব না।

সমুদ্রতলে শুরু হয়ে যায় লড়াই। একদিকে স্যাণ্ডো ও নীল, আর অন্যদিকে জনসন ও বেনামা ইনটারন্যাশনাল ট্রেজার কোম্পানির তিন জলদস্যু।

দূর থেকে টেলিস্কোপ টর্চ জেলে ক্যাপ্টেন মিল ফিশার সব কিছুই দেখছেন। ওদের কথাবার্তাও টেপ হয়ে যাচ্ছে, ক্যাপ্টেনের মাইক্রোটেপিং সিস্টেমে। ঘটনাটা যে এমন সাঙ্ঘাতিক, জনসন যে এমন বেইমানী করবে, ভাবতেও পারেনি ক্যাপ্টেন। এই বৃদ্ধ বয়সে লড়াই করা তো সম্ভব নয় তার, তবে কি করবেন?

ইলেকট্রনিক ব্লাষ্টিং করবেন? তাতে জনসন আর তার তিন সাকরেদ মুহূর্তে উড়ে যাবে। কিন্তু তাতে যে স্যান্ডো ও নীলও মারা যেতে পারে। দ্রুত ভাবতে থাকেন ক্যাপ্টেন মিল ফিশার।

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে যায়। হ্যাঁ, জলে ওয়াটার হ্যামারিং করা যেতে পারে। ঠিক, সেটাই একমাত্র রাস্তা। স্যান্ডো ও নীলকে লড়াই-এর মাঝে রেখেই দ্রুত সী-ঈগলে ফিরে যান ক্যাপ্টেন।

—জনসন, তুমি তোমার দলবল নিয়ে সারেন্ডার কর। শেষবারের মত বলছি। —লড়াই করতে করতে বলে নীল।

—তোমরাই সারেন্ডার কর নীল। ক্যাপ্টেন ফিশার আমার সঙ্গে অনেক অবিচার করেছে। ম্যাক-স্যান্ডো এরাই তার আদরের লোক। ঠিক আছে, দেখা যাক্ কি হয় তাদের। জনসন কি করতে পারে সেটাই দেখবে এবার।

—জনসন, প্লিইজ, ভাব ব্যাপারটা। ট্রেজার-স্যালভোর্সের তুমিও তো একজন। পনের বছর এখানে থেকে, কাজ করে, কোম্পানির জন্য, আমাদের জন্য, একটুও তোমার মমতা জন্মায়নি? —নীল লড়তে লড়তেও বোঝাতে চাইছে জনসনকে।

—ট্রেজার-স্যালভোর্স, ক্যাপ্টেন মিল ফিশার, স্যান্ডো, কারুর জন্য আমার একটুও মমতা নেই। তবে সত্যি বলছি, তোমাকে স্নেহ করি নীল। সেই ছোট্ট বার বছরের নীল ফিশার আমার কোলে পিঠে চড়ে কত খেলা করেছে। পনের বছর তাকে দেখছি। তোমার জন্যই আমি ভাবছি নীল।

—তবে আমার কথাতেই ফিরে এস জনসন। বাজে লোকদের সঙ্গে মিশে কি পাবে তুমি? তোমার ক্ষোভের কথা ড্যাডিকে জানাব আমি।

—এখন আর তা হয় না নীল। ইনটারন্যাশনাল ট্রেজার কোম্পানি আমাকে কিনে নিয়েছে। দেখতেই পাচ্ছ ওদের হয়েই ড্রিলিং করছি স্যান্ডোর পয়েন্টে।

—এটা কি বেইমানী নয় ? ট্রেজার স্যালভোর্সের যন্ত্রপাতি দিয়ে অন্যের কাজ করছ। আমাদের সমস্ত খবর ওদের বিক্রী করছ। তুমি কি ভেবেছ জনসন ব্যাপারটা জানবার পরও মেনে নেব আমি ?

—মানা না মানা তোমার ইচ্ছে। বাজে কথায় আর যেতে রাজী নই। তোমার সঙ্গে লড়ে তোমার আর ক্ষতি করতে চাই না। নীল সারেন্ডার কর তোমরা। তোমাদের আমরা বন্দী করে নিয়ে যাব। তারপর একলাই কাজ করব আমি ইনটারন্যাশনাল ট্রেজার কোম্পানির হয়ে।

—ওঃ, এই পনের দিনের ছুটি নিয়ে তাহলে এই সবই করে এসেছ। তাই যখন ফিরেছিলে তখন খুব খুশী খুশী মেজাজ ছিল তোমার ? —নীল ক্ষেপে যায় এবার।

—অনেক কথা হয়েছে, আর নয়। —জনসন ক্ষেপে উঠে এবার। —তোমরা তাহলে আত্মসমর্পণ করবে না ? ঠিক আছে। —জনসন তার তিন জলদস্যু সাকরেদের দিকে তাকিয়ে বলে,—নাও চার্জ দেম। ফিনিশ দেম।

শুরু হয়ে যায় প্রচন্ড লড়াই। সমুদ্রতল লড়াইএ তোলপাড় হতে থাকে।

ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন ফিশারও সী-ঈগল থেকে ইলেকট্রিক থ্রাষ্টিং রড নামিয়ে দিয়েছে স্যান্ডোর পয়েন্টে। একো-সাউন্ডিংএ সমুদ্রতলে সৃষ্টি করছে প্রচন্ড জলোচ্ছাস, তরঙ্গাঘাত। সমুদ্রতলে প্রচন্ড-চিৎকার চেঁচামেচিতে কেঁপে উঠেছে। ক্যাপ্টেন সেই আতঙ্কিত কন্ঠের চিৎকার শুনতে থাকেন সী-ঈগল থেকে।

কিছুক্ষণ পরে মনে হয় সব যেন স্থির হয়ে গেল। বুঝতে পারছে ক্যাপ্টেন, সমুদ্রজলের ক্রমাগত ধাক্কায় লড়াকু সবাই অজ্ঞান হয়ে গেছে। দ্রুত সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন ক্যাপ্টেন। অজ্ঞান অবস্থায় সবাইকে উপরে আনতে হবে। ম্যাকহোলিকে বলে যায়, কেজকে জলে নামাতে, যাতে ঐ খাঁচায় সবাইকে সী-ঈগলে উঠিয়ে আনা যায়।

ক্যাপ্টেন ফিশার নেমে এল স্যান্ডোর কাজের জায়গায়, সমুদ্রতলে। দেখে সী-ফ্লোরে চিৎ হয়ে শুয়ে স্যান্ডো ও নীল। রক্তে দুজনেরই শরীর ভেসে যাচ্ছে। অল্প দূরে জনসন আর তিনজন লোকও মৃতপ্রায়। ওদের শরীরেও প্রচন্ড আঘাতের চিহ্ন।

কেজ করে পাঁচজনকেই ওপরে ওঠায় ক্যাপ্টেন ফিশার। ওদের সবার চেহারার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে এই আঘাত সমুদ্রের জলের নয়, ও সবই লড়াই-এর চিহ্ন। স্যান্ডো আর নীলের আঘাত ভয়ংকর। জনসনদের আঘাতও কম নয়।

আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তা নেমে আসে সী-ঈগলে। যখন ক্রমেই ট্রেজার-স্যালভোর্স তার লক্ষ্যের দিকে পেঁছে এসেছে, যখন মনে হয়েছে এই বুঝি যে কোনও দিন দেখা পাবে ডুবন্ত জাহাজ নিউষ্ট্রা-সেনহারা-ডি-অ্যাটোচার, সেই সময়ে একি ভয়ংকর ঘটনা ঘটল ! জনসন এমন বেইমানী কাজ করল ! ক্যাপ্টেন ফিশার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠেন।

সারাদিন ধরে ডাক্তার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু তবুও স্যান্ডো ও নীলের অবস্থা

ক্রমেই খারাপের দিকে যেতে লাগল। জনসন আর তার দুই সাকরেদ কিন্তু ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠে।

সূর্য ডুবু ডুবু। আঁধার নেমেছে সমুদ্রের বুকে। ডাক্তার হতাশ মুখে বসে আছে স্যান্ডো ও নীলের শয্যা পাশে। মৃত্যুর হাতছানি দুজনেরই শিয়রে তার কালো ছায়া ফেলেছে তখন। বেদনায় পঙ্গু হয়ে গেছে সী-ঈগল। দেখতে দেখতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল স্যান্ডো। নীলও গুণছে তার শেষ প্রহর।

—একি হল ক্যাপ্টেন! ম্যাক আমাদের ছেড়ে গেছিল কবছর আগে, সে দুঃখ সওয়া যায়। স্যান্ডোর কথাও না হয় মেনে নেব আমরা। কিন্তু তুমিই বল ক্যাপ্টেন, আমাদের সেই ছোট্ট ছেলে নীলের একি হোল! নীল কি শুধু ক্যাপ্টেন ফিশারেরই ছেলে? আমাদের সবার নয়? —হু হু করে কেঁদে উঠে মিস বার্থ ম্যাকহোলি।

কান্নায় বেহুঁশ হয়ে আছে মিসেস্ ডোলারিস ফিশার।

—ড্যাড, ভেব না, সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখ, তোমার ট্রেজার স্যালভোর্স ঠিক খুঁজে বার করবে ডি-অ্যাটোচাকে। —কাঁপা কাঁপা অস্ফুট গলায় বলে নীল।

—নাঃ, নাঃ, সব বন্ধ করে দেব আমি। আমি কিচ্ছু চাই না। তুই শুধু ভাল হয়ে উঠ নীল। আমি শুধু তোকে চাই, তোকে ফিরে পেতে চাই। —নীলের বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে বলে ক্যাপ্টেন মিল ফিশার।

—না ড্যাড, কিছু বন্ধ করবেনা তুমি। আমি সব সময়েই তোমাদের পাশে থাকব। স্যান্ডো, জনসন, কেমন আছে? —মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও সহকর্মীদের কথা জিজ্ঞেস করতে ভোলে না নীল।

—স্যান্ডো আর নেই। তবে বদমাইস জনসন ভাল হচ্ছে। জনসনটা বেঁচে যাবে। কান্নাঝরা গলার উত্তর দেয় ক্যাপ্টেন।

—ড্যাড, তুমি তো আমায় ভালবাস। আমার শেষ অনুরোধটা রাখবে? —ক্যাপ্টেনের দুহাত জড়িয়ে ধরে ক্ষীণকন্ঠে বলে নীল।

—ইয়েস মাই সান। তোর সব কথাই রাখব আমি। বল, কি চাস্ তুই। —নীলের মুখের উপর ঝুকে পড়ে বলে ক্যাপ্টেন।

—জনসনকে একটু ডাক না ড্যাড। ওকি আসতে পারবে আমার কাছে?

জনসনকে কোনও রকমে ধরে নিয়ে আসা হয় নীলের বিছানার পাশে। মৃতপথযাত্রী অসহায় নীলের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে জনসন। কাঁপতে কাঁপতে নীলকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে জনসন হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে। বলে—নীল, বিশ্বাস কর, আমি তোমায় ভালবাসি। সেই ছোট্ট বার বছরের নীল কতবার আমার পিঠে চড়ে সমুদ্রে ঘুরে বেড়িয়েছ, মনে আছে?

—হ্যাঁ জনসন, সব মনে আছে।

—তোমাকে আমি মারতে চাইনি নীল। তোমাকে আমি মারতে পারি না নীল। ওঃ,

মাই সান—কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে জনসন নীলের বুকের উপর।
—জানি জনসন। রাগে তুমি এসব করেছ। তুমি আমাকেও ভালবাস, ট্রেজার স্যালভোর্সকেও ভালবাস, তাই না?
—হ্যাঁ নীল। আমি ভালবাসি তোমাকে, তোমার এই কোম্পানিকে। এখন কি করি বলত নীল? একি করলাম আমি? আমি তো তোমার ক্ষতি হোক চাই নি।
—ড্যাড।
—ইয়েস মাই সান।
—তুমি জনসনকে ক্ষমা কোর ড্যাড। ও ওর ভুল বুঝেছে। স্যাণ্ডোর উপর আক্রোশেই এসব করেছে। ও কিন্তু সত্যি আমাদের ভালবাসে। এরপর স্যান্ডের পয়েন্টে জনসনকে কাজ করতে দিও। দেখ, ঐ পারবে ডি-অ্যাটোচাকে উদ্ধার করতে।
—নীল! একি বলছ তুমি! আমাকে ক্ষমা করবে! না ক্যাপ্টেন, কক্ষনো না। আমার মত নিষ্ঠুর, বেইমানকে ক্ষমা কোর না, কিছুতেই কোর না। আমাকে পুলিশে দাও। যত কঠোর হয়, তত কঠোর সাজা দাও।
—জনসন, এই শেষবারের মত বলছি তোমায়, তুমি আত্মীয়ের মত থাক এখানে, আমার আঙ্কল জনসন হয়ে। তুমি দেখিয়ে দিও আঙ্কল, যে কাজ কেউ পারল না, সেই কাজ আমার এই আঙ্কল জনসন পারল। দেখিয়ে দিও, তুমি বেইমান নয়, তুমি আমাদের ট্রেজার স্যালভোর্সের সেভিয়র, ত্রাণকর্তা। তার আগে তোমার ছুটি নেই আঙ্কল।
—হোয়াট এ পানিশমেন্ট! একি কঠোর দন্ড দিয়ে যাচ্ছ নীল। বাট আই প্রমিস, তোমার আদেশ আমি মানব, মানব, মানব। —কাঁদতে কাঁদতে দুহাতে নীলকে জড়িয়ে থাকে জনসন।
অপার্থিব হাসি ছড়িয়ে পড়ে নীলের মুখে। তারপর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে নীল। হাহাকার বেদনার মাঝে চিৎকার করে উঠে ক্যাপ্টেন,—মাই সান, তুমি সত্যিই অপূর্ব। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও শত্রুকে করে দিয়ে গেলে আমাদের চিরদিনের মিত্র।
আর জনসন? সে নীলকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে মোহগ্রস্থের মত শুধুই বিড় বিড় করে বলে চলেছে,—নীল, তোমার আদেশ মানব-মানব-মানব।

১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাস এমনি দুঃখ বেদনায় কেটে গেল ট্রেজার স্যালভোর্সের। নীলের মৃত্যু এত কঠোর হয়ে সবার বুকে বেজেছিল যে কোন কাজই হয়নি ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে।
এপ্রিলের প্রারম্ভে জনসন নতমস্তকে এসে দাঁড়ায় ক্যাপ্টেন ফিশারের কাছে। খুব নম্র বিনীত গলায় বলে—স্যার, এবার সমুদ্রে নামতে চাই, আপনি যদি অনুমতি দেন। উদাস বেদনার্ত চোখে ক্যাপ্টেন ফিশার তাকায় জনসনের দিকে। জনসন একপলক

ক্যাপ্টেনের দিকে তাকায়, তারপর মাথা নত করে। দূরে সী-ঈগলের ডেকে পাণ্ডুর মুখে বসে মিসেস ডোলারিস ও রোজারিনা। প্রিয়জনদের হারানোর ব্যথা দুজনের চোখের টলমল অশ্রুতে।

—স্যার, আমি কি নামতে পারি ?

—নামবে ? জনসন—কেমন অস্বস্তির ভঙ্গী ক্যাপ্টেনের।

—স্যার, নীলের আদেশ মানতেই হবে যে আমায়। তা না হলে আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে কি করে ? আমায় নামার অনুমতি দিন স্যার।

—ড্যাড, জনসনকে সমুদ্রে যেতে দাও। রোজারিনা যে কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করেননি ক্যাপ্টেন।

—তুই বলছিস !

—নীল যে বলে গেছে বাবা। জনসন আর ভুল করবে না। ও সত্যিই নীলকে ভালবাসত বাবা, তাই নীলের জন্যই ট্রেজার স্যালভোর্সের কাজ করবে জনসন।

—থ্যাঙ্ক ইউ রোজারিনা। তোমার যা ক্ষতি করেছি তার জন্যও আমায় ক্ষমা কোর। স্যাণ্ডোকে আমি ফিরিয়ে দিতে পারব না, তবে তোমাদের জন্য আমার জীবনকে বিলিয়ে দিতে দ্বিধা করব না।

—ও. কে. জনসন, তুমি যেতে পার সমুদ্রে। আশা করি তোমাকে বিশ্বাস করে আর আমি ঠকব না।

—ক্যাপ্টেন! আজ এই মুহূর্তে এর উত্তর যাই দিই না কেন হয়ত বিশ্বাস করবেন না, তবে দেখবেন, নীলের শেষ আদেশকে পালন করবই আমি। ডি-অ্যাটোচার সম্পদকে যতদিন না উদ্ধার করি সমুদ্রতল থেকে, ততদিন সী-ঈগলে, বা আমেরিকার মাটিতে পা দেব না, এই আমার প্রতিজ্ঞা স্যার।

জনসন স্যাণ্ডোর সার্চসীপ নিয়ে চলে গেল ডি-অ্যাটোচার খোঁজে।

জনসন সার্চসীপ নিয়ে স্যাণ্ডোর পয়েণ্টে যেতে যেতে ভাবতে লাগল, স্যাণ্ডো ডি-অ্যাটোচার কাছাকাছিই এসেছিল। কিন্তু সী-ঈগলে খবর পাঠাত না। জনসন জানে খবর না পাঠাবার কারণ। পাছে স্যান্ডোর সী ঈগলে পাঠান ওয়েরলেস ম্যাসেজ সে ট্যাপ করে নেয়। সত্যিই কি ভূত চেপেছিল তার। কি সর্বনাশ করে দিল ক্যাপ্টেনের পরিবারের ! কেমন হয়ে যায় জনসন।

সম্বিত ফেরে কিছুক্ষণ পরে। নাঃ, নাঃ, এভাবে অন্যমনস্ক হওয়া চলবে না তার। স্যান্ডোর চিন্তায় ফিরে আসে জনসন। ডি-অ্যাটোচার বিষয়ে যেসব খবর পেত নিশ্চয়ই কোথাও লিখে গেছে ও। সার্চ সীপের কেবিনে ঢুকে দেখে স্যান্ডোর ড্রয়ার। এই তো ডায়েরী। দ্রুত উল্টোয় ডায়রী। নাঃ, ডি-অ্যাটোচার বিষয়ে কিছু লেখা নেই। চিন্তিত হয় জনসন। কোথায় তবে সবকিছু খবর রেখে গেছে স্যান্ডো ?

স্যান্ডোর ডায়রীকে অন্যমনস্কভাবে আবার উল্টাতে উল্টাতে চিন্তা করতে থাকে জনসন। হঠাৎ দৃষ্টি আটকে যায়। এই তো তার সম্বন্ধেই লিখেছে স্যান্ডো। দ্রুত পড়তে থাকে কি লিখেছে স্যান্ডো।

"জনসন সব সময়েই আমাকে ফলো করছে দেখছি। নিজের স্পটে কাজ না করে আমার স্পটের চারপাশেই ঘুরছে। জানতে হবে ব্যাপারটা কি?"

ডাইরীর কিছু পাতা আবার উল্টায় জনসন। এই তো, আবার তার সম্বন্ধে লিখেছে···

"জনসন আমার ওয়েরলেস ম্যাসেজও ট্যাপ করছে দেখছি। বুঝতে পারছি ও অন্য কারুর এজেন্ট হয়ে কাজ করছে। নাঃ, ওয়েরলেসে সী ঈগলে জরুরী খবর আর পাঠাচ্ছি না। অন্য ব্যবস্থা করছি তার। ক্যাপ্টেনকে সময়মত কোডেড ম্যাসেজ পাঠিয়ে দেব।"

এই তো, এখানেই লিখেছে, কোডেড ম্যাসেজ পাঠিয়ে দেব। অর্থাৎ ডি-অ্যাটোচার খবর কোড করা আছে। কিন্তু কোথায়? কোথায় থাকতে পারে ম্যাসেজ কোড করা?

ডেক চেয়ারে বসে চিন্তা করতে থাকে জনসন, কোথায় সেই কোডেড ম্যাসেজ? ভাবতেই থাকে জনসন!

ডেক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় আবার। কেবিনের এদিক ওদিক খুঁজতে থাকে। হঠাৎ নজরে পড়ে টেপরেকর্ডারের উপর। টেপরেকর্ডার! হ্যাঁ, এটাও তো ম্যাসেজ রেকর্ড করতে পারে। দেখা যাক কি হয়। টেপরেকর্ডার অন করে জনসন। টেপ চালু হয়।

···জনসন একটা বেইমান। আমরা এতদিন ধরে যেসব তথ্য জোগাড় করেছি ডি-অ্যাটোচা সম্বন্ধে, সেসব অন্য কোম্পানিকে বিক্রি করে দিতে চাইছে জনসন। তাই কোডেই সব তথ্য রেখে দিচ্ছি। ওয়েরলেসে এসব খবর পাঠাইনি সী-ঈগলে। টু-ওয়েস্ট 22M। সি বেড মাইনাস 12M। গ্লিটারিং 1MU। TS সারভাইভস।···

টেপ বন্ধ করে জনসন। কি কোড এটা? এটার সমাধান করতে পারলেই মনে হচ্ছে আশার আলো দেখতে পাব। কোডটা মাথায় নিয়ে সমুদ্রে নামে এবার জনসন। টু ওয়েস্ট 22M। মানেটা কি? প্রতি মুহূর্তে কোডটা মাথায় ঘুরতে থাকে।

সমুদ্রতলে স্যান্ডোর ড্রিলিং পয়েন্টে এসে দাঁড়ায় জনসন। চারদিক ভাল করে তাকিয়ে দেখে, নূতন কিছু চোখে পড়ে কিনা। প্রথমদিনে বিশেষ কিছুই চোখে পড়ে না জনসনের। সেভাবেই খবর পাঠায় সী-ঈগলে।

দিন কয়েক পরে রিগ পয়েন্টের চারদিকে ছোট ছোট গর্ত করে টেস্ট হোল করল জনসন। নাঃ, এতেও কিছু ফল পেল না। ভাবতে থাকে জনসন, কি হোল?

হাল ছাড়বে না জনসন। ঠিক করল উত্তর, দক্ষিণ, পূব, পশ্চিম চারদিকেই একে একে গর্ত করে যাবে। এই পয়েন্টে যখন স্যান্ডো ছিল তখন এরই ধারে কাছে কিছু

পাবার কথাই। কিন্তু কোনদিক থেকে শুরু করবে? হঠাৎ কোডের কথাটা মনে আসে। টু ওয়েস্ট 22M। আরে, তবে ওয়েস্টে গেলে কি হয় দেখাই যাক না। পশ্চিমেই শুরু করে ড্রিলিং। এপ্রিল মাসটা শুধু পশ্চিম দিক ড্রিল করতেই চলে গেল।

১৯৮৫-র এপ্রিল শেষ হয়ে মে মাসও শুরু হোল। সেদিন ড্রিলিং চলছে ২২ মিটার পশ্চিমে। ড্রিলিং মেশিন গর্ত করে চলেছে। হঠাৎ আওয়াজ হোল কটাং কটাং। ড্রিল মেশিন বন্ধ হয়ে গেল। ড্রিলার বলল—মেটাল বডিতে মেশিন আঘাত করছে। ড্রিল করব কিনা বলুন।

—কি! মেটাল বডি! চমকে উঠে জনসন।

—হ্যাঁ স্যার। ১২ মিটার ড্রিল করতেই মেটাল বডিতে স্ট্রাইক করল। ড্রিলার উত্তর দেয়।

—মাই গড! সি বেডের নীচে বার মিটার যেতেই মেটাল বডির সঙ্গে ঠোক্কর লাগল! ড্রিলার, আমরা মূল পয়েন্ট থেকে পশ্চিমে কতদূরে সরে এসেছি?

—স্যার, আমরা বাইশ মিটার পশ্চিমে এসেছি।

—স্টপ! স্টপ ড্রিলিং! উত্তেজিত হয়ে উঠে জনসন।—ইউরেকা! ইউরেকা! কোডটা বুঝতে পেরেছি। পাগলের মত ছটফট করতে থাকে জনসন।

মনে মনে চিন্তা করে স্যান্ডোর কোডটাকে। টু ওয়েস্ট 22M। মানে, পশ্চিমে বাইশ মিটার যেতে হবে। ইয়েস, ঠিক ততটাই এসেছি। সি বেড মাইনাস 12M। অর্থাৎ, সি বেডের নীচে যেতে হবে বার মিটার। ইয়েস, ইয়েস, তাও গেছি আমি। গ্লিটারিং 1MU। এটার মানে কি? গ্লিটারিং! গোল্ড তো গ্লিটার করে। তবে কি মেটাল বক্স যাতে ড্রিলিং যন্ত্র আঘাত করল তাতেই এক মিলিয়ন গ্লিটারিং গো ড আছে? ওয়ারলেসে খবর যায় সী ঈগলে, কিছু লোক চাই। দু-একদিনের মধ্যেই।

—হোয়াই! কিছু ভাল খবর আছে?—ক্যাপ্টেন ফিশার সী ঈগল থেকে প্রশ্ন করেন।

—নাথিং স্যার। তবে পনের কুড়িজন লোক চাই। হার্ডি-অ্যাকুইনট হওয়া দরকার।

—জনসন, তোমাকে লোকের জন্য এক সপ্তাহ ওয়েট করতে হবে। অত তাড়াতাড়ি দু-একদিনের মধ্যে লোক পাবে না।

—ও. কে. স্যার। ওয়েরলেস কানেকশন কেটে দেয় জনসন।

একসপ্তাহ পরে কুড়িজন নূতন ডুবুরী এল। সমুদ্রতলে এল তারা জনসনের কাছে। জনসন সেদিনই তাদের বাইশ মিটার পশ্চিমের রিগ পয়েন্টে খুঁড়তে লাগিয়ে দিল। কুয়োর মত বড় গর্ত করতে লাগল কুড়িজন অ্যাকুইনট। সাতদিনের চেষ্টায় বার মিটার গভীরে পোঁছাল তারা কেসিয়ন ড্রাইভ করে।

—আহ্! স্যার, এ যে তালাচাবী লাগাল মেটাল বক্স!
কথাটা শুনে দ্রুত গর্তে নেমে আসে জনসন! ছোট কারুকার্যময় বাক্স। দুহাতে উঠিয়ে নেয় বাক্সকে। তারপর বাক্সের নীচে তাকাতেই চমকায়। মাই গড! এ যে আটটা গোল্ড কয়েন!
—ফ্রেন্ডস। খোঁজ, আর কিছু পাও কিনা।
—সবাই গর্তের চারপাশ দেখতে থাকে।
—স্যার! এখানে একগাদা সিলভার বার দেখা যাচ্ছে।
—এ্যাঁ, রুপোর বার! এ তবে নিউস্ট্রা-সেনহারা-ডি-অ্যাটোচার ট্রেজার! ছুটে আসে জনসন। একরাশ রুপোর বার সমুদ্রতলের গহ্বরে পড়ে। রুপোর বারগুলোর উপর হাত বুলায়। তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে। —মাই সান নীল, এই দেখ ডি-অ্যাটোচার ট্রেজারের কিছু আমি উদ্ধার করেছি। তোমার কঠোর শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছি মাই সন।

সী-ঈগলে আজ খুশীর জোয়ার। এই প্রথম পনের বছর পাঁচমাস পরে ট্রেজারের খানিকটার দেখা পেল ট্রেজার-স্যালভোর্স। মাঝ রাত পর্যন্ত সেদিন রুপোর বার তালাবন্ধ বাক্স উপরে উঠাল জনসন। আটটা সোনার মুদ্রা ক্যাপ্টেনের হাতে দিল। তালাবন্ধ বাক্স খুলতেই বেরিয়ে পড়ল দামী জেমস স্টোন।
জনসন ধীরে ধীরে এল মিসেস ডোলারিসের কাছে। —ম্যাডাম, আমি অনেক অপরাধ করেছি আপনার কাছে। কিন্তু দেখুন, আমি সত্যি খারাপ নয়, বেইমান নয়। বলুন, আমি কি সত্যিই খারাপ?
—না জনসন, আমরা সবাই তোমাকে ক্ষমা করেছি। এ যে নীলের আদেশ ছিল জনসন।
কথাটা বলতে বলতে জল গড়িয়ে পড়ে মিসেস ডোলারিসের দু চোখ দিয়ে।
মিস ম্যাকহোলি গোল্ড কয়েন, রুপোর বার, জেমস-স্টোনের সব নিয়ে গিয়ে রাখল নীলের ছবির নীচে। —ডিয়ার নীল, দেখ, আমরা ট্রেজারের কিছু পেয়েছি। তোমার জনসন তোমার আদেশ রেখেছে সন।

জনসন যে ট্রেজার উদ্ধার করল বাজারে তার দাম হল কুড়ি লক্ষ ডলার। নীলের মৃত্যুর পর এই প্রথম খুশীর ঝলক দেখা দিল সী-ঈগলে, ট্রেজার স্যালভোর্সের প্রতিটি লোকের মুখে।
এরপর চলল জনসনের কাজ দিনরাত। একবার যখন সমুদ্রতলে ডি-অ্যাটোচার সোনা রুপোর বারের সন্ধান পেয়েছে তখন ডি-অ্যাটোচার খুব দূরেতে যে তারা নেই বুঝতে পারে জনসন।

প্রতিদিনের কাজের শেষে পরামর্শ চলে ক্যাপ্টেন ফিশারের সঙ্গে। ক্যাপ্টেন এতদিনের ড্রিলিংএর ছবি, কোন কোন জায়গায় ড্রিলিং হল তার নক্সা সব টেবিলের উপর রেখে চিন্তা করে। শেষে বলে—জনসন, আমরা ডি-অ্যাটোচার কাছাকাছি এসেছি বটে কিন্তু তার লোকেশন ঠিক এখনও পাইনি। ফ্লোরিডা কিইস ওয়েস্টের দুই মাইল পশ্চিমে এখন যেখানে আমরা কাজ করছি সেখান থেকে আরও পশ্চিমে সরে যাব। প্রয়োজনে আরও দু' তিন মাইল ড্রিল করে দেখতে হবে। তোমার কুড়িজন অ্যাকুইনট যখন আছে, তোমার হাতে তিনটে মেশিনও আছে তখন একসঙ্গে তিনটি করে ড্রিলিং কর।

তাই হবে ক্যাপ্টন। আপনি ঠিকই বলছেন। যতটা দ্রুততায় পারা যায় এবার কাজটাকে শেষ পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে।

—হ্যাঁ জনসন। ডি-অ্যাটোচার কি হয়েছিল তার ছবিটা পরিষ্কার বুঝতে পারছি এই দীর্ঘ সাড়ে পনের বছরের একটানা অভিযানের মধ্যে দিয়ে।

—এটা তো বুঝছি, যেখানে ডি-অ্যাটোচা ডুবেছিল, সেখান থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছে।

—হ্যাঁ জনসন এটা তো বোঝা যাচ্ছে। তবে কেন সরে গেল জান? হাভানা উপকূল থেকে এই স্প্যানীশ জাহাজ যখন ফ্লোরিডা স্ট্রেইটসএর দিকে যাচ্ছিল তখন শুরু হয় প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়-হ্যারিকেন। নিউস্ট্রা-সেনহারা ডি-অ্যাটোচার সঙ্গে সঙ্গে আসছিল আরও নয়টা সোনা-রুপো বোঝাই জাহাজ। ঘূর্ণিঝড়ে সব কয়টাই ডুবে যায়। তাই সঠিক বোঝা যাচ্ছে না এই সোনা রুপো যা পেয়েছি তা কোন্ ডুবো জাহাজের, ডি-অ্যাটোচার না অন্য নয়টি ডুবো জাহাজের কোন একটির।

—বলেন কি স্যার! আরও নয়টা সোনা রুপো বোঝাই জাহাজ ডুবেছে এখানে?

—হ্যাঁ, জনসন।

—মাই গড! এ জায়গা তবে তো সলোমন মাইনস-এর মত সোনা-রুপোর ভান্ডার হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ জনসন। দশটা জাহাজ পরপর ডুবল। প্রচন্ড সমুদ্রঝড়ের ধাক্কায় সবকটাই তার ডুবে যাওয়া জায়গা থেকে সরে গেল পশ্চিমের দিকে। দেখবে জনসন, যত পশ্চিমের দিকে যাবে ততই বেশী করে ট্রেজার পাবে। এখন যত দ্রুততালে কাজ করবে ততই ভাল। সমুদ্রতলে কখন কি বিপদ আসে, ঝড়ঝঞ্ঝা কখন আসে বলা তো যায় না। তাই তাড়াতাড়ি কাজ করাই ভাল।

তাই হবে ক্যাপ্টন।

দিনে বার ঘন্টা করে কাজ করাচ্ছে ডুবুরীদের জনসন। তিনটে ড্রিলিং মেশিন কাজ করেই চলেছে। মে, জুন, জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত অভিযানে প্রায় প্রতিদিনই

কিছু না কিছু ট্রেজার পেয়েছে জনসন। হিসাব করে, ক্যাপ্টেন ফিশার যা বলেছেন, তাতে দেখছে জনসন আজ পর্যন্ত মোট ট্রেজার পেয়েছে আট কোটি ডলার। এতে ট্রেজার স্যালভোর্সের ধারদেনা সবই শোধ হয়ে গেছে। কিন্তু ক্যাপ্টেন ফিশার বলছেন মূল ট্রেজার এখনও পাইনি। ভাবে জনসন, মূল সম্পদ তাহলে কত ডলারের হবে !

ক্যাপ্টন ফিশার বলে দিয়েছেন জনসনকে, সবাইকে বলে দিও, ট্রেজার পেলে প্রতি অ্যাকুইনটস পাবে সম্পদের ১/৪ শতাংশ বোনাস হিসাবে। জনসন পাবে, এক শতাংশ ট্রেজারের। জনসন ক্যাপ্টেনের কথা সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে। তাই উৎসাহ প্রতিটি অ্যাকুয়েনটের মনে। প্রতিদিন ট্রেজার পাওয়ায় তাদের মনেও আশা জাগছে ভীষণভাবে।

সেদিন ১৯৮৫ সালের ২০ শে জুলাই, শনিবার। সমুদ্রতলে কাজ শুরু হয়েছে অন্য দিনের মতই। জনসন কাজ তদারক করছে। বিশজন ডুবুরী খুঁজে চলেছে সোনা রূপো বোঝাই গ্যালিয়ন ডি-অ্যাটোচাকে।

সী-ঈগল কন্ট্রোল বোর্ডে কখনও ক্যাপ্টেন ফিশার কখনও মিস ম্যাকহোলি পালা করে বসে থাকেন, ট্রেজার পাবার সুখবরের আশায়। হ্যাঁ, ট্রেজার পাচ্ছে তারা। কিন্তু আসল ট্রেজার ডি-অ্যাটোচাকেই পায়নি তারা। তারই খবরের জন্য প্রতিদিন সাগ্রহে বসে থাকে ক্যাপ্টেনরা।

মিস ম্যাকহোলি তখন কন্ট্রোল বোর্ডে। ক্যাপ্টেন ফিশার একটু দূরে দাঁড়িয়ে। এমনি সময়ে জ্বলে উঠল লাল আলো কন্ট্রোল বোর্ডে।

—ক্যাপ্টেন, সমুদ্রতল থেকে জনসনের সিগন্যাল। তাড়াতাড়ি আসুন। মিস ম্যাকহোলির ত্রস্ত চিৎকার।

—সী-ঈগল স্পীকিং। ক্যাপ্টেন স্পীকিং।

—পেয়েছি ! আমরা পেয়েছি !

—আরও ট্রেজার পেয়েছ ? সী-ঈগল থেকে প্রশ্ন করেন ক্যাপ্টেন ফিশার।

—পেয়েছি নিউস্ট্রা-সেনহারা-ডি-অ্যাটোচাকে, যাকে আমরা খুঁজছি সাড়ে পনের বছর ধরে।

—অ্যাঁ ! ডি-অ্যাটোচা পেয়েছে ! সাড়ে তিনশ বছর আগে ডুবে যাওয়া স্প্যানিশ সোনা রূপো বোঝাই জাহাজকে পেয়েছ জনসন ?

—ইয়েস ক্যাপ্টেন। মাস্তুল ভাঙ্গা নিউস্ট্রা-সেনহারা-ডি-অ্যাটোচা একদিকে হেলে পড়ে আছে। সমুদ্রতল থেকে ৩৪ মিটার নীচে, বালি কাঁকরের স্তুপের তলে এখন ডি-অ্যাটোচা। ক্যাপ্টেন, উই গট্ ইট্, গট্ ইট্ স্যার।

—আহ! ষোলটা বছর কি অপরিসীম যন্ত্রণা, বেদনায় আমরা চালালাম এই অনুসন্ধান ম্যাকহোলি!

—হোয়াট এ প্লেসেন্ট প্লেসার। আনন্দে মিল ফিশারকে জড়িয়ে ধরে মিস ম্যাকহোলি।

ধীরে ধীরে সোনার কয়েন ভর্তি বাক্স ডি-অ্যাটোচার ভাঙ্গা কেবিন থেকে উদ্ধার করল জনসনরা। পুলি দিয়ে একে একে উঠান হল সী-ঈগলে।

পঁয়ত্রিশটা বাক্স ভর্তি গোল্ড কয়েন, বারশ বিরাট রুপোর বার, আঠারোটা জুয়েল বাক্স। সব পরপর সী-ঈগলের ডেকে রাখা হল। সী-ঈগলের ডেক হয়ে উঠল ট্রেজার আইল্যান্ড।



ট্রেজার উদ্ধারের পর ক্যাপ্টেন মিল ফিশার ও তার স্ত্রী মিসেস ডোলারিস। ফিশার সোনার কয়েন হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে।

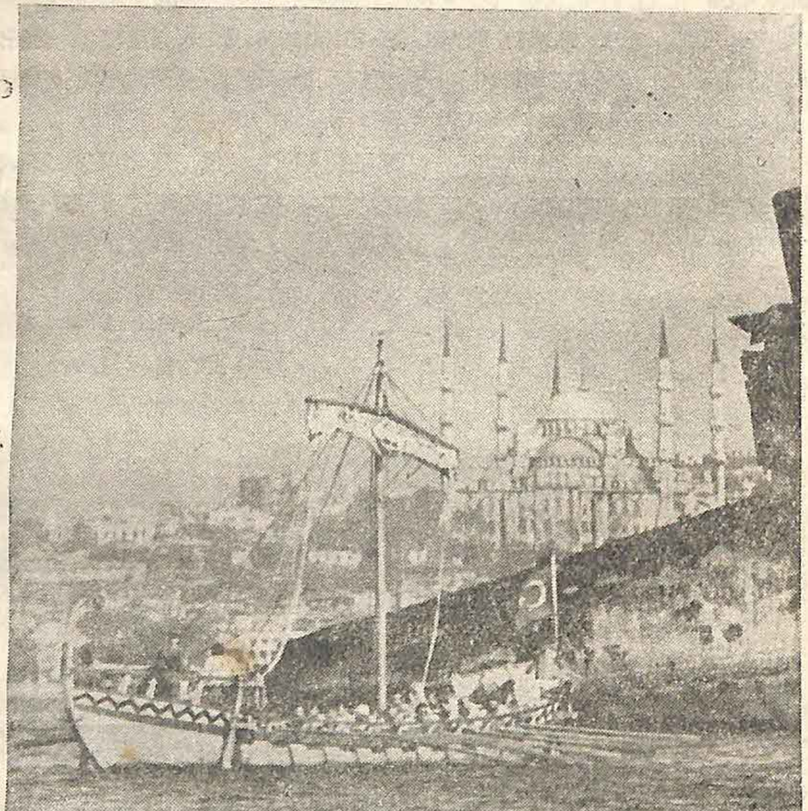
ক্যাপ্টেন ফিশার হিসাব করে বললেন, আজকের ট্রেজারের মূল্য হবে ৪০ কোটি ডলার।
—হাই! আনন্দে সবাই চিৎকার করে উঠল। অ্যাকুইনটসরা খুশীতে নাচতে শুরু করল সী-ঈগলের ডেকে।

—মিস ম্যাকহোলি, জনসন কোথায়? জনসনকে দেখছি না? খুশীর আনন্দের মাঝখানে ক্যাপ্টেন মিল ফিশারের খেয়াল হয় জনসন নেই সেখানে।
—তাই তো, জনসন কোথায় গেল? ম্যাকহোলিও অবাক হয়।
সবাই খুঁজতে থাকে। খুঁজতে খুঁজতে সবাই এসে হাজির হয় সেই কেবিনে যেখানে একসময় ছোট্ট নীল ফিশার থাকত। নীল ফিশারের ছোট্ট বয়সের হাসিখুশীময় ছবিটাকে বুকে জড়িয়ে হু হু করে কেঁদে চলেছে জনসন, আর বিড়বিড় করে বলছে, —মাই সন, দেখ, দেখ, তোমার স্বপ্নের ডি-অ্যাটোচাকে উদ্ধার করেছি। ট্রেজার উদ্ধার করেছি নীল। তোমার আদেশ আমি রাখতে পেরেছি। নীল, মাই চাইল্ড, এক বারের জন্য এসো, ফিরে এসো আমার কাছে।
সুখ আর বেদনার ধ্বনি এক করুণ অপূর্ব মূর্ছনায় ভরিয়ে দেয় সী-ঈগলকে, গালফ অফ মেক্সিকোর আকাশ বাতাসকে। শেষ বেলার সূর্য তখন মনে হল যেন বড় ক্লান্ত বড় পান্ডুর।

[ইংলন্ডের "ডেইলি টেলিগ্রাফে", সোমবার ২২শে জুলাই, ১৯৮৫-তে এই ট্রেজার পাবার সংবাদ প্রকাশিত হয়।]

জ্যেইসনের স্বর্ণগুহার সন্ধানে

টিম সেভেরিন অ্যাথেইনস্ শহরে এসেছে আজ কদিন। সমুদ্রে উত্তেজক অ্যাডভেঞ্চার করে বেড়ানই নেশা টিম সেভেরিনের। আজ কয়েকমাস হোল এক দারুণ খবর ভাবিয়ে তুলেছে টিমকে। এটাকে খবর বলা ঠিক হবে না, বরং জনশ্রুতি শব্দটা ব্যবহার করলেই ভাল হয়। তিন হাজার বছর ধরে এই জনশ্রুতিকে কেন্দ্র করেই চলে আসছে



আর্গোর যাত্রা শুরু স্বর্ণগুহার সন্ধানে

মহাকাব্য আর্গনটিকা। খৃষ্টপূর্ব তিন শতকে আলেকজান্দ্রিয়ার মুখ্য লাইব্রেরিয়ান অ্যাপোলোনিয়াস্ রোডিয়াস্ লেখেন এই মহাকাব্য আর্গনটিকা।

টিম সেভেরিনের বহুদিনের সঙ্গী পিটার হুইলার কয়েকদিন আগে এসেছিল টিমের কাছে। সাধারণতঃ টিম সেভেরিন যেখানেই নৌ-অ্যাডভেঞ্চারে যায় সেখানে পিটার হুইলার সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড হিসাবে কাজ করবেই। টিম এছাড়া সবসময়েই পিটারকে সঙ্গে নিত তারও একটা গোপন কারণ আছে। পিটারের মত কাঠের কাজ, বিশেষ করে নৌকাজাতীয় যানের সারাই-এ অদ্বিতীয় লোক গ্রীসে আজকাল পাওয়া মুস্কিল। তাই বলতে গেলে ক্যাপ্টেন টিম সেভেরিন আর মাষ্টার কার্পেন্টার পিটার হুইলারকে হরিহরআত্মা বলাই উচিত।

এক এক অ্যাডভেঞ্চারের শেষে টিমের সঙ্গী-সাথীরা সবাই যে যার জায়গায় চলে যায়। তারপর দীর্ঘদিন ধরে চলে চিন্তাভাবনা, কেমন হবে, কোথায় হবে আগামী অভিযান। বলতে গেলে এমনি এক কল্পনা-জল্পনার দিনেই পিটার হুইলার এল টিম সেভেরিনের কাছে।

সময়টা তখন ১৯৮১ সালের মে মাস। পিটার হুইলারকে দেখে লাফিয়ে উঠল টিম সেভেরিন।—আহ! হোয়াট এ সারপ্রাইজ! হঠাৎ বন্ধু!—খুশীতে হুইলারকে জড়িয়ে ধরে বলে টিম। তা থাকছ তো কিছুদিন?

—হ্যাঁ, থাকতেই হবে ক্যাপ্টেন। একটা জরুরী কথা বলতেই তোমাকে এসেছি। ব্যাপারটা শোনার পর কি করতে চাও তুমি বুঝে, তারপর থাকা না থাকা ঠিক হবে।

—কি ব্যাপার বলতো পিটার? হেঁয়ালী করে এভাবে বলছ কেন? জরুরী কথা, কি করতে চাই আমি, কি বলছ? কিছুই তো বুঝছি না পিটার।

—আরে দম নিতে দাও। কফি দাও এক পট। একটু বিশ্রাম করি, তারপর বলব সব।

—রাইট, রাইট।—হেঁসে বলে টিম।—তা যেরকম চমক দিয়ে শুরু করলে তাতে তোমাকে কফি-ড্রিঙকস্ দেব সেকথাই মনে ছিল না। বি কমফরটেবল। দম নাও। কফি খাও। ধীরে-সুস্থে বল, কি এমন খবর যার জন্য এমন ছটফট করতে করতে ছুটে এসেছ এখানে।

পিটার হুইলার শুরু করল—দেখ ক্যাপ্টেন, তিন বছর আগে তোমার সঙ্গে সিন্দবাদ-ভয়েজ থেকে ফিরে এক বছর তো স্রেফ বসেই কাটালাম। তারপর স্রেফ শুয়ে-বসে মেজাজ খারাপ হোতে লাগল। তাই ভাবলাম এক নূতন ধরণের নৌকো বানাই। নৌকোটা খুব পুরোনো দিনের ঢঙে হবে। কথাটা ভেবেই চিন্তা হোল, পুরোনো ঢঙের নৌকোটা হবে কেমন? শুরু করলাম লাইব্রেরীতে যাওয়া। ওখানেই আর্গনটিকার কাহিনী শুনলাম। অ্যাপোলোনিয়াস রোডিয়াসের লেখা বইটাতে দেখলাম

আর্গোনটিকা নৌকার চেহারাটা কেমন। ব্যাপারটা দারুণ রোমাঞ্চকর, তাই তোমার কাছে ছুটে এলাম।

—দেখ পিটার, তোমার কাহিনীর মধ্যে বিন্দুমাত্র রোমাঞ্চ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। গল্প-কথায় কি আছে তাই নিয়ে আমাদের মত অ্যাডভাঞ্চিরষ্টরা ভাবতে বসলেই তো মুস্কিল।—বেশ ধমক দিয়েই বলে টিম।

—আহহ ক্যাপ্টেন, শুনবে তো সব। তোমার মত প্রথমে ঐ গল্প, বা ঐ বইটা সম্বন্ধে আমারও কোন আগ্রহ ছিল না। শুধু তিন হাজার বছর আগের নৌকোর ঢঙটা দারুণ ছিল বলে তার স্কেচ আঁকতাম। এমনি সময়ে হঠাৎ নজর পড়ল এই ম্যাপটার দিকে।

ম্যাপটা পকেট থেকে বার করে টেবিলে রাখল পিটার হুইলার। ম্যাপটার উপর ঝুঁকে পড়ল টিম সেভেরিন।—হুঁ, এ দেখছি প্রায় দেড় হাজার নটিক্যাল মাইল নৌকা পথের রুট।

—হ্যাঁ ক্যাপ্টেন। গ্রীসের কাছাকাছি ভোলোসের লাগোয়া অ্যাইজেন সমুদ্র থেকে শুরু করে ব্ল্যাক-সী দিয়ে তুরস্ক দেশ পেরিয়ে সোভিয়েত দেশের প্রান্তশহর কোল্চিসে যাবার জলপথের নক্সা এটি।

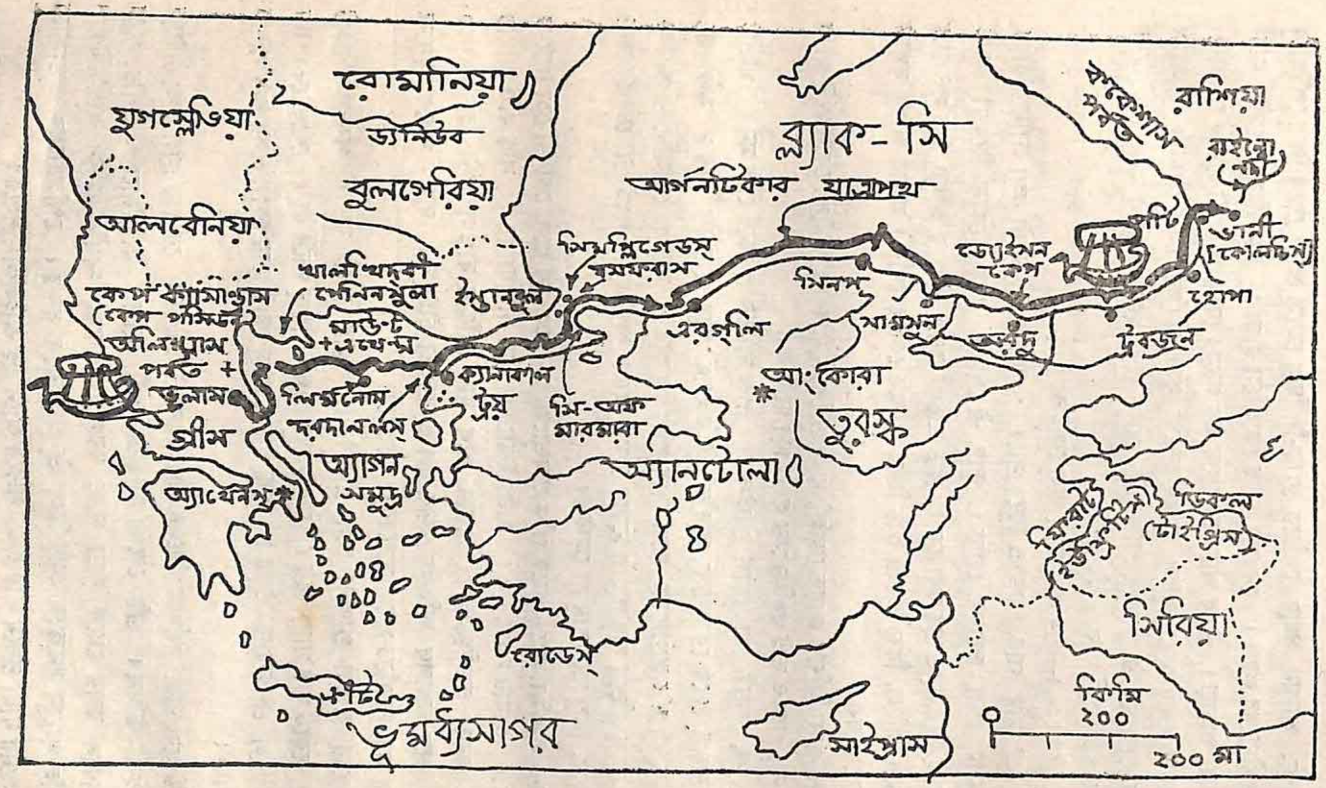
—সবই তো বুঝছি পিটার, এই জলপথের নক্সায় হবেটা কি। নক্সাটা বানালো কে?

—ক্যাপ্টেন, এখানেই সেই জনশ্রুতির গল্পটা এসে যাচ্ছে। এই নক্সা তৈরী করেছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার মুখ্য গ্রন্থাগারিক অ্যাপোলিয়ানাস্ রোডিয়াস। আর এটা বানিয়েছিলেন রাজকুমার জ্যেইসনের জলপরিক্রমণের কাহিনী অনুসারে। এই কাহিনীই ছিল মহাকাব্য আরগনটিকায়।

—রাজকুমার জ্যেইসন আবার কে? মহাকাব্য আরগনটিকার ব্যাপারটাই বা কি?—পিটারের কথাবার্তায় ক্রমেই অবাক হোতে থাকে ক্যাপ্টেন টিম সেভেরিন।

—তাহলে মহাকাব্যের ব্যাপারটা কি, সেটাই বলি আগে। এই মহাকাব্যের সময়কাল আজ থেকে তিন হাজার বছর আগে, অর্থাৎ ১২৮০ খ্রীষ্টপূর্ব দিনের কাহিনী এটা। সে সময় গ্রীসে যিনি রাজা ছিলেন তিনি হঠাৎ মারা গেলেন। জ্যেইসন যুবরাজ হয়েও কিন্তু সিংহাসনে বসতে পারলেন না। কারণ জ্যেইসনের কাকা অত্যাচারী পেলিয়স্ সিংহাসন দখল করে বসল। পেলিয়সের এই অন্যায় আচরণে রাজ্যের মন্ত্রী-সভাসদ-প্রজারা সবাই ভীষণ অখুশী হোল। ব্যাপার গোলমেলে দেখে পেলিয়স্ বলল ঠিক আছে, জ্যেইসনকে রাজ্য ফিরিয়ে দেব, কিন্তু তার আগে ওকে একটা কাজ করতে হবে আমার জন্য। জ্যেইসন যদি কাজটা করে দিতে পারে তবে রাজ্য ফিরে পাবে সে।

কথাটা শুনে জ্যেইসন বলল, ঠিক আছে, আপনার কাজটা করে দেব আমি। বলুন কি কাজ।



গ্রীসের ভোলাস থেকে রাশিয়ার কোলচিস যাবার জলপথের নক্সা—জোইসনের আর্গোনটিকার যাত্রাপথ

দেখ বাপু, অ্যাগন সমুদ্র পেরিয়ে ব্ল্যাক-সি দিয়ে চলতে চলতে শেষে গিয়ে পেঁছাবে রাইনী নদীমুখের কাছে। সেখানে আছে কোলচিস রাজ্য। কোলচিস্ রাজ্যের মধ্যে রয়েছে বহু পাহাড়। ঐসব পাহাড়ের কোন এক গুহার দেওয়াল তৈরী হয়েছে সোনায়। আর একটি সোনার দেওয়ালে ঝুলছে অপূর্ব কারুকার্যময় একটি সোনার গালিচা। জ্যেইসন, তোমাকে ঐ সোনার গালিচাটা এনে দিতে হবে।—হেসে বলে জ্যেইসনের বদমাইস অত্যাচারী কাকা পেলিয়স।

—বেশ, এনে দেব।—ভয় না পেয়েই বলে জ্যেইসন।

—হ্যাঁ, তা যদি পার, রাজ্যও ফিরে পাবে। তবে বাপু, একটা কথা জানিয়ে রাখি, কোলচিসের রাজা ভয়ংকর লোক। তার ঐ সোনার রাজ্যে কোন বিদেশী এলেই সঙ্গে সঙ্গেই তার মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়। কত জায়গা থেকে কত রাজপুত্র, কত সওদাগর কোলচিসে গেছিল, কিন্তু তাদের আর ফিরে আসতে কেউ দেখেনি। যাবার আগে কথাটা স্মরণ রেখে যেও।

ধূর্ত পেলিয়স্ নিশ্চিত জানত কোলচিস রাজ্য থেকে যুবরাজ জোইসন কোনদিনই জ্যান্ত ফিরবে না, রাজ্যও তাই পেলিয়সের হাতছাড়া হবে না।

যাই হোক, রাজী তো হোল জ্যেইসন। কিন্তু দুশ্চিন্তায় ছেয়ে গেল মন। সত্যিই তো, ভোলস্ থেকে কোলচিস্, সুদীর্ঘ এই জলপথ পার হবে কি করে? ঝড়-ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণী, দুর্দান্ত জলস্রোতের মধ্যে দিয়ে যাবে কি করে? তারপর কোলচিসের ভয়ংকর রাজার চোখ এড়িয়ে স্বর্ণগুহায় ঢুকবে কেমন করে? স্বর্ণগুহার পথটাইবা চেনাবে কে? চিন্তা করে, কিন্তু ভয় পায় না জ্যেইসন।

জ্যেইসন প্রার্থনা করতে থাকে গ্রীক দেবতাদের। মনে মনে বলে, তোমরা তো ন্যায়ের দেবতা। আমার সহায় হও। রাজ্য উদ্ধারে আমায় সাহায্য কর। শক্তি দাও আমায় শক্তির দেবতা হারকিউলিস। কোন পথে যাব দেখিয়ে দাও সর্বদ্রষ্টা লিনসিয়াস। কেমন করে জলপথ অতিক্রম করব, বল জলদেবতা টাইফুস। দুর্গম পথকে আনন্দে রমণীয় কর, সংগীতে-সুরে, সুরদেবতা অর্ফিয়াস।

জ্যেইসনের আকুল প্রার্থনা চলে প্রতিদিন। সপ্তাহ কেটে যায়। পক্ষকাল কেটে যায়। কেটে যায় মাস, বছর। জ্যেইসনের প্রার্থনা কিন্তু থামে না। শেষে, দেবতারা সন্তুষ্ট হল জ্যেইসনের উপর। শুরু হয় যুবরাজ জ্যেইসনের কোলচিসের স্বর্ণগুহার অভিযান।

স্বর্গের দেবতারা বানিয়ে দিলেন এক অপূর্ব নৌকা। নৌকার হাল ধরল টাইফুস আর হারকিউলিস। গ্রীক দেশের যোদ্ধারা সঙ্গী হোল। অর্ফিয়াসের বাঁশীর সুরে আইলকাস বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করল জ্যেইসনের স্বর্গীয় নৌকা আর্গনটিকা। থেসেলি শহরের সমৃদ্ধতম বন্দর ছিল ঐ আইলকাস বন্দর। পেলিয়াসের অত্যাচারে জ্যেইসনের বাবা প্রথমে তার রাজ্য সরিয়ে আনে এই আইলকাস শহরে।

আর্গনটিকা পাহাড়ঘেরা আইলকাস বন্দর ছেড়ে কিছুটা এগিয়ে অ্যাগন সমুদ্রে পড়ে পথ হারিয়ে ফেলল। সর্বদ্রষ্টা লিনসিয়াস তখন সঠিক পথে নিয়ে চলল আর্গনটিকাকে। এমনি করে চলতে চলতে শেষে জেইসনের নৌকা এসে পেঁছাল কোলচিসে।

কোলচিসে জেইসন পেঁছাতেই প্রাসাদশিখর থেকে কোলচিস রাজ্যের রাজকন্যা মিডিয়া অদ্ভুত সুন্দর আর্গনটিকাকে দেখতে পায়। দেখতে পায় সুপুরুষ রাজকুমার জেইসনকে। রাজকুমারকে ভাল লেগে যায় রাজকন্যা মিডিয়ার। শেষে এই রাজকন্যা মিডিয়াই গোপন পথ দেখিয়ে দেয় জেইসনকে। জেইসন পেঁছায় স্বর্ণগুহায়। স্বর্ণগুহা থেকে উদ্ধার করে স্বর্ণগালিচা গোল্ডেন-ফ্লিস। তারপর রাজকন্যা মিডিয়া আর স্বর্ণগালিচা গোল্ডেন-ফ্লিসকে নিয়ে ফিরে আসে গ্রীসের সেই বন্দর আইলকাসে। পেলিয়াসের কাছ থেকে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করে। এই হোল আর্গনটিকা মহাকাব্যের মূলকথা।

অনেকক্ষণ কথা বলার পর থামে পিটার হুইলার।

—গল্পটাতো মন্দ নয় পিটার, কিন্তু গল্প তো গল্পই। আমাকে কি করতে বলছ তুমি? টিম সেভেরিন বুঝতে পারে না সঠিক কি বলতে চাইছে পিটার।

—ক্যাপ্টেন, আমি মাসখানেক ধরে ভোলাস শহরের আশেপাশে ঘুরেছি। আমি ভোলাস শহরের আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়ামের কিউরেটরের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি বলেছেন, এই ভোলাস শহরেরই প্রাচীন নাম ছিল আইলোকাস। আইলোকাসই ছিল সত্যি করে থেসোলির সমৃদ্ধতম শহর। ভোলাসের পশ্চিমে, দারুণ কারুকার্যময় ভগ্নপ্রাসাদ-শহরের চিহ্নও দেখিয়েছেন আমায়।

চমকে উঠে টিম।—কি বলতে চাইছ পিটার! তিন হাজার বছর আগের কল্পকাহিনীকে সত্যি বলে মানতে বলছ?

—সত্যি কি মিথ্যে জানি না ক্যাপ্টেন। তবে কিউরেটর দেখিয়েছেন সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে কোনটা সেই প্রাচীন আইলোকাস শহরের প্রধান রাস্তা ছিল, প্রাসাদ ছিল কোথায়, কোনটাই বা প্রাসাদের গম্বুজ শিখর ছিল। মোট কথা, আমি বিশ্বাস করি, আইলোকাস শহরে কোনওদিন কোন রাজা নিশ্চয়ই বাস করত। তাছাড়া ব্ল্যাক-সী পেরিয়ে সোভিয়েত দেশের প্রান্তে, সোভিয়েট জর্জিয়া বলে যে শহর তারই প্রাচীন নাম ছিল কোলচিস। এটাও ভোলাস আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়ামের কিউরেটর বলেছেন।

—পিটার, তুমি তাহলে বিশ্বাস করছ জেইসনের সেই জলযান ও জলপথের কথা? বিশ্বাস করছ কোলচিসের ধারে-কাছের সেই স্বর্ণগুহার কথা?—অবাক গলায় বলে ক্যাপ্টেন টিম সেভেরিন।

—দেখ ক্যাপ্টেন, দুই প্রান্তের দুই শহর যখন পেয়েছি, সমুদ্রপথ যখন নক্সায় আঁকা আছে, তখন যদি একবার এই পথ দিয়ে এক্সপিডিশনে যাই, ক্ষতি কি? যাত্রাপথের

রোমাঞ্চ তো পাব। আর তার সঙ্গে সত্যিই যদি স্বর্ণগুহা পেয়েই যাই সেটা তো দারুণ ব্যাপার হবে।

—হুম। —পিটারের কথাটা শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে টিম সেভেরিন। শেষে বলে—তোমার এক্সজ্যাকট প্ল্যানটা কি পিটার? ধর যদি অ্যাডভেঞ্চারে যাইই, তবে কিভাবে যেতে চাইছ?

—আমার ইচ্ছে, সেই তিন হাজার বছর আগের সেই কাহিনীর নৌকা আর্গোনটিকার ঢঙেই নৌকা হবে। তাতে করেই আমরা যাব সোভিয়েট জর্জিয়ায় অর্থাৎ প্রাচীন সেই শহর কোলচিসে। রওনা হব গ্রীসের লাগোয়া শহর ভোলস্ থেকে। ভোলস্ শহর মানেই তিনহাজার বছর আগের হারানো শহর আইলোকাস।

—বুঝেছি, তুমি তিনহাজার বছর পরে আবার আর্গনটিকার নূতন মহাকাব্য সৃষ্টি করতে চাইছ?

—ইয়েস ক্যাপ্টেন।—হেসে বলে পিটার।

—ওকে! দেখি কি হয়। স্বর্ণগুহা না পেলেও ব্যাপারটা রোমাঞ্চকর হবে সন্দেহ নেই। তবে অভিযান মানেই তো খরচাপাতি। দেখি আমার পার্টনার প্যাটারসনের সঙ্গে কথা বলে। জাহাজী মালিক। জাহাজের ব্যবসায়ী। পয়সাকড়ি যা আছে ওরই আছে। ও যদি ইনভেস্ট করতে রাজী থাকে তবে স্বর্ণগুহার অভিযান হয়ত হবে।

—থ্যাংক ইউ ক্যাপ্টেন। আজ তিনচার মাস এই ব্যাপার নিয়ে আমার ছোটাছুটি মনে হচ্ছে সার্থক হোল। তুমি যখন ব্যাপারটায় রাজী, আমি জানি সবাইকে বোঝাতে, রাজী করাতে তোমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না। ওহ! কি আনন্দ। আবার শুরু হোতে চলেছে অভিযান। এবার শুধুমাত্র নৌ অভিযান নয়, এর সঙ্গে রয়েছে সোনার হরিণ খোঁজার দুরন্ত আনন্দ। —খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠে পিটার হুইলার।

টিম সেভেরিন দেখা করল ট্রনভুর প্যাটারসনের সঙ্গে। সব ব্যাপার শুনে প্যাটারসনও বেশ উত্তেজিতই হয়। বলে—টিম, এতদিন তো শুধু নৌকা নিয়ে দূর-দূরন্তে অ্যাডভেঞ্চারেই বেড়িয়েছি, এবার যদি তার সঙ্গে ট্রেজার হাণ্টিংএর ব্যাপার থাকে তাহলে অ্যাডভেঞ্চারে যেতে আপত্তি কিসের? তবে—

—তবে? সন্দেহ দেখা দিচ্ছে কিসে?—অবাক গলায় বলে টিম।

—টিম, অ্যাডভেঞ্চার শুনলেই তুমি লাফিয়ে উঠ, তা জানি। তাতে অন্যবার আপত্তি করি নি। কিন্তু এবার যখন ট্রেজার খুজতেও যাচ্ছ, জানা দরকার সোনা কি সত্যিই পাহাড়ী গুহায় ওভাবে থাকতে পারে? টিম আমি সমুদ্র আর বিজ্ঞান দুই নিয়েই কারবার করি। তাই শুধু কল্পনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে ব্যাপারটাকে বিজ্ঞান-সম্মত মতে ভাবতে চাই।

—তাহলে প্যাটারসন তুমি এই অ্যাডভেঞ্চারে যেতে রাজী নও?—হতাশা টিম সেভেরিনের গলায়।
—ওঃ মাই ফ্রেন্ড, একথা কে বলল তোমায়? এই অ্যাডভেঞ্চারে যাচ্ছি আমরা, এটা নিশ্চিত। শুধু যাওয়ার আগে জানতে চাইছি, স্বর্ণভাণ্ডার থাকার ব্যাপারটা নিছক গল্প না সত্যিও হোতে পারে। সত্যি হোলে তার জন্য আমাদের অন্যভাবে তৈরী হোয়ে যেতে হবে। আর নিছকই যদি গল্প হয় তবে প্রস্তুতি হবে অন্যরকম।
—ও কে প্যাট, আমি তাহলে অন্যদিকের ব্যবস্থা করতে শুরু করি?
—না টিম, আমাকে সপ্তাহখানেক সময় দাও। সব ব্যাপারেই তাড়াহুড়ো ঠিক নয়। তবে বলেছিতো, চিন্তা কোরো না, কোলচিস্ অভিযানে আমরা যাচ্ছিই।

ট্রেনভুর প্যাটারসন জিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টর সঙ্গে আলোচনা করে। বুঝতে চায়, জানতে চায় গোল্ড ডিপোজিটস্ কিভাবে থাকে? সোনার স্তর কিভাবে পাওয়া যায়? ওখানেই দেখা হোল জেমস হোয়াইটের সঙ্গে।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির জেমস্ হোয়াইট বল্লেন প্যাটারসনকে, দেখুন স্যার, গোল্ড ডিপোজিট সম্বন্ধে এতসব কেন জানতে চাইছেন মোটামুটি জানতে পারলে হয়ত আপনাকে হেল্প করতে পারি। বিরাট ব্যপারকে তাহলে সহজ করে বোঝাতে পারি।
—মিষ্টার জেমস্, প্রথমে জানতে চাই রাশিয়ান জর্জিয়ায় অর্থাৎ জর্জিয়াভেসক শহরের কাছাকাছি কোথাও গোল্ড ডিপোজিটস্ থাকা সম্ভব কিনা? যদি সম্ভব হয়, তবে কোনও পাহাড়ী গুহায় এমনতর গোল্ড ডিপোজিটস্ কি দেখা যেতে পারে?
—মিষ্টার প্যাটারসন, আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাব, হেভি গোল্ড ডিপোজিটস্ এড়িয়া বলতে যেসব জায়গাকে বলি তার মধ্যে ককেশাস পর্বতমালার কোন জায়গা পড়ে না। তবে, কিছু কিছু গোল্ড ডিপোজিটস্ ওখানে থাকবে না, একথা জোর করে বলা যায় না। গোল্ড ডিপোজিটস সামান্য কিছু ওখানে থাকতেও পারে।
—তাই কি? যে সব পাহাড়ী স্তরে সোনা লুকিয়ে থাকে তার সঙ্গে জর্জিয়াভেসক শহরের ধারে কাছের মাটিস্তরের তাহলে মিল আছে? বলুনতো, সোনার স্তর কেমন দেখতে?
—দেখুন মিষ্টার প্যাটারসন, সোনা আর রুপো মিলেমিশেই ডিপোজিট হিসাবে থাকে। কোথাও সোনার ভাগ বেশী, কোথাও বা রুপোর ভাগ বেশী। তবে ফিশার ভেনে থাকে বেশী। কোথাও গর্ত বা ক্যাভিটি থাকলে তার মধ্যেও সোনা-রুপোর ডিপোজিটস্ জমে থাকতে পারে। পাহাড়ী গুহায় এধরণের ক্যাভিটি থাকে, তাই পাহাড়ী গুহায় যে সোনার স্তর থাকবে না, একথা জোর করে বলি কি করে?
—ওঃ, তাহলে পাহাড়ী গুহায় সোনা থাকতেও পারে?

—পারে বৈকি।—জোর দিয়েই বলেন জেমস্ হোয়াইট।—এ ছাড়া, অন্যভাবেও গোল্ড ডিপোজিটে বহু সোনা পাওয়া যায়, যেমন পাহাড়ের নীচের নদীর নুড়ি পাথরে।

—অর্থাৎ বলতে চান, পাহাড়ের নীচ দিয়ে নদীবয়ে গেলে সেখানের নুড়ি পাথরেও সোনা থাকতে পারে?

—নিশ্চয়ই।

—মাই গড্! তবে তো টিম সেভেরিনের প্রোপোজ্যালটা হয়তো সফল হতে পারে।—বিড়বিড় করে বলে ট্রেনডুর প্যাটারসন।

—কিছু বলছেন প্যাটারসন?

—নাঃ। বলছি, কি কি ভাবে গোল্ড ডিপোজিট থাকে? মাটির গভীর তলে কিংবা পাহাড়ী গুহার গর্তে কিংবা নদীবাহিত গ্র্যাভেলে?

—নাঃ, শুধু এভাবেই থাকে, তা নয়। পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ সোনা পাওয়া যায় দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানসবার্গের উইটওয়াটারস্ট্র্যাণ্ড রীফ সোনার খনি থেকে। ১৮৮৬ সালে এই স্বর্ণখনি বার করেন খনিজবিদরা। এটাই পৃথিবীর বৃহত্তম সোনার খনি। ২০০ ফুট গভীর, ৩০০ মাইল লম্বা, এই সোনার খনি মাটির প্রায় উপর থেকেই ঘিরে আছে অর্ধবৃত্তাকারে। বছরে নশো থেকে হাজার টন সোনা উঠে এই খনি থেকে।

—অ্যাঃ, বলেন কি মিষ্টার হোয়াইট!

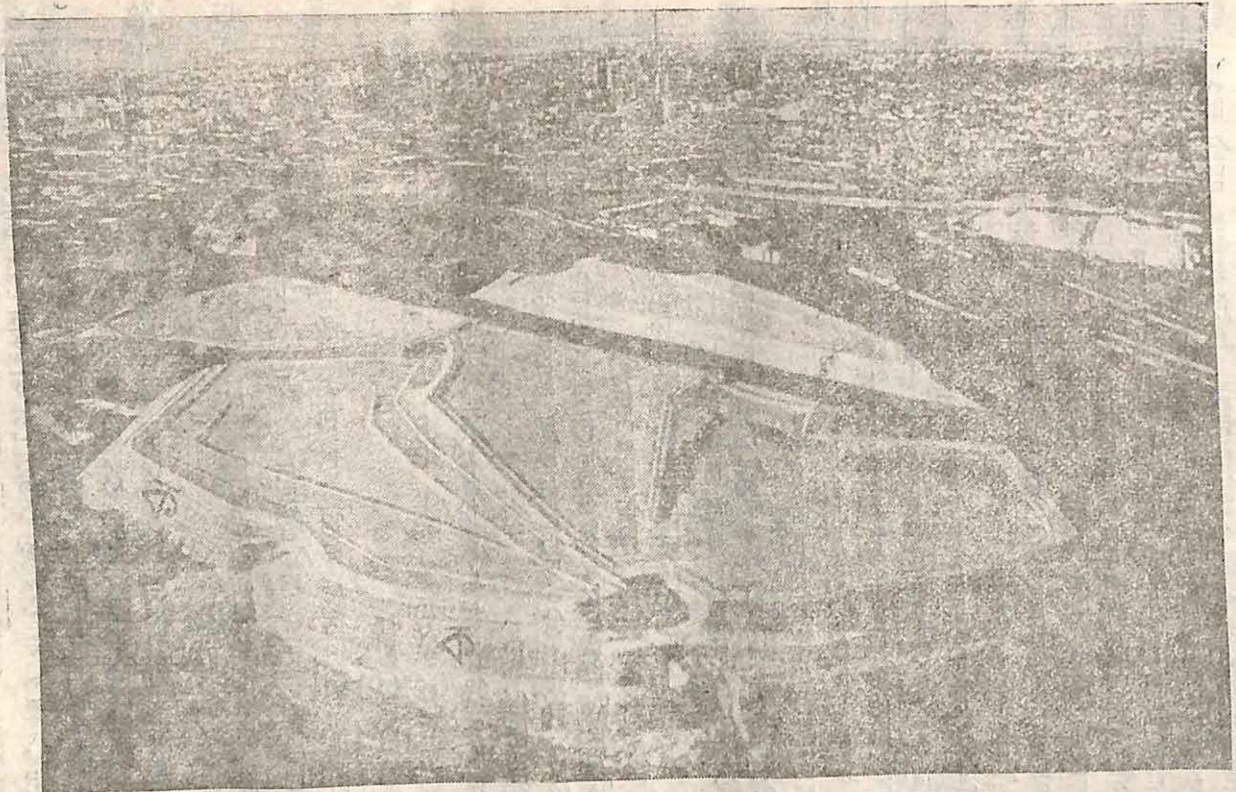
—হ্যাঁ স্যার, এই এক বর্গমাইল সোনার খনির দিকে পৃথিবী তাকিয়ে থাকে। এখান থেকেই বছরে উঠছে ২ কোটি ডলারের সোনা। দেখবেন নাকি জোহনস্‌বার্গের ঐ উইটওয়াটারষ্ট্যাণ্ড সোনার খনির ছবিটা। দেখুন, বুঝবেন, কি করে সোনার স্তর ঐখানে মাটির তলে ছড়িয়ে থাকে।—জেমস্‌হোয়াইট ড্রয়ার থেকে বার করলেন জোহানসবার্গের সোনার খনির ছবিটা।

ছবিটা নিয়ে নিবিড় ভাবে দেখে ট্রেনডুর প্যাটারসন। তারপর ছবিটা ফেরৎ দিয়ে বলেন—থ্যাঙ্ক ইউ হোয়াইট। আপনার সহযোগীতার জন্য ধন্যবাদ। জেমস্ হোয়াইটের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসে প্যাটারসন।

ট্রেনডুর প্যাটারসনের ক্লিয়ারেনস পেয়েছে টিম সেভেরিন। টাকাও দিয়েছে ট্রেনডুর প্যাটারসন স্বর্ণখনি অভিযানে যাবার জন্য।

টিম আর পিটার হুইলারের পরামর্শ শুরু হয়। আর্গনটিকার ছবিটা নিয়ে ভাবতে বসে দুজনে। দুজনেই বলে, সেই তিনহাজার বছরের পুরোনো গল্পকথার নৌকার মত নৌকা বানানো দরকার আগে। পিটার বলে,—আমাদের যাত্রা এমনভাবে শুরু হবে যেন সেই মহাকাব্যের নায়ক জেসন বুঝি আবার নৌঅভিযানে চলেছেন। আমরা যেন পৌছিয়ে গেছি তিনহাজার বছরের পুরোনো দিনে।

—পিটার, তাহলে আমাদের পরামর্শ করা দরকার প্রথমে কলিন মুডি, নেভাল



জোহনসবার্গের উইটওয়াটারস্ট্যাণ্ড সোনারখনি। 'ক' সোনার স্তর, ২০০ ফুট গভীর ও ৩০০ মাইল লম্বা। পাওয়া যায় বছরে ২ কোটি ডলারের সোনা।

আর্কিটেকট ও মডেলার টম ভসমারের সঙ্গে। পিটার তোমার নক্সাটা দাও। একটু ভাল করে ষ্টাডি করি। তোমার নক্সার ঢঙে নৌকার মডেল বানাবে টম ভসমার। আর সেই মডেল দেখে নেভেল আর্কিটেকট কলিন মুডি বলবে ঐ মডেলে ত্রুটি কোথায়?—ধীরে ধীরে, ভেবে চিন্তে বলে টিম সেভেরিন।

—ক্যাপ্টেন, আমি ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠছি। সত্যিই তাহলে আবার শুরু হচ্ছে আমাদের নৌ-অভিযান। নাঃ, নাঃ, নৌ-ট্রেজার হাণ্টিং অভিযান।—ভারী খুশী খুশী ভাব পিটার হুইলারের।

—পিটার, যদি অভিযানে যেতেই চাও সময় নষ্ট করা চলবে না। ডেকে আন কলিন মুডি আর টম ভসমারকে, আমাদের বহু অভিযানের সাথীদের।—অভিযানের খবর পেয়েই দিন কয়েকের মধ্যে এসে পৌছায় নেভেল আর্কিটেকেট কলিন মুডি আর মডেলর টম ভসমর। দুজনে এসেই জড়িয়ে ধরে ক্যাপ্টেন টিম সেভেরিনকে।—হেই ক্যাপ্টেন, আবার তাহলে চলেছ অ্যাডভেঞ্চারে।

—ইয়েস ফেণ্ডস। তবে এবার শুধুই নৌ-অভিযান নয়, এবার চলবে ট্রেজার হাণ্টিংও। —টিম সেভেরিন হাসিমুখে জানায় ভসমর আর মুডিকে।

—তাই নাকি! বল, এখন আমাদের দুজনকে কি করতে হবে?—বলে বিস্মিত ভসমর। —পিটার, আর্গোনটিকার নক্সাটা দাও ভসমরকে ও ষ্টাডি করে বলুক এ ধরনের প্রাচীন ষ্টাইলের নৌকার মডেল ও বানাতে পারবে কিনা? মুডি সার্টিফাই করবে এই ষ্টাইলের নৌকা ১৫০০ নটিক্যাল মাইল ঝড় ঝঞ্জা-টাইফুন সবকিছু সামলিয়ে চলতে পারবে কিনা?

পিটার আর্গনটিকার নক্সাটা দেয় ভসমারকে।—ভসমার, নক্সার ডিজাইনটা দারুণ নয়?

—হ্যাঁ, পিটার, সুপার্ব। এরকম নৌকার মডেল বানাতেই মেজাজ আসে। ও কে, বানিয়ে দেব এর মডেল।

—ভসমার, আর্গনটিকার মাপটা মনে রেখ। ৫৪ ফুট লম্বা, ৯ ফুট ৪ ইঞ্চি চওড়া। আমাদের নৌকার মাপও ঠিক এইই হবে। —বলে সেভেরিন।

—ওকে ক্যাপ্টেন। কিন্তু মাসখানেক সময়তো দেবে?—মডেলিষ্ট টম ভসপার জিজ্ঞেস করে ক্যাপ্টেনকে।

—নিশ্চয়ই। মনে রেখো, তোমার মডেল তৈরী হলে চেকিং করবে নেভাল একসপার্ট কলিন। সব ঠিকঠাক ভাবে ও-কে হলে শুরু হবে নৌকা তৈরীর আসল কাজ।

মডেলের দিকে তাকিয়ে ছিল এতক্ষণ টম ভসপার। হঠাৎ বলে উঠল,—দেখেছ ক্যাপ্টেন, নক্সায় যা দেখাচ্ছে সেভাবে তো আজকাল কেউ নৌকো বানায় না। কি দারুণ কাজ! পেরেক ঠুকে কোথাও জোড়াই করার চিহ্ন নেই। সবই দেখছি মর্টিস টেনন পদ্ধতিতে কাঠ জোড়াই হয়েছে। নক্সায় নীচে লেখা, প্রাচীন পদ্ধতিতে,

অ্যালিপপো পাইন কাঠ দিয়ে তৈরী এই আর্গোনটিকা। তাহলে ক্যাপ্টেন, আমাদের নৌকাও কি এই ধরনের কাঠে, এই ভাবে জোড়াই করেই হবে?
—সিওর। সব ঠিক ঠিক সেই জোইসনের আর্গোনটিকার টাইপে হবে। এমনকি যখন আমরা রওনা হব তখন আমাদের সাজ-পোষাক সবকিছু সেই ফেলে আসা তিনহাজার বছরের মানুষদের ঢঙেই হবে। যা এতদিন কাব্যে গাথায় কল্পনা হয়ে ছিল, এবার তাকেই সত্যে রূপান্তরিত করে দেখব কল্পনা আর বাস্তবের মধ্যে কতটা তফাৎ।

মাসখানেক পরে আর্গোনটিকার মডেল নিয়ে হাজির হোল টম-ভসমর। দুর্দান্ত দেখতে লাগছিল মডেল আর্গোনটিকাকে। মডেলটা ক্যাপ্টেন সেভেরিনের কাছে দিয়ে ভসমর জিজ্ঞেস করল—কেমন হয়েছে?
—অপূর্ব। সত্যিই, যদি এমন দেখতে নৌকা বানানো যায় তবে দুর্দান্ত হবে। আচ্ছা হুইলার, আমাদের নৌকার নাম তো আর্গোনটিকা দেওয়া যাবে না, কারণ সেটা লিগ্যালি অন্যায় হবে। কি নাম হবে আমাদের নৌকার?
—আমিই বলছি।—বলে উঠে মডেলার ভসমর।—আমাদের নৌকার নাম হবে আর্গো, প্রাচীন মহাকাব্যের নৌকা আর্গোনটিকার সঙ্গে মিলও থাকছে, আবার বেআইনীও হচ্ছে না।
—ফাইন।—ক্যাপ্টেন সেভেরিন বলে উঠে।—বন্ধুরা, নৌকার এই মডেলকে আমাদের নেভেল এক্সপার্ট সার্টিফাই করে বলেছেন ১৫০০ নটিক্যাল মাইলের রাফ সিতে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ঠ হার্ডি। এখন দরকার একে তৈরী করা। আমি ইতিমধ্যে খবর নিয়েছি, এরকম বিশেষ ধরনের নৌকা বানাবার ক্ষমতা আছে শুধু ভেসিলিস্ ডেলিমিট্রসের।
—ওঃ, ক্যাপ্টেন, আপনি গ্রীসের বিখ্যাত সিপরাইট ডেলিমিট্রসকে লাগাবেন! ওঁর চেয়ে দক্ষ সিপরাইটার এই মুহূর্তে এদেশে আর নেই। ওঁকেই লাগান, কাজ সঠিক হবে।—পিটার হুউলার নিজেও কাঠের কাজকারবার জানে। তাই তার মতামতে সবাই মত দেয় নির্দ্বিধায়।
খবর পেয়ে আসে ভেসিলিস ডেলিমিট্রস। আর্গোর মডেল দেখে ভীষণ খুশী হয় ভেসিলিস।—বঃ, দারুণ! অপূর্ব। এরকম ঢঙের নৌকা বানাতে মেজাজ খুস হয়ে যায়।—ভালকরে লক্ষ্য করে আর্গোর মডেলকে। বলে,—ব্রোঞ্জ যুগের গ্রীক ভেসেলের ঢঙের নৌকো এটা। হ্যাঁ, বানানো যাবে বৈকি। তবে তাড়াহুড়ো করলে তৈরী করতে পারব না। সময় দিতে হবে। দেখছেন না, স্রেফ পেরেক ঠুকে কাঠ জোড়াই করা হয় নি। বিশেষ ধরণের বন্ধন ব্যবস্থা আছে। কাঠের মধ্যে খাঁচ কেটে, মর্টিস-টেনন পদ্ধতিতে এই জোড়াই, সময় লাগে, কিন্তু বন্ধন হয় দারুণভাবে।
—নিন্ না সময়। যাই করুন না ভেসিলিস, আর্গো যেন মজবুত হয়। অজানা

নৌপথ, দুপাশে মাঝে মাঝে পাহাড়ী জলস্রোত, কখন কি হয় বলাতো যায় না। তাই মজবুত নৌকা না হলে বিপদেই পড়তে পারি আমরা।—বলেন ক্যাপ্টেন সেভেরিন।
—নাঃ, সেসব ভাববেন না। আমার তৈরী নৌকা আর্গো আপনাকে বিপদে ফেলবে না। আপনি বরং আপনার রোয়িং টিম, অন্যান্য সব কিছু রেডি করতে শুরু করুন। ক্যাপ্টেন, আপনি এই ভেসিলিস্ ডেলিমিট্রস্‌কে ভরসা করতে পারেন।
—থ্যাঙ্ক ইউ ভেসিলিস্।—গ্রীক্ সিপরাইটার ভেসিলিস ডেলিমিট্রসকে ধন্যবাদ জানায় টিম সেভেরিন।

টিম সেভেরিন এরপর মিটিং ডাকে নিজের অ্যাপার্টমেণ্টে, অ্যাথেইনসে। সভায় আসে পিটার হুইলার, টিম সেভেরিনের টিমের সেকেণ্ড-ইন-কম্যাণ্ড। আসে নেভেল আর্কিটেক্ট কলিন মুডি, মডেলার টম ভসমর, এক্সপিডিশন টিমের ফাইনেনসার পার্টনার ট্রনডুর প্যাটারসন, অক্সফোর্ডের এক্সপার্ট রোয়ার রোইং মাষ্টার মার্ক রিচার্ডস্, পারশার টিম রিডম্যান, ডাক্তার নিক্ হোলিস্।
টিম সেভেরিন শুরু করে,—বন্ধুগণ, আমরা আবার অভিযানে বেরুচ্ছি। তোমাদের শুভেচ্ছায়, একান্ত সহযোগীতায়, আমরা আগের দুটি অভিযানে সফলতা লাভ করেছি। এবার যে অভিযান হবে তার মধ্যে কিন্তু আগের দুই অভিযান থেকে কিছু তফাৎ আছে।—দম নেয় সেভেরিন।
—ক্যাপ্টেন, কোথায় যাচ্ছি অভিযানে? কবে যাচ্ছি?—প্রশ্ন করে বত্রিশ বছরের এক্সপার্ট রোয়ার মার্ক রিচার্ডস। মার্ক বহু বছর অক্সফোর্ডের হয়ে নৌবাইচ্ লড়ে, বহু খেতাব পেয়েছে। ইংলণ্ড রোয়িং মাষ্টার বলতে মার্ক রিচার্ডসকেই বোঝায়। ১৯৭৭ সালে মাসকাট থেকে ক্যানটন "সিন্দবাদ ভয়েজ অভিযানে"র সময় সেভেরিনের সঙ্গে যোগ দেয় মার্ক রিচার্ডস। এখন অভিযানে যেতে গেলে মার্ককে ছাড়া অন্য কাউকে রোইং মাষ্টার হিসাবে ভাবতেই পারে না সেভেরিন।
মার্কের দিকে তাকায় সেভেরিন। হেসে বলে,—সবই বলছি মার্ক, ধীরে ধীরে বলতে দাও। যা বলছিলাম, এবারের এই অভিযানের বিশেষত্ব, এটা স্রেফ নৌ-অভিযানই নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকছে ট্রেজার হাণ্টিংএর ব্যাপার।
—ট্রেজার হাণ্টিং! সে কি! এযে দারুণ ব্যাপার!—পারশার টিম রিডম্যান দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠে।
—হ্যাঁ, ট্রেজার আছেই একথা বলছি না, তবে সোনার গুহা পাবার সম্ভাবনা আছে। —আস্তে করে কথাটা ছুড়ে দেয় সবার দিকে ক্যাপ্টেন সেভেরিন।
—সোনার গুহা! এ সত্যি না আজগুবি কল্পনা!—ডাক্তার নিক্ হোলিস্ সব কিছুই যেন যাচাই করে নিতে চায়।
—প্যাটারসন, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল সবাইকে। সবাই যদি ট্রেজার হাণ্টিং ব্যাপারে

সিরিয়স্ না হয় তবে কিন্তু আমাদের এই অভিযান শুধু অভিযানই হবে, ট্রেজার হাণ্টিং হবে না।—সেভেরিন তার পার্টনার ট্রনডুর প্যাটারসনকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে বলে।

প্যাটারসন আর্গোনটিকা মহাকাব্যের কথা, ম্যাপের কথা, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির জেমস হোয়াইটের গোল্ড-ডিপোসিটস্ বিষয়ে মতামত, সব বুঝিয়ে বলে। শেষকালে এও বলে—ফ্রেন্ডস্, একটা কথা কিন্তু জিওগ্রাফিক সোসাইটির জেমস্ হোয়াইট বলেছিলেন, তাঁরা খনিজ কাজে নানান গভীর অঞ্চলে গেছেন, গেছেন পাহাড়-নদী-জংগলে। দেখেছেন, লুপ্তপ্রায় বহু রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে থেকে মাঝে মাঝেই বহু সোনা হীরের রত্ন ভাণ্ডার পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া, প্রাচীনকালে রাজ-রাজড়াদের, এমন কি অর্থবান মানুষদের যখন কবরে দেওয়া হোত, তখন বহু সোনা-রুপোসহ তাদের কবর দেওয়া হোত। কালে, সেইসব কবরস্থান ভর্তি হয়ে গেল, পরিত্যক্ত হোল, কিন্তু প্রোথিত ধনরত্ন রয়েই গেল মাটিতে। এভাবে বহু স্বর্ণসম্পদ পাওয়া যাচ্ছে খনন কাজের সময়।

—প্যাট, তুমি তাহলে বলতে চাইছ কোলচিসের যে স্বর্ণগুহা জেসন অধিকার করে, হয়ত যেখানে, সেই গুহায় আজও সোনা থাকতে পারে, অথবা রাজ্যের ধনসম্পদ সেই গুহায় মজুত রয়ে যেতে পারে?—পিটার হুইলার ব্যাপারটা যাচাই করে নিতে চায়।

—জানি না কি হোতে পারে, না পারে। তবে স্বর্ণভাণ্ডার পাব না এমন কথা বলতে পারি না। তবে আর একটা কথাও কিন্তু বলেছিলেন জিওলজিষ্ট জেমস হোয়াইট, পাহাড়ী ফিশারের মধ্যে যেমন সোনার স্তর থাকে, তেমনি নদীবাহিত গ্র্যাভেলের মধ্যেও সোনার দেখা পাওয়া যায়। সোনা মরীচিকা হোতেও পারে, নাও পারে আমাদের এই অভিযান। তবে সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে এইবার আমাদের সঙ্গে জিওলজিষ্ট একজন নিলে ভাল হয়।—বলে ট্রনডুর প্যাটারসন, ক্যাপ্টেন টিম সেভেরিনের পার্টনার।

—একথা আমি আগেই চিন্তা করেছি প্যাট। সেজন্যই এসেছেন পিটার ডবস। উনি ষ্ট্যাপিং মাষ্টার হলেও ভাল জিওলজিষ্ট ও হাণ্টার। লড়াই-টড়াই হোলে আমাদের সেনাপতির কাজ করতে পারবেন। তাই না মিষ্টার ডবস্?—ক্যাপ্টেন সেভেরিন হাসিমুখে প্রশ্ন করে তাকান জিওলজিষ্ট-হাণ্টার পিটার ডবসের দিকে।

—প্রয়োজন হলে লড়তে পারব বৈকি। জিওলজিষ্টের কাজ আমার পেশা, হাণ্টিং আর অ্যাডভেঞ্চারে যোগ দেওয়া এদুটো আমার নেশা। আপনাদের এই নূতন ধরণের নৌ-অভিযানের ব্যাপারটায় দারুণ থ্রিলড্ হচ্ছি। তাই যোগ দিতে দ্বিধা করছি না।

—থ্যাঙ্ক ইউ মিষ্টার ডবস্। বন্ধুরা, আমাদের এই নৌ-অভিযানের সঙ্গে যখন ট্রেজার হাণ্টিং লুকিয়ে আছে তখন এর জন্য আমাদের অনেক অ্যালার্ট হোতে হবে।

আর সবচেয়ে জরুরী কথা মনে রাখতে হবে আমরা ট্রেজার যদি পাই তবে সেটা আমাদের ব্যক্তিগত সম্পদ হবে না, সেটা আমরা মিউজিয়ামে অর্পণ করব। আমাদের এই অভিযান অর্থের নেশায় হবে না, হবে আবিষ্কারের নেশায়। আমরা যেন সোনার নেশায় লোভী হয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই-এ জড়িয়ে না পড়ি।—ক্যাপ্টেন টিম সেভেরিন সবাইকে সতর্ক করে দেন।

রোয়িং মাষ্টার মার্ক রিচার্ডস এবার বলে—ক্যাপ্টেন, আপনার এই অভিযানের যে রুট ম্যাপ করেছেন, তা দেখেছি। ১৫০০ নটিক্যাল মাইল দাঁড় টেনে নৌকো নিয়ে যেতে হবে। নৌকোর সাইজও চাট্টিখানি নয়। ৫৪ ফুট লম্বা, প্রায় সাড়ে নয় ফুট চওড়া, ভাবুন তো সাইজটা। এতে কমপক্ষে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জন লোক যেতে পারে। তাই এই ভারী ওজন সহ বিরাট নৌকা টানতে কমপক্ষে ১২ থেকে ১৪ জন ওরসম্যান চাই। এছাড়া একনাগাড়ে তো এই বারো চোদ্দজন ওরসম্যান ঐ বিরাট নৌকা আর্গোকে চালাতে পারবে না। তাই মাঝে মাঝেই ওরসম্যান বদল করতে হবে। সেজন্য চাই আরও আটজন ওরসম্যান। অর্থাৎ সব মিলিয়ে বাইশজন ওরসম্যান চাইই। তাদের দীর্ঘদিন প্র্যাকটিস করাতে হবে। তা না হলে আর্গো সঠিক তালে দ্রুত চলবে না।

—ও কে। ব্যবস্থা হবে। বাইশজন ওরসম্যান পাবে মার্ক। তবে এ ব্যাপারে আমার বিশেষ প্রস্তাব হচ্ছে, আমাদের এই ওরসম্যান বিভিন্ন দেশের হলে ভাল হয়। আমাদের নৌকো যাবে গ্রীস-ইটালি হয়ে জর্জিয়ায়। তাই এই তিন দেশের ওরসম্যান থাকলে ভাল, কারণ তারা সে দেশের জলপথের কিছু সমস্যা, বা জটিলতা থাকলে তার হদিশ দিতে পারবে।

—গুড সাজেশন ক্যাপ্টেন।—বলে উঠে রোয়িং মাষ্টার মার্ক রিচার্ডস।—গ্রীক, টার্কিশ ও জর্জিয়ান ওরসম্যান নিয়েই তৈরী হবে আমার রোয়িং টীম। তবে এইসব ছেলেদের বয়েস ১৮ থেকে ২২ বছরের মধ্যে হওয়া চাই। চাই সাহসী ও খুব হার্ড ছেলে। ক্যাপ্টেন, এদের আগে রিক্রুট করুন। মনে রাখবেন, এই ওরসম্যানরা ফেইল করা মানেই সমস্ত অভিযানটাই ফ্লপ করা, নয় কি?

—আই এগ্রি, ফুললি এগ্রি মার্ক। মাসখানেকের মধ্যে আপনাকে ঐ তিন দেশের মোট একশ ছেলে এনে দেব। আপনি তারপর ফাইন্যাল সিলেক্ট করবেন বাইশ জনকে, ও-কে?

—ও-কে ক্যাপ্টেন।—খুশী হয় মার্ক। তারপর বলে—এই বাইশজনকে কয়েকমাস ভেরী রাফ ট্রেনিং করাতে হবে। আমি চাই না ক্যাপ্টেন, আপনি পরে একথা বলুন, মার্ক, তোমার জন্যই আমরা ফেইল করলাম।

—না, না, মার্ক, আই রিলাই ইউ, তোমার ক্ষমতা জানি মার্ক। তবে একটা

কথা, সব ছেলেরাই যেন এক টেমপারামেণ্টের হয়। সেণ্টিমেণ্টাল ছেলেদের সিলেক্ট না করাই ভাল।—ক্যাপ্টেন সেভেরিন সাবধান করে দেয় রোইং মাষ্টারকে।

—প্লিইজ ক্যাপ্টেন, ওরসম্যানদের ব্যাপারটা আমার উপরই ছেড়ে দিন। যে ছেলেরা স্রেফ স্পোর্টস হিসাবেই এখানে জয়েন করতে চাইবে, তাদেরই নেব। এই অভিযানে যেসব ওরসম্যান যোগ দেবে তারা মাইনে করা লোক হবে না। স্পোর্টসম্যানদের মেজাজই আলাদা। আই ক্যান রিলাই দেম।—মার্ক রিচার্ডস বোঝায় ক্যাপ্টেন সেভেরিনকে।

—জানি, জানি মার্ক। প্লিজ, ডু হোয়াট এভার ইউ লাইক। অল বেস্ট উইসেস।

চলতে লাগল প্রস্তুতি। বিশ্রাম নেই ক্যাপ্টেন সেভেরিনের, হুইলারের আর আর্গো নৌকোর কারিগর সিপরাইটার ভোসিলিস ডেলিমাট্রিসের। প্রাচীন কাব্যগাথা, উপকথা থেকে প্রাচীন দিনের নৌকার ছবি জোগাড় করতে লাগল ভোসিলিস। আর্গোনটিকার ছবির মধ্যে, যেখানে যেটুকু কমতি ছিল, প্রাচীন দিনের গ্রীক নৌকার ছবি থেকে সেসব অংশ তৈরী করল। খুঁজে-পেতে জোগাড় করল সেই বিরাট বিরাট অ্যালিপ্পো পাইন গাছ, ঠিক যেরকম গাছ থেকে ৩০০০ বছরের প্রাচীন আরগোনটিকায় লাগাবার কথা বলা হয়েছিল মহাকাব্য আরগোনটিকায়। প্রথমে তৈরী হোল আর্গোর বাইরের খোল। তাকে নিয়ে পরীক্ষা চালালেন নেভেল এক্সপার্ট কলিন মুডি। কতটা ধাক্কা নিতে পারে, কতটা ওজন নিতে পারে সব পরীক্ষা করা হোল। তারপর চলল হাল, দাঁড়, পাল লাগানোর পাল্লা। আবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কতটা জোর দাঁড় চলতে পারে, ঢেউ-এর ধাক্কা কতটা দাঁড় টানতে পারে, সব দেখা হোল।

মাঝে মাঝে আসেন মডেলার টম ভসমর। দেখেন, তাঁর তৈরী মডেল থেকে কতটা ফারাক আসল নৌকা আর্গোর।

এরই সঙ্গে চলছে মার্ক রিচার্ডসের ট্রেনিং, বাইশজন ওরসম্যানকে নিয়ে। তরতাজা, দারুণ চেহারার ওরসম্যান। সবই প্রায় কুড়ি-বাইশ বছরের মধ্যে।

দ্রুত সময় এগিয়ে চলেছে। প্রস্তুতিপর্বও চলছে দ্রুততালে। যত সময় যাচ্ছে ট্রেজার হাণ্টিং নৌ-অভিযানী টীমের মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে উঠছে। মাঝে মাঝে তরুণ ওরসম্যানরা জিজ্ঞেস করছে ফিসফিস করে, আচ্ছা গুহার কিছু কিছু জায়গায় সোনা আছে, না, সমস্ত গুহাই সোনার চাদরে মোড়া,-একটা ঝকঝকে সোনার পাতে মোড়া স্বর্ণগুহা ?

কেউ বা প্রশ্ন করছে, অলিম্পিয়াস থেকে ককেশাস পর্বত যাওয়া, একেবারে তিন রাজ্যের গা ঘেঁষে ঘেঁষে, সমুদ্রের ধাক্কা বড্ড বেশী খেতে হবে না ? আর্গোকে চালিয়ে নেওয়া যাবে তো ?

শত প্রশ্ন, সহস্র জিজ্ঞাসা জমছে প্রতিদিন প্রতিটি অভিযাত্রীর মনে। সেভেরিনের

টীমের সঙ্গে ১৯৬১ সাল থেকেই কেউ কেউ রয়ে গেছে। ১৯৬১ সালে ক্যাপ্টেন সেভেরিন গেছিল মার্কোপোলো রুটে নৌ-অভিযানে। কেউ বা ১৯৭৭ সালে সেভেরিনের সঙ্গে, সিন্দবাদ নাবিকের কাহিনীতে বলা জলপথ ধরে অভিযান করেছে। কিন্তু সেসবই ছিল অভিযান। সমস্ত থিলই ছিল অজানা জলপথের অভিযানের মধ্যে। কিন্তু এবার! এবার একদিকে এক মহাকাব্যের রাজকুমারের কল্পিত জলপথ দিয়ে পরিক্রমা, আর তারই সাথে খুঁজে ফেরা, কোথায় সেই মরিচিকার মত স্বর্ণখনি। কল্পনাকে বাস্তবে নামিয়ে আনতে এমনভাবে চেষ্টা এর আগে কখনও করেনি টিম সেভেরিন। তাই সবকিছুর মধ্যেও কেউ কেউ ভাবছেন, ক্যাপ্টেন সেভেরিন আর তার পার্টনার প্যাটারসন সুস্থ তো! খ্রীষ্টপূর্বের প্রায় ১৩০০ বছরের আগের কাল্পনিক কাহিনীকে নিয়ে সত্য যাচাই করা স্রেফ মূর্খামী নয়? কিন্তু তবুও প্রস্তুতি চলতেই থাকে।

তিনটি বছর পার হয়ে গেছে। এলো ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস। সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষে, অভিযানের প্রাচীনী ঢঙের নৌকা আর্গো সম্পূর্ণ প্রস্তুত। নেভেল এক্সপার্ট কলিন মুডি বলল—ক্যাপ্টেন, তোমার নৌকা ও. কে। যেদিন চাও রওনা হোতে পার।

—রোইং মাষ্টার মার্কস, তোমার টীম রেডি?

—ইয়েস ক্যাপ্টেন। আমার বাইশজন ওরসম্যান দাঁড় বাইছে ফ্যাণ্টাষ্টিক। আমি এখন দু-এক সপ্তাহ এই আর্গো নিয়ে ট্রায়াল দিতে চাই। আর্গো দেখতে যেমন বিরাট, ওজনও নাকি বেশ ভারী হয়েছে।

—হ্যাঁ মার্ক। আর্গোর ওজন ৭ টন মত। যদি চাও তবে মাত্র এক সপ্তাহ আর্গোকে নিয়ে ট্রায়াল দিতে পার, তার বেশী নয়। কারণ, এবার আমাদের যাত্রা শুরুর পালা। আমরা মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই রওনা হব। যা করার দিন সাতেকের মধ্যে প্রস্তুতিপর্ব শেষ কর।

১৯৮৪ সালের ১লা মে বসল অভিযানের আগের শেষ মিটিং। এই নৌ-অভিযানে যারা সঙ্গী হচ্ছেন সবাইকে মিটিং-এ ডাকল ক্যাপ্টেন টিম সেভেরিন। মিটিং বসল ভলাসে, যেখান থেকে শুরু হচ্ছে আর্গোর নৌ-অভিযান। ক্যাপ্টেন সেভেরিন বলতে শুরু করল—

—বন্ধুরা, অভিযানের আগে এই আমাদের শেষ মিটিং। আমরা আনন্দ করার জন্য এই অভিযানে চলেছি। এটা আমাদের কাছে স্পোর্টস। আর্থিক লাভ, বা ব্যক্তিগত লাভের জন্য এই অভিযান নয়। যদিও এটা ঠিক, আর্গোর এই সুদীর্ঘ অভিযানের সঙ্গে স্বর্ণগুহার সন্ধানও আমরা করব। কিন্তু মনে রাখবে বন্ধুরা, আমরা আবিষ্কারের নেশায় চলেছি, স্বর্ণক্ষুধা মেটাবার জন্য যাচ্ছি না। কথাটা মনে রাখবে, সোনা যদি পাই-ই, পাওয়াটাই শুধু হবে আমাদের আনন্দ, সোনাটা পাবে গ্রীস, তুরস্ক আর জর্জিয়ার সরকার সমভাবে, সবই হবে তিন রাজ্যের জাতীয় সম্পত্তি।

—দেখুন ক্যাপ্টেন, এত সাধু সাজবার মানে হয় না। ঝড়-ঝঞ্ঝা তুফান মাথায় করে, জীবন রিস্ক নিয়ে আবিষ্কার করব আমরা, আর যদি সোনা আবিষ্কার করিই সব তুলে দেব সরকারকে, এতো মূর্খামি।—পিছন থেকে বলে উঠে গ্রীক ওরসম্যান লিনিয়াস।

—কে! কে বলল এমন জঘন্য কথা? আমরা অভিযাত্রীরা এত লোভী হব কেন? কে বলল একথা, আবিষ্কারের সোনা নিজেদের কাছে না রাখা মূর্খামী?—ক্ষেপে উঠল ক্যাপ্টেন সেভেরিন।

হঠাৎ নিথর-নিস্তব্ধতা নেমে আসে। সবাই নিশ্চুপ হয়ে যায়। ক্যাপ্টেন সেভেরিন আবার ফুঁসে উঠেন—কে বলল এমনতর নির্লজ্জ কথা? সোনা চাই, না? সোনার লোভে অভিযানে যাওয়া? বল, কে কথাটা বলল? আমি ছেলেটিকে চিনে নিতে চাই।

উঠে দাঁড়ায় গ্রীক ওরসম্যান লিনিয়স।—আমি বলেছি। আজকের যুগে আপনার মত এত নির্লোভী হওয়া বোকামী।—জেদী মেজাজী গলায় বলে বাইশ বছরের লিনিয়স।

—ও, তুমি? যদি ভেবে থাক, ভাগ্যক্রমে সোনা পেলেই তার ভাগ চাইবে, তাহলে বিরাট ভূল করেছ লিনিয়স। আর সেই আশাতেই যদি আমার অভিযাত্রী দলে ভিড়ে থাক, তবে আমাদের সঙ্গে তোমার না যাওয়াই ভাল।—কঠোর হয়ে উঠে ক্যাপ্টেন সেভেরিন।

—ঠিক আছে, আমি যেতে চাই না। আমি সভা ছেড়ে চলে যাচ্ছি।—লিনিয়সও মেজাজে ঘুরে দাঁড়ায়। ঘর ছেড়ে যেতে উদ্যত হয়।

—ক্যাপ্টেন, ডোণ্ট বি এক্সসাইটেড।—রোইং মাষ্টার মার্ক রিচার্ডস ক্যাপ্টেনকে শান্ত করতে চায়।—লিনিয়স, কণ্ট্রোল ইওরসেলফ। বসে পড়।—ধমক দেয় মার্ক।

ক্যাপ্টেন সেভেরিন রাগে গজগজ করতে করতে চুপ করে। থমথমে মুখে বসে পড়ে গ্রীক ওরসম্যান লিনিয়স।

রোইং মাষ্টার মার্ক বলে—ক্যাপ্টেন, তোমাকে ছাড়া যেমন আমাদের অভিযানই হবে না, তেমনি লিনিয়স ছাড়া আমাদেরও চলবে না। গ্রীক আটজন ওরসম্যানের লীডার হচ্ছে লিনিয়স। তাছাড়া, ওর মত ষ্টেডি আর হার্ডি ষ্ট্রোকার ওরসম্যান আমাদের নেই বললেই হয়। তাই ওকে ছাড়া আর্গো চালানই যাবে না।

নিস্তব্ধতা নামে সভাকক্ষে। ক্যাপ্টেন সেভেরিন রাঙামুখে চুপ করে বসে থাকে। ওরসম্যান লিনিয়সও চুপ। হঠাৎ অবস্থাটা এমন হয়ে যেতে দেখে অভিযাত্রীদলের সেকেণ্ড-ইন-কম্যাণ্ড পিটার হুইলার ব্যাপারটা সামলাতে বলে উঠে—আমাদের নৌকা আর্গো আগামী ৭ই মে রওনা হবে ভোলস পোর্ট থেকে। আমাদের টীমে থাকছেন ক্যাপ্টেন হিসাবে বিলাভেড টিম সেভেরিন, সহ-ক্যাপ্টেন হিসাবে আমি পিটার

হুইলার, রোইং মাষ্টার হচ্ছেন মার্ক রিচার্ডস, পিটার ডবস হচ্ছেন ষ্ট্যাপিং মাষ্টার যিনি আর্গোর পালকে নিয়ন্ত্রণ করবেন, আমাদের ডাক্তার হচ্ছেন নিক্ হোলিস, আমাদের খাবার-দাবার ইত্যাদি যোগান দেবেন পারশার হিসাবে টিম রিডম্যান আর সঙ্গে থাকছেন ক্যাপ্টেনের পার্টনার ও ফাইনেনশার বন্ধু ট্রনভুর প্যাটারসন।—একটু দম নেবার জন্য থামে পিটার হুইলার।

এবার কথা শুরু করে ক্যাপ্টেন সেভেরিন—আর্গোকে চালিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্বে আছেন রোইং মাষ্টার মার্ক। মার্কের অধীনে দাঁড় টানবেন ২২জন ওরসম্যান। এর মধ্যে ৮জন গ্রীসের, ৭জন তুরস্কের ও আর ৭জন জর্জিয়ার। এছাড়া নানান বিষয়ে সাহায্য করার জন্য থাকছেন ৭জন সিপমেট। এই সাতজনের মধ্যে চারজন ব্রিটিশ ও তিনজন আইরিশ। আর সবশেষে থাকছেন আর ২জন সঙ্গী, ফটোগ্রাফার হিসাবে, এরা হচ্ছেন জন এগান ও শিঠ মার্টিমার। আমাদের সমস্ত টীমের সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ৩৬। প্রত্যেকেই মনে রাখবেন সংখ্যাটা ছত্রিশ, থার্টিসিকস্। সংখ্যাটা মনে রাখতে হবে এই কারণে যে আমরা ১৫০০ নটিক্যাল মাইল যাত্রাশেষে অ্যাগেন সমুদ্র, ব্ল্যাক-সী পার হয়ে যখন জর্জিয়ায়, অর্থাৎ কোলচিসে পেঁছাব এই ৩৬জন সদস্য সংখ্যা যেন অটুট থাকে, সেটাই হবে আমাদের লক্ষ্য। আমরা প্রতিজ্ঞা করব, প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য জীবন-মরণ সংগ্রাম করব, প্রত্যেকে আর্গোকে বাঁচাবার জন্য জীবনপাত করব। বল, আমরা ৩৬জন আর পৃথক কেউ নই, আমরা একত্রিত, একটি সত্বা, এক প্রাণ। আপনারা প্রতিজ্ঞা করুন।—ক্যাপ্টেন সেভেরিন হাত তুলে বলে।

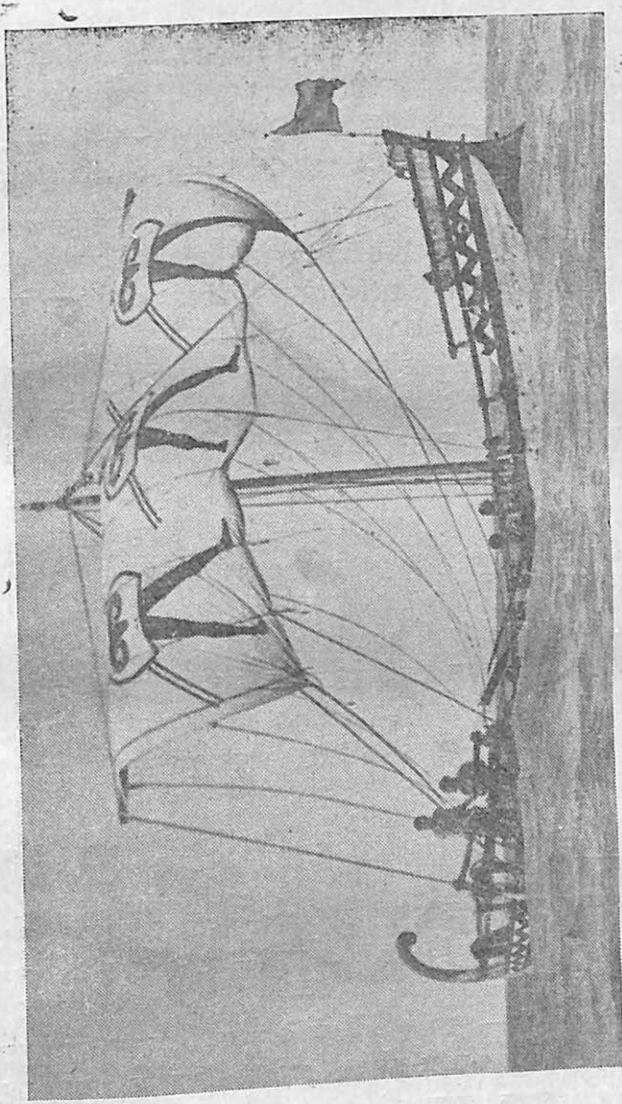
৩৬জন সদস্য একসঙ্গে ডান হাত তুলে বলে উঠে—আমরা সবাই একত্রিত, এক সত্বা, এক প্রাণ।—সভাকক্ষ ধ্বনিত হয়ে উঠে।

রোইং মাষ্টার মার্ক বলে উঠে—ক্যাপ্টেন, একটা ব্যাপারে বড় খট্‌কা লাগছে। আমাদের এই টীমে দেখছি কার্গোর সুদক্ষ মাষ্টার কার্পেণ্টর গ্রীক সিপরাইটার ভেসিলিস্ ডোলমিট্রস্‌কে রাখা হয়নি। তাহলে যাত্রাপথে আর্গোর যদি কিছু মেরামতির দরকার হয় বা দাঁড় কোথাও ভেঙ্গে গেলে তার সারাই দরকার হয়, তাহলে করবে কে? এসব সারাই-এর অভিজ্ঞ লোক তো চাই।

—আহহ্ মার্ক, তুমি এ ব্যাপারে খুব ঘাবড়ে গেছ মনে হচ্ছে। প্রথমে বলি, ভেসিলিস বৃদ্ধ মানুষ, তাই উনি যেতেও চাননি, নিচ্ছিও না ওঁর বেশী বয়সটার কথা ভেবে। আর কাঠের সারাইএর কাজ করবার সুদক্ষ লোক হচ্ছে আমাদের সেকেণ্ড-ইন-কম্যাণ্ড পিটার হুউলার। আমাদের বিগত সব অভিযানেই উনি এ ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে সাহায্য করেছেন।

—ফাইন। নাইস।—খুশী হয়ে উঠে মার্ক।—ক্যাপ্টেন, আপনার এই টীম দুর্দান্ত হয়েছে। ইউথ অ্যাণ্ড এক্সপিরিয়ন্স, দুটোর এমনতর সমন্বয়, সচরাচর দেখা যায় না।

—তাহলে আমার সহযাত্রী বন্ধুরা, আমরা সর্বভাবে প্রস্তুত ?



অ্যাগন সমুদ্রে ভাসছে আর্গো

—ইয়েস।—সমস্বরে ৩৫ জন সহ-অভিযাত্রী বলে উঠে।

—তাহলে আগামী ৭ই মে সকাল ৭টায় আমরা উপস্থিত হচ্ছি ভোলাস পোর্টে আমাদের সুন্দরী নৌকা আর্গোকে নিয়ে অভিযানে যাওয়ার জন্য।

সভা আনন্দে খুশীর ঝলক নিয়ে শেষ হয়।

৭ই মে ১৯৮৪ সকাল ৭টায় ৩৬ জন সহযাত্রী উপস্থিত ভোলস বন্দরে। অ্যাগন সমুদ্রে ভাসছে সুসজ্জিত নৌকা আর্গো।

বন্দরে উপস্থিত ভোলস শহরের মেয়র, বিশিষ্ট গণ্যমান ব্যক্তিরা, স্কুল-কলেজের ছেলেরা। গ্রীসের একদল তরুণ ছেলে একটি বাইচ নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করছে, আর্গোর সঙ্গে যাত্রারম্ভের সূচনাকে আনন্দময় করার জন্য। উপস্থিত মডেলার টম ভসমর, গ্রীক সিপরাইটার ভোসিলিস ডোলামিত্রস, নেভেল আর্কিটেকট কলিন মুডি।

প্রাচীন ঢঙের দুরন্ত কারুকার্যময় আর্গোর দিকে তাকাতেই সবাই মুগ্ধ হয়ে যায়। মেয়র বলে উঠেন,—ক্যাপ্টেন সেভেরিন, এই নৌকা এ যুগের বিশ্বাসই করা যায় না!

মডেলার টমভসমর বলে উঠে—ভোসিলিস, দারুণ কাজ করেছেন মশাই। যেমন মডেলটি বানিয়েছিলাম এ যে তেমনিই দুরন্ত হয়েছে। এমনকি কাঠে এমনতর রঙ দিয়েছেন মনে হচ্ছে সত্যিই হাজার বছরের পুরোনো নৌকা। মাঝে মাঝে নৌকার খোলে তাপ্পি দিয়ে এমন ঢঙটি করেছেন দেখলেই লোকে ভাববে সুদীর্ঘ তিনহাজার বছর চলতে চলতে, অনেক মেরামতির পরে, তবে চালু আছে নৌকা আর্গো।

—থ্যাঙ্ক ইউ ভসমর। সবই হয়েছে আমাদের সবার একান্ত প্রচেষ্টায়, নয় কি?—হেসে বলে ভোসিলিস্।

একে একে ৩৬ জন অভিযাত্রী আর্গোর মধ্যে গিয়ে বসল। ৩৪ জন দাঁড়ি, ৭ জন করে দুধারে হাল ধরে বসল। পালের দড়ি টেনেটুনে সঠিক করে নিল ষ্ট্র্যাপিং মাষ্টার পিটার ডবস্। রোইং মাষ্টার মার্ক নৌকার একপ্রান্তে নৌকার দিকনিয়ন্ত্রক মুল দাঁড়টি ধরে বসল। বন্দরের ধারে শতশত ছোট ছেলেমেয়েরা ফুল হাতে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানাতে লাগল আর্গোকে।

—ষ্টার্ট। রওনা হও।—নৌকার পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে যাত্রাশুরুর ইঙ্গিত করল ক্যাপ্টেন টিম সেভেরিন।

পাড়ে দাঁড়িয়ে রুমাল নেড়ে শুভেচ্ছা জানালেন মেয়র। ছোট ছেলেমেয়েরা ফুল ছড়িয়ে দিল আর্গোর উপরে। বলে উঠল সমস্বরে সবাই—কালো টাক্সিটি! শুভযাত্রা! যাত্রামঙ্গলময় হোক।

ঝকাৎ-ঝকাৎ, ঝকাৎ-ঝকাৎ—আর্গোর ১৪ জন ওরসম্যানের দাঁড় অ্যাগন সমুদ্রের বুকে ভেসে চল্ল শব্দ তুলে, ঝকাৎ-ঝকাৎ-ঝকাৎ। আর্গো এগিয়ে চল্ল হু-হু করে সমুদ্রের বুকে। পাশাপাশি চলতে লাগল গ্রীকছেলেদের ছোট্ট বাইচ নৌকা, আর গাইতে লাগল, কালো-ট্যাক্সাডি, কালো-ট্যাক্সাডি, কালো-ট্যাক্সাডি। যাত্রা-শুভহোক, যাত্রা-[illegible]াক, যাত্রা-শুভহোক।

হয়েছে

[illegible]ত্রা শুরুহোল আইলোকাস-ভোলস থেকে কোলচিস্-জর্জিয়ার পথে। সুদীর্ঘ

১৫০০ নটিক্যাল মাইলের সমুদ্র অভিযান! সাত টন ওজনের আর্গো তড়তড়িয়ে ভেসে চল্ল আইলোকাস থেকে।

দারুণ ভারী ওজনের নৌকা আর্গোকে দাঁড়বেয়ে টেনে নিয়ে যেতে হাঁপিয়ে উঠে ১৪ জন ওরসম্যান। দশমিনিট পর পরই তাই দুধার থেকে একজন করে মোট ১ জোড়া ওরসম্যান বদল করতে লাগল রোইং মাষ্টার মার্ক রিচার্ডস। এরফলে কোন ওরসম্যানই ক্লান্ত হচ্ছিল না। শুধু গ্রীক ওরসচ্যাম্পিয়ন লিনিয়স বল্ল—আমার জন্য চিন্তা কোরনা মার্ক। আমি ঠুনকো খেলনা নই যে পাঁচ মিনিট নৌকা টানলেই মাখনের মত গলে যাব।

—আহ লিনিয়স, এভাবে কথা বলছ কেন? লংরুটে এই ভারী নৌকা চালিয়ে নিতে গেলে যাতে কেউই ষ্ট্রেইনড না হয় তার জন্যই এই ব্যবস্থা করছি। এতে কেউই টায়ার্ড হচ্ছে না।—বোঝায় রোইং মাষ্টার মার্ক।

—জানি মার্ক, তুমি ক্যামব্রিজের রোইং চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু এই লিনিয়সকেও গ্রীসে হারকিউলিস-রোয়ার বলেই সবাই জানে, কথাটা খেয়াল রেখ।—বেশ মেজাজী রুক্ষ গলায় বলে লিনিয়স্।

যাত্রাশুরুতেই এরকম গরম হয়ে যাবে লিনিয়স্ ভাবতেই পারে নি মার্ক। দীর্ঘ রোইংএর পর ওরসম্যানরা ক্লান্ত হয়, মেজাজ একটু তিরিক্ষি হয়, এ সবাই জানে। কিন্তু হঠাৎ এভাবে ক্ষেপে গেল কেন লিনিয়স্ বুঝতে পারে না মার্ক। কিন্তু সে হচ্ছে রোইং মাষ্টার। তাকে ঠাণ্ডা হয়ে চলতেই হবে। মার্ক তাই চুপ করে যায়। লিনিয়স্ রোইং থেকে বিশ্রাম নেবার জন্য সরে না গিয়ে সজোরে ওরস্‌কে অ্যাগন সমুদ্রের জলে ফেলতে থাকে, ঠস্-ঠস্, ঠস্-ঠস্, ঠস্-ঠস্।

ক্যাপ্টেন টিম সেভেরিন নৌকার একপ্রান্ত থেকে বুঝতে পারে মার্ক আর লিনিয়সের মধ্যে একঝলক উত্তপ্ত ঝড় বয়ে গেল। তারপরই দুজনেই চুপচাপ। ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল সেভেরিন। মনে মনে বল্ল, নাঃ, লিনিয়স্ ছেলেটা দেখছি একটু বেয়াড়া ধরণের। যাত্রা শুরুতেই মেজাজ গরম করছে? নজর রাখতে হচ্চে লিনিয়সের উপর।

মেজাজীচালে এগিয়ে চল্ল আর্গো। তিন-নট্ স্পীডে চলতে লাগল। ঘণ্টায় পাঁচ মাইল চলার এই গতিটা রোইং মাষ্টার আর ক্যাপ্টেন সেভেরিন পরামর্শ করেই নির্ধারিত করেছিল। মে মাসে শুরু হয়েছে যাত্রা। শীত পড়ার আগেই যদি না জর্জিয়া-কোলচিসে পৌছান যায় তাহলে ঠাণ্ডার প্রচণ্ড ধাক্কায় মাঝ পথেই বন্ধ করতে হবে এই অভিযানকে। রোইং মাষ্টার মার্কের মতে, দিনে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা নৌকা চালালে আর ২০০০ মাইলের মধ্যে দশ-বারো জায়গায় এক-দুদিন করে বিশ্রাম করলে, আগষ্টের শেষাশেষি পৌছান যাবে রাশিয়ার উপকূল ভানীতে, জর্জিয়ার সেই পুরানো শহর কোলচিসে।

ভোলস বন্দর ছেড়ে প্রথমদিন চার নটের বেশী নৌকার গতি কিছুতেই করা গেল না। স্থির জল। প্রচণ্ড উল্টো হাওয়ার ধাক্কা। তবুও প্রথম দিন বলে আর্গো চলতেই লাগল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। পঞ্চাশ মাইলের মাথায় বাঁদিকে দেখা যেতে লাগল অলিম্পিয়াস পাহাড়ের চুড়া।

অলিম্পিয়াস পাহাড়কে দেখে ওরসম্যানরা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। আনন্দে গাইতে লাগল,

হে অলিম্পিয়াস্, তোমার আগুণ দাও আমাদের, আমরা এগিয়ে যাই।
হে অলিম্পিয়াস্, তোমার দৃপ্ততা দাও আমাদের, আমরা এগিয়ে যাই।
হে অলিম্পিয়াস্, তোমার গৌরব দাও আমাদের, আমরা এগিয়ে যাই।
হে অলিম্পিয়াস্, তোমার বিজয় দাও আমাদের, আমরা বিজয়ী হই।

এগিয়ে চল্ল আর্গো। ডানদিকে ঘুরে পুবের দিকে এগিয়ে চল্ল খালকিদিকির দিকে। কিন্তু কেপ-পসিডনের ১৫ মাইল দূরে যেতেই হাওয়ার গতি দারুণ পড়ে গেল। প্রথম দিনে, দীর্ঘসময়ে দাঁড়টেনে ওরসম্যানরা ক্লান্ত। মার্ক বল্ল—লেট আস ষ্টপ টুডে।

ক্যাপ্টেন সেভেরিন চেঁচিয়ে উঠলেন—হল্ট ফর দি ডে। আজ প্রথমদিনের যাত্রা এখনই বন্ধ হচ্ছে।

আর্গো অ্যাগন সমুদ্রের বুকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। পশ্চিমে, সুদূরে তখনও দেখা যাচ্ছে তুষারশুভ্র রূপারমুকুটধারী মাউণ্ট অলিম্পিয়াসকে।

ড্রাইফুডস ড্রিংকস খেয়ে ওরসম্যানরা সটান শুয়ে পড়ল আর্গোর পাটাতনের উপর। শুধু জেগে রইল ক্যাপ্টেন সেভেরিন, পিটার হুইলার সেকেণ্ড-ইন কম্যাণ্ড, রোইং মাষ্টার মার্ক রিচার্ডস আর আর্গোর মেডিক্যাল ম্যান ডক্টর নিক হোলিস।

ডক্টর হোলিস সবাইকে একবার চেক্ করে নিলেন। প্রয়োজনীয় ষ্টিমুলেন্ট দিলেন। বল্লেন—ক্যাপ্টেন, এভরিবডি ইজ ফাইন। সবাই ভাল আছে।

সন্ধে পার হয়ে রাত্রী নেমে এল সমুদ্রের বুকে। দূরে শহরের বুকে আলোর দীপমালা জ্বলছে। নিঃস্তব্ধ অ্যাগন সমুদ্রের নীল জল। নিশ্চুপ হয়ে গেল আর্গোর অভিযাত্রীরা। সবার চোখে নেমে এল ঘুম।

নাঃ, শুধু একজনের চোখে ঘুম এল না। ঘুম এল না গ্রীক ওরসম্যান লিনিয়সের চোখে। সবাই ঘুমাবার পর পাটাতনের উপর উঠে বসল লিনিয়স।

লিনিয়সকে হঠাৎ উঠে বসতে দেখে ক্যাপ্টেন সেভেরিনের আধোঘুম ভেঙ্গে যায়। ভ্রূ কুচকে তাকিয়ে থাকে লিনিয়সের আবছা মূর্তির দিকে।

লিনিয়স ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে ক্যাপ্টেন সেভেরিনের দিকে।

—ইয়েস, কি চাই ?—নীচু গলায় বলে ক্যাপ্টেন সেভেরিন।

—একটু বোঝাপড়া পরিষ্কার ভাবে করতে চাই ক্যাপ্টেন।—নীচু গম্ভীর গলায় বলে লিনিয়স।

—বোঝাপড়া ! কি ব্যাপারে !—অবাক গলায় বলে সেভেরিন ।
—দেখুন ক্যাপ্টেন, আমরা এই অভিযানে যোগ দিয়েছি ট্রেজার পাবার আশায় । স্রেফ অভিযানের আনন্দ লাভের জন্য নয় ।
—সেকি ! তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম লিনিয়স, সোনার গুহা যদি সত্যিই পাই তাহলেও স্বর্ণগুহার এককণাও সোনা তুমি পাবে না । সবই জমা পড়বে মিউজিয়মে ।
—নাঃ, সব জমা পড়বে না ক্যাপ্টেন, এই বলে দিলাম ।—চড়া গলায় বলে লিনিয়স ।
—আমিও বলে দিলাম লিনিয়স, যতক্ষণ এই অভিযানের নেতৃত্ব আমার হাতে থাকছে, ততদিন স্বর্ণগুহার বিন্দুমাত্র সোনাও তুমি পাচ্ছ না ।
—সময়েই দেখা যাবে কি করতে পারি আমি ।—হুমকি ক্রমেই বেড়ে উঠে লিনিয়সের ।
—তোমার মত এমন সব মতলববাজ বহু দেখেছি আমি লিনিয়স । আমাকে ভয় দেখিও না । তোমাকে সামনের পোর্টেই, যেখানে আর্গো থামবে, নামিয়ে দেব । কোনও বদমাইসির সুযোগই দেব না—রেগে উঠে দাঁড়ায় সেভেরিন ।
—আহহ ক্যাপ্টেন, আপনি ছেলেমানুষ হয়ে গেলেন ? কোথায় স্বর্ণগুহা, কোথায় ২০০০ মাইল দূরে কোলচিস ঠিক নেই । সেই জায়গায় সোনা নিয়ে নেবে ভয় দেখাচ্ছে লিনিয়স, আপনিও ঘাবড়ে যাচ্ছেন ? বিশ্রাম করুন । লিনিয়স, প্লিইজ যাও, টেক রেষ্ট ।—হুইলার উঠে এসে বোঝায় দুজনকে । থমথমে মুখে লিনিয়স চলে যায় আর্গোর সামনে, নিজের বিশ্রামের জায়গায় । গুম হয়ে বসে থাকে সেভেরিন ।
রাতের অন্ধকারে, অভিযাত্রীদলের ঘুমের ফাঁকে, উত্তপ্ত বাদানুবাদের স্বাক্ষী রইল অ্যাগন সমুদ্রের নীল জল, আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জরা । আর বাদানুবাদের উত্তাপ বুকে নিয়ে চোখ বন্ধ করে অজস্র চিন্তা করে চল্ল ক্যাপ্টেন সেভেরিন, গ্রীক ওরসম্যাল লিনিয়স, আর সেকেণ্ড-ইন-কম্যাণ্ড পিটার হুইলার ।
ক্যাপ্টেন সেভেরিন ভাবতে থাকে, না ঃ এবার শুরুতেই দেখছি অশুভ ইঙ্গিত । কেন যে রোইং মাষ্টার মার্ক এমন সব মতলববাজ ওরসম্যানকে সিলেক্ট করল কে জানে ? কি জানি, অভিযানে কি ঝামেলা ঘটবে কে জানে ?

পরদিন সক্কালবেলায় আবার যাত্রা শুরু করে আর্গো । ক্যাপ্টেন সেভেরিন বলে,
—মার্ক, আমরা লিমনোস পোর্টে প্রথম দাঁড়াচ্ছি, জল ও খাদ্য নেবার জন্য । মাঝে একদিন সমুদ্রেই নৌকা থামিয়ে, বিশ্রাম করে, তৃতীয় দিনে আর্গো এসে পৌছাল লিমনোস বন্দরে । আর্গোর যাত্রার কাহিনী আগেই ছড়িয়ে পড়েছে বন্দরে বন্দরে । তাই লিমনোস বন্দরে ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে ছিল আর্গোর ক্যাপ্টেন সেভেরিন আর তার দলবলকে স্বাগত জানাবার জন্য ।
আর্গো এসে দাঁড়াল লিমনোস্ বন্দরে । আনন্দে সবাই অভিনন্দন জানাল সেভেরিনকে ।

ক্যাপ্টেন বল্ল—বন্ধুরা, আজ একদিনের জন্য সবার ছুটি। কাল সকাল ৭টায় শুরু হবে আবার আর্গোর যাত্রা। আজ তোমরা শহরে যেতে পার, শহরে ঘুরতে পার, আনন্দ-স্ফূর্তি করতে পার। কিন্তু মনে রেখ, কাল সকাল ৬টার মধ্যেই এখানে ফিরে আসতে হবে সবাইকে।

হৈ-হৈ করে সব ওরসম্যানরা, অন্যান্যরা আর্গো ছেড়ে নেমে এল মাটিতে। লিমোনিয়াস ছেলেমেয়েরা ওদের নিয়ে গেল শহরে। আর্গোর মধ্যে রয়ে গেল শুধু ক্যাপ্টেন টিম সেভেরিন, সেকেণ্ড-ইন-কম্যাণ্ড পিটার হুইলার, মার্ক রিচার্ডস আর ডক্টর নিক হোলিস্।

সে রাত্রে আর্গোর অন্যান্য অভিযাত্রীরা আর ফিরল না। লিমনোস শহরেই তারা আনন্দ-স্ফূর্তি করার জন্য রয়ে গেল। ক্যাপ্টেন সেভেরিন বলল—পিটার, ছেলেরা ভালই চালাচ্ছে নৌকা, কি বল। এই সাতটনি ভারী নৌকা চালানোতো চাট্টিখানি কথা নয়। অ্যাগন সমুদ্রও ভীষণ ফেঁপে-ফুলে উঠেছে এই যাত্রাপথে। ওরসম্যানরা এক্সপার্ট বলেই ভাল টেনে এনেছে আর্গোকে। কি বল পিটার?

—সবই ভাল ক্যাপ্টেন, শুধু মাঝে মিছিমিছি তুমি আর সেই ছোকরা গ্রীক ওরসম্যান লিনিয়স ঝগড়াঝাটি করে খুশীর হাওয়াকে গরম করে তুলেছিলে। হেসে বলে পিটার হুইলার।

—আমি মিছিমিছি ঝগড়া করলাম!—অবাক হয় ক্যাপ্টেন সেভেরিন।—অভিযানে কি হবে ঠিক নেই, অভিযানের চিন্তায় আমি পাগল, আর সেই সময় ঐ ছোকরা লিনিয়স বলে কিনা স্বর্ণগুহার সোনার ভাগ চাই। রাগ হয় না?

—কোথায় সোনা, কোথায় স্বর্ণগুহা তার ঠিক নেই, কিন্তু তবু লড়েতো গেলে তুমি। যাই বল ক্যাপ্টেন, ঐ গ্রীক ছোকরা লিনিয়সকে আমার একটুও ভাল লাগে নি।

—পিটার, তুমি সব তাইতেই বড্ড খুঁতখুঁতে। একটু কথা কাটাকাটি হয়েছে, কিন্তু তাই বলে ওরসম্যান হিসাবে কাজে একটুও ফাঁকী দেয় নি। বরং ঐতো দাঁড়ীদের লিড করছে প্রথমে বসে। কি বল মার্ক? লিনিয়স সত্যি ভাল নৌকা টানে।

—ক্যাপ্টেন, কথাটা যখন উঠল তখন বলেই ফেলি, লিনিয়সকে আমারও ভাল লাগছে না। আপনার সঙ্গে কথা কাটাকাটির পর ও যেন ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছে। এই গত দুদিনে কারুর সঙ্গে কথাই বলে নি।

—হুঁউম। ব্যাপারটি ঠিক তেমন খেয়াল করি নি।—টিম সেভেরিনও এবার যেন চিন্তিত হয়।

ডক্টর নিক বলেন,—ক্যাপ্টেন টিম, সেকেণ্ড মাস্টার পিটার, আপনারা আজকে বিশ্রাম করুন। বি রিল্যাকসর্ড। বিশ্রাম নিলেই সমস্যা যতই গভীর হোক্, দেখবেন জলের মত সহজ হবে। হাজার হোক, আপনি তো এসব ঝক্কি-ঝামেলা সহ্য করেই আজ ত্রিশ বছর ধরে এমন নূতন ধরনের নূতন নূতন অভিযান চালাচ্ছেন।

—থ্যাংক ইউ ডক্টর। ঠিকই বলেছেন, রাত হয়ে গেছে, আমাদের বিশ্রাম করাই দরকার।

প্রোগ্রাম মতই পরদিন সকালবেলায়, ঠিক সময়মতই, আর্গোর অভিযাত্রীরা নৌকায় হাজির। ঠিক সাতটায়, আর্গো লিমনোস বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করল। আর্গো চলতে লাগল অ্যাগন সমুদ্রের বুকে। চোদ্দজন ওরসম্যান দাঁড়টানা শুরু করল। অ্যাগন সমুদ্রের বুকে, পাখীর পাখনার মত চোদ্দটি দাঁড় একটানা গেয়ে চলল গান, ঠস্-ঠস্, ঠস-ঠস। আর্গো হু হু করে এগিয়ে চলল পূবে, ক্যানাকেলের দিকে।

মাইল দশেক এগিয়েছে আর্গো। হঠাৎ সেকেণ্ড মাষ্টার বলে উঠল,—ক্যাপ্টেন, লুক। পিছনে কিছু দেখতে পাচ্ছ ক্যাপ্টেন?

—পিটার, আমি বহু আগেই ঐ ছিপছিপে বাইচ নৌকোটাকে লক্ষ্য করেছি। মনে হচ্ছে ওরা আমাদের ফলো করছে। কিন্তু কেন? অভিযানের পথে এগিয়ে যাবার শুভকামনা জানাবার জন্য, না অন্য কিছু?

—শুভকামনা জানাতে দুঘণ্টা ধরে ফলো করবে? এতটা পথ এমনভাবে আসবে?

—ব্যাপারটা মেনে নিতে মন চায়না পিটার।

—পিটার উত্তেজিত না হয়ে দেখ, কি হয়।—ক্যাপ্টেন টিম শান্ত হোতে বলেন সেকেণ্ড মাষ্টার পিটারকে।

আর্গোর চলার গতি একটু পরেই যেন কমতে লাগল। আর্গোর সামনে বসা আটজন গ্রীক ওরসম্যান হঠাৎ দাঁড় টানা বন্ধ করে দিল। আর্গো চকিতে থেমে গেল।

—কি ব্যাপার! দাঁড় টানা বন্ধ করলে কেন?—রোইং মাষ্টার মার্ক অবাক হয়ে প্রশ্ন করে সামনের সারীর গ্রীক ওরসম্যানদের।

গ্রীক ওর সম্যান লিনিয়স উঠে দাঁড়ায়। বলে—আমরা আর্গোর সঙ্গে আর যাচ্ছি না মার্ক।

—সেকি! বিস্মিত, বিহ্বল মার্ক।

—সেজন্যই কি পিছনে ঐ বাইচ-নৌকাটি আসছে? গম্ভীর গলা ক্যাপ্টেন টিমের।

—হ্যাঁ। ঐ নৌকায় আমরা ফিরে যাচ্ছি লিমনোস-এ। দু হাজার মাইল নৌকা টেনে হাতে কড়া পড়াতে রাজী নই ক্যাপ্টেন। আই উইস ইওর সাক্সেশ। বাঁকা হাসিতে টেনে টেনে কথাটা বলে লিনিয়স।

ইতিমধ্যেই পিছন থেকে আসা বাইচ-নৌকা আর্গোর গায়ে এসে দাঁড়ায়। লিনিয়স তার সাতজন গ্রীক ওরসম্যান বন্ধুকে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে—ক্যাপ্টেন, আমরা চললাম। মার্ক, আমি দুঃখিত, মাঝ সমুদ্রে এইভাবে তোমাদের ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে। চলে যায় লিনিয়সরা।

—বেইমান! বদমাইস! বিশ্বাসঘাতক! রাগে গর্জে উঠে রোইং মাষ্টার মার্ক।

—বি ষ্টেডি মার্ক। আমার সন্দেহ ছিল এমন হবে, তাই আমি ক্যানাকালে আগেই খবর পাঠিয়েছি আমার পঁচিশ বছরের সহযাত্রী ক্যাপ্টেন বন্ধু এরসিন ইরমিবেসুগুলুকে।

ক্যানাকালে পৌঁছাতে পারলেই বহু সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ঠাণ্ডা মাথায় বলে ক্যাপ্টেন টিম।

—কিন্তু ক্যাপ্টেন, ক্যানাকাল তো এখনও একশ মাইলের পথ। মোট বাইশজন ওরসম্যানের মধ্যে আটজন গ্রীক ওরসম্যানই চলে গেল, হাতে রইল শুধু ১৪জন ওরসম্যান। অথচ এই বিরাটকায় দারুণ ভারী আর্গো বইতে গেলে ১৪ জন ওরসম্যানই লাগে। কিন্তু এক নাগাড়ে এই চোদ্দজন দাঁড় টানবে কি করে? এ যে অসম্ভব ব্যাপার! পাঁচ-দশ মিনিট পরেই এরা হাঁপিয়ে উঠবে। কিন্তু তারপরও এদের জোর করলেই বিপদ। এদের মধ্যে একজনও অসুস্থ হলে এক লেন্‌থও চলবে না আর্গো।

—হুউম। ভারী গলায় বলে ক্যাপ্টেন টীম। কিছুক্ষণ চিন্তা করে। তারপর বলে—ষ্ট্র্যাপিং মাষ্টার ডবস, পাল এমন ভাবে ঘুরিয়ে দাও যাতে হাওয়ার টানে আর্গো পাড়ের দিকে চলতে থাকে। আর ওরসম্যানরা খুব হালকা হাতে দাঁড় ধরে থাক, যাতে নৌকা উল্টে না যায়। ব্যাস, এটুকুই কর তোমরা।

মার্ক সেরকমই নির্দেশ দেয় ওরসম্যানদের। ষ্ট্র্যাপিং মাষ্টার ডবস আর্গোর পালের দড়িগুলো টেনেটুনে আর্গোর পালকে ক্যাপ্টেনের নির্দেশমতই বাতাসের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। আর্গো মোচার খোলার মতই এপাশ-ওপাশ দুলতে দুলতে চলতে থাকে।

লিনিয়স ও তার সাত সঙ্গী আর্গো ছেড়ে যাওয়ার ঘটনা এত দ্রুত ঘটে যে অন্যান্য ওরসম্যানরাও হতচকিত হয়ে যায়। ওরা জানত, লিনিয়স একটু রগচটা। কিন্তু তাই বলে মাঝ দরিয়ায় এভাবে তাদের ডুবিয়ে যাবে কল্পনাও করতে পারেনি তারা।

সে রাতে অসহায় অবস্থায় অ্যাগন সমুদ্রের বুকে ভাসতে ভাসতে চলল আর্গো। অভিযাত্রীদের কারুর চোখে ঘুম নেই। দুশ্চিন্তায় ক্যাপ্টেন টিম ও সেকেণ্ড-ইন-কম্যাণ্ড পিটারের মুখটা থমথমে হয়ে আছে। রাগে দাঁত চেপে গজরাচ্ছে রোইং মাষ্টার মার্ক, আর বিড়বিড় করে বলছে—রাসকেল, স্কাউণ্ড্রেল। এমন ওরসম্যানদের স্যুট করা উচিত।

রাত গড়িয়ে পুবের আকাশে সূর্যের আলো ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল। কালচে নীল সমুদ্রের জলে আর্গোকে দেখাচ্ছে অসহায় ভগ্নতরীর মত। হালকা হাতে ওরসম্যানরা মাঝে মাঝে দাঁড় টেনে যাচ্ছে। সবারই এক চিন্তা, অকূল দরিয়াকে পাড়ি দিয়ে তীরে কি করে ভেড়ানো যাবে তরী?

এই সময়ে ধীরে ধীরে জমতে লাগল পুঞ্জীভূত কালো মেঘ আকাশে। নীল আকাশ ছেয়ে গেল অন্ধকারে। শুরু হলো বাতাসের আস্ফালন আর গর্জন। ফুলে উঠল সমুদ্র। ধীরে ধীরে সমুদ্রের জলে নেমে এল তাণ্ডবতা। জলের প্রচণ্ড নাচনে শূন্যে ছিটকে পড়তে লাগল আর্গো। আর্গোর বুকে অসহায় দর্শকের মত অভিযাত্রীরা।

ঝড়ের হাত থেকে আর্গোকে বাঁচাবার জন্য ষ্ট্র্যাপিং মাষ্টার ডবস খুলে ফেলেছে আকাশে মেলে ধরা আর্গোর পালকে। সমুদ্রের ঢেউ-এর প্রচণ্ড ধাক্কায় আর্গো মাঝে মাঝেই লাফিয়ে উঠছে শূন্যে আর তারপরই তলিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের তরঙ্গ-দোলার নীচে। দাঁত চেপে ভয়ঙ্কর এই অবস্থাকে সামাল দিতে চাইছে ক্যাপ্টেন টিম। মাঝে মাঝেই ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে উঠছে—বি ষ্টেডি ফ্রেণ্ডস। ঘাবড়িও না বন্ধুরা। সজোরে চেপে ধরে থাক আর্গোকে। খেয়াল রেখো, কেউ যেন ছিটকে না যাও আর্গোর বুক থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমুদ্র-ঝড় চলে যাবে। এই ঝড়ই হয়ত আমাদের নিয়ে যাবে তীরের দিকে। এই সমুদ্র-ঝড়ই হয়ত আশীর্বাদ আমাদের কাছে।

খেয়াল নেই কতকক্ষণ চলেছে এই সমুদ্রঝড়। কিন্তু ঝড় যখন চলে গেল, অ্যাগন সমুদ্র শান্ত স্থির হল, তখন সমুদ্রঝড়ের আঘাতে আর্গোর দিকনির্ণয়ক হাল দারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। পাল খোলা থাকলেও আর্গো সমুদ্রঝড়ের আঘাতে বিপর্যস্ত। ভগ্নতরীর মত অসহায়ভাবে ভেসে চলল আর্গো। দূরবীণ চোখে, কম্পাস হাতে, অস্থির চোখে ক্যাপ্টেন টিম দেখে চলেছে, কোন নিরুদ্দেশে ভেসে চলেছে তাদের অভিযানতরী আর্গো। ডবস লাল ফ্ল্যাগ শূন্যে তুলে ধরল। ফ্ল্যাগ মাধ্যমে সঙ্কেত পাঠাল, আর্গো বিপদের মুখে। কে আছ কোথায়, সাহায্য কর।

অ্যাগন সমুদ্রের মাঝ দরিয়ায় তখন মাছ ধরতে এসেছে দুটি তুরষ্কীয় ফিশিংবোট। আর্গোর লালসঙ্কেত ধারী পতাকা নজরে এল তাদের। দাঁড় টেনে তুর্কী ফিশিং বোট দুটো এসে দাঁড়াল আর্গোর পাশে।

—কি ক্যাপ্টেন, সমুদ্রঝড়ে নাজেহাল নাকি? টোব্যাকো পাইপ থেকে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে জিজ্ঞেস করে তুর্কী মেছো বোটের মাঝি-মাল্লারা।

—কিছুটা সমুদ্রঝড়ে নাজেহাল তো বটেই। কিন্তু তার চেয়েও বেকায়দায় ফেলেছে গ্রীক ওরসম্যানরা, মাঝ সমুদ্র থেকে হঠাৎ চলে গিয়ে। আর্গোকে টেনে নিয়ে যাবার লোকই কমে গেছে।

—ও. কে! ঘাবড়িও না। আমরা দুই নৌকো থেকে দুজন করে চারজন লোক দিচ্ছি। তাহলে হবে?

—ফাইন। চারজন লোক পেলেই চালিয়ে নিতে পারব। কিছুটা আশার আলো যেন দেখতে পায় রোইং মাষ্টার মার্ক। স্বস্তির হাওয়া নেমে আসে আর্গোর অভিযাত্রীদের মুখে।

—তোমরা কাছাকাছি কোথাও থামতে চাও ক্যাপ্টেন? প্রশ্ন করে মেছো নৌকোর সর্দার।

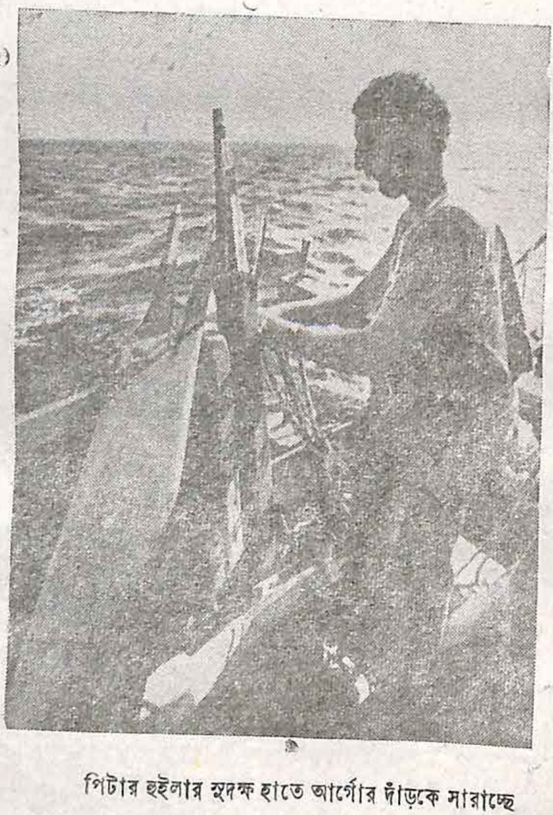
হাতের ম্যাপটার দিকে এক ঝলক চোখ বোলায় ক্যাপ্টেন টিম। বলে—ট্রয়ের গায়েই দেখছি প্রাচীন হেলেসপট বন্দর। তার পাশেই ক্যানাকাল শহর। ক্যানাকাল যেতে পারলে হয়ত মুস্কিল আশান হবে।

—ওঃ, তাহলে তো আপনাকে পৌঁছাতে হচ্ছে দরদানালস্ বন্দরে। দরদানালসই তো প্রাচীনকালের হেলেসপট বন্দর। দরদানালস্ এখান থেকে আশী মাইল মত। তা যা পেল্লায় নৌকো আপনাদের, মনে হচ্ছে, এই সকাল থেকে জোরসে দাঁড় টানলে বিকেল নাগাদ দরদানালস্ হয়ে ক্যানাকাল পৌঁছে যেতে পারেন।

—থ্যাঙ্ক ইউ বন্ধু, বিপদে এভাবে এগিয়ে এসেছ বলে। প্রীতির হাত বাড়িয়ে দেয় ক্যাপ্টেন টিম মেছো নৌকোর সর্দারের দিকে।

—আরে ক্যাপ্টেন, মাঝে মাঝেই একাজ আমাদের করতে হয়। এ জায়গায় প্রায়ই আচমকা ঝড় উঠে। বহু বড় জাহাজও থমকে যায় অ্যাগন সমুদ্রের এই মাঝ দরিয়ায়। তোমাদের ভাগ্য ভাল যে তোমরা ডুবে যাওনি। এই সমুদ্রতলে যদি ডুব দিতে, দেখতে, বহু নৌকো পড়ে আছে সমুদ্রতলে। হালকা গলায় বলে মেছো নৌকোর সর্দার।

ইতিমধ্যে পিটার হুইলার সুদক্ষ হাতে আর্গোর দিক নির্ণয়ক দাঁড়কে মোটামুটি সারিয়ে কাজের উপযোগী করে তুলল। আর্গো চলার উপযোগী হয়ে উঠল।



পিটার হুইলার সুদক্ষ হাতে আর্গোর দাঁড়কে সারাচ্ছে

আর্গো আবার শুরু করে যাত্রা দারদানালস হয়ে ক্যানাকালের পথে। সাময়িকভাবে ক্যাপ্টেনের দলে ভিড়েছে মেছো নৌকার অদক্ষ চারজন ওরসম্যান।

রোইং মাষ্টার মার্ক বলে—পিটার মোর‍্যান, তুমি আর আমি দারদানলস পর্যন্ত রোইং লীড করব। আজ সন্ধ্যের মধ্যে যে ভাবেই হোক আমাদের পেঁছাতেই হবে দারদানালস হয়ে ক্যানাকাল।

দুরন্ত গতিতে চালাতে থাকে নৌকো আর্গোকে, মার্ক আর মোর‍্যান। প্রায় পাঁচ থেকে ছয় নট স্পীডে চলতে থাকে আর্গো। এক ঘণ্টায় আর্গো পেরিয়ে আসে প্রায় আট মাইল পথ।

এই দুরন্ত গতিতেই চলতে থাকে আর্গো। ক্রমে দুপুর গড়িয়ে নেমে আসে বিকেল। সূর্য তখন ডুবু ডুবু। আকাশ ছড়িয়ে সূর্যের শেষ বেলার রক্তিম আভা। ধীরে ধীরে ভেসে উঠে দারদানালস বন্দরের আলো। তুর্কী মেছো নৌকার দাঁড়িরা বলে—ক্যাপ্টেন, আমরা প্রায় এসেই গেছি। ঐ দেখুন, বাঁয়ে দূরে ট্রয়ের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে। সামনেই আপনাদের সেই প্রাচীনকালের হেলেসপট বন্দর। আমরা আজকাল একেই বলি দারদানালস।

—এখান থেকে ক্যানাকাল যেতে আর কত সময় নেবে?—প্রশ্ন করে ক্যাপ্টেন টিম।

—কত আর? বড় জোড় আধঘণ্টা। এসেই তো গেছি। আর কোন ভয় নেই ক্যাপ্টেন।

—ওঃ, থ্যাঙকস্।—স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ক্যাপ্টেন টিম।

ঠিক সন্ধ্যের আবছা আলোয় বিপর্যস্ত আর্গো ধীরে ধীরে এসে বন্দর করে ক্যানাকালে। অভিযাত্রীরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠে—চিয়ার্স ফর ক্যাপ্টেন টিম। চিয়ার্স ফর টার্কিশ-ফিশ-বোট ফ্রেন্ডস্। চিয়ার্স ফর আর্গো।

ক্যাপ্টেন টিম বলল—বন্ধুরা, এখানে তিনদিন আমরা থাকছি। নৌকা সারাব, নূতন আটজন ওরসম্যান রিক্রুট করব। সময় চাই। তাই এই তিনদিন তোমরা শহরে যেতে পার, খুশীমত আনন্দ-স্ফূর্তি করতে পার, কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু, চতুর্থ দিন সকাল ৭টায় আর্গো শুরু করবে আবার তার যাত্রা, কথাটা খেয়াল রেখ। ফিরে এসো এখানে সেই কথাটা খেয়াল রেখেই।

ক্যাপ্টেন টিম সেভেরিন হাজির হয় টার্কিশ ওরসম্যান এরসিন ইরমিবেস্গ্লুর বাড়ীতে। ক্যাপ্টেন টিমকে দেখেই হৈ-হৈ করে খুশীতে লাফিয়ে উঠে এরসিন।—আহ! ক্যাপ্টেন! এসে গেছ? কত্ত বছর পরে দেখলাম। আবার অ্যাডভেঞ্চারে?—ক্যাপ্টেনের হাত দুটো খুশীতে জড়িয়ে ধরে বলে এরসিন ইরমিবেস্গ্লু।

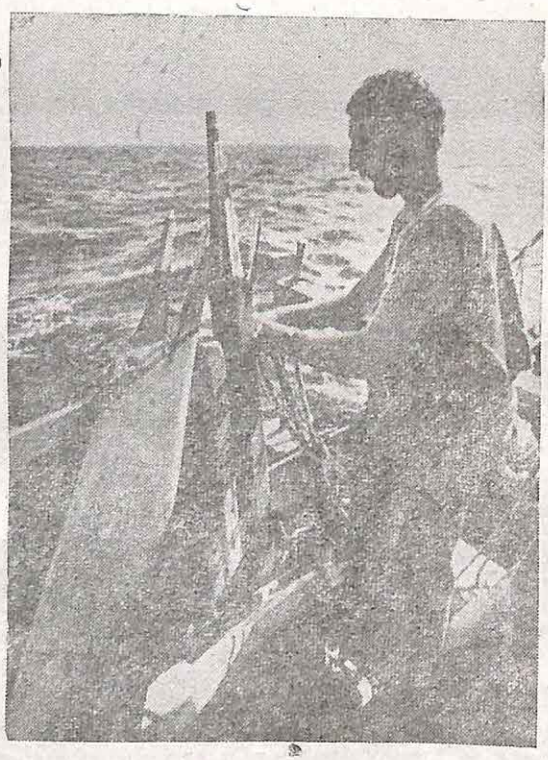
—আমার ম্যাসেজ পেয়েছ এরসিন? বুঝলে, যা ভয় পেয়েছিলাম তাইই হয়েছে। অ্যাগন সমুদ্রের মাঝ দড়িয়ায় আমাদের বেকায়দায় ফেলে চলে গেছে আটজন গ্রীক ওরসম্যান। তাই আটজন ওরসম্যান চাইই। কিছু ব্যবস্থা করেছ? ঐসব ওরসম্যান ছাড়া আর্গো চালানই যাবে না।

—ওঃ, তাহলে তো আপনাকে পৌঁছাতে হচ্ছে দরদানালস্ বন্দরে। দরদানালসই তো প্রাচীনকালের হেলেসপট বন্দর। দরদানালস্ এখান থেকে আশী মাইল মত। তা যা পেল্লায় নৌকো আপনাদের, মনে হচ্ছে, এই সকাল থেকে জোরসে দাঁড় টানলে বিকেল নাগাদ দরদানালস্ হয়ে ক্যানাকাল পৌঁছে যেতে পারেন।

—থ্যাঙ্ক ইউ বন্ধু, বিপদে এভাবে এগিয়ে এসেছ বলে। প্রীতির হাত বাড়িয়ে দেয় ক্যপ্টেন টিম মেছো নৌকোর সর্দারের দিকে।

—আরে ক্যাপ্টেন, মাঝে মাঝেই একাজ আমাদের করতে হয়। এ জায়গায় প্রায়ই আচমকা ঝড় উঠে। বহু বড় জাহাজও থমকে যায় অ্যাগন সমুদ্রের এই মাঝ দরিয়ায়। তোমাদের ভাগ্যি ভাল যে তোমরা ডুবে যাওনি। এই সমুদ্রতলে যদি ডুব দিতে, দেখতে, বহু নৌকো পড়ে আছে সমুদ্রতলে। হালকা গলায় বলে মেছো নৌকোর সর্দার।

ইতিমধ্যে পিটার হুইলার সুদক্ষ হাতে আর্গোর দিক নির্ণয়ক দাঁড়কে মোটামুটি সারিয়ে কাজের উপযোগী করে তুলল। আর্গো চলার উপযোগী হয়ে উঠল।



পিটার হুইলার সুদক্ষ হাতে আর্গোর দাঁড়কে সারাচ্ছে

আর্গো আবার শুরু করে যাত্রা দারদানালস হয়ে ক্যানাকালের পথে। সাময়িকভাবে ক্যাপ্টেনের দলে ভিড়েছে মেছো নৌকার অদক্ষ চারজন ওরসম্যান।

রোইং মাষ্টার মার্ক বলে—পিটার মোর্‍্যান, তুমি আর আমি দারদানলস পর্যন্ত রোইং লীড করব। আজ সন্ধ্যের মধ্যে যে ভাবেই হোক আমাদের পোঁছাতেই হবে দারদানালস হয়ে ক্যানাকাল।

দুরন্ত গতিতে চালাতে থাকে নৌকো আর্গোকে, মার্ক আর মোর্‍্যান। প্রায় পাঁচ থেকে ছয় নট স্পীডে চলতে থাকে আর্গো। এক ঘণ্টায় আর্গো পেরিয়ে আসে প্রায় আট মাইল পথ।

এই দুরন্ত গতিতেই চলতে থাকে আর্গো। ক্রমে দুপুর গড়িয়ে নেমে আসে বিকেল। সূর্য তখন ডুবু ডুবু। আকাশ ছড়িয়ে সূর্যের শেষ বেলার রক্তিম আভা। ধীরে ধীরে ভেসে উঠে দারদানালস বন্দরের আলো। তুর্কী মেছো নৌকার দাড়িরা বলে—ক্যাপ্টেন, আমরা প্রায় এসেই গেছি। ঐ দেখুন, বাঁয়ে দূরে ট্রয়ের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে। সামনেই আপনাদের সেই প্রাচীনকালের হেলেসপট বন্দর। আমরা আজকাল একেই বলি দারদানালস।

—এখান থেকে ক্যানাকাল যেতে আর কত সময় নেবে?—প্রশ্ন করে ক্যাপ্টেন টিম।

—কত আর? বড় জোড় আধঘণ্টা। এসেই তো গেছি। আর কোন ভয় নেই ক্যাপ্টেন।

—ওঃ, থ্যাঙকস্।—স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ক্যাপ্টেন টিম।

ঠিক সন্ধ্যের আবছা আলোয় বিপর্যস্ত আর্গো ধীরে ধীরে এসে বন্দর করে ক্যানাকালে। অভিযাত্রীরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠে—চিয়ার্স ফর ক্যাপ্টেন টিম। চিয়ার্স ফর টার্কিশ-ফিশ-বোট ফ্রেন্ডস্। চিয়ার্স ফর আর্গো।

ক্যাপ্টেন টিম বলল—বন্ধুরা, এখানে তিনদিন আমরা থাকছি। নৌকা সারাব, নূতন আটজন ওরসম্যান রিক্রুট করব। সময় চাই। তাই এই তিনদিন তোমরা শহরে যেতে পার, খুশীমত আনন্দ-স্ফূর্তি করতে পার, কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু, চতুর্থ দিন সকাল ৭টায় আর্গো শুরু করবে আবার তার যাত্রা, কথাটা খেয়াল রেখ। ফিরে এসো এখানে সেই কথাটা খেয়াল রেখেই।

ক্যাপ্টেন টিম সেভেরিন হাজির হয় টার্কিশ ওরসম্যান এরসিন ইরমিবেস্গ্লুর বাড়ীতে। ক্যাপ্টেন টিমকে দেখেই হৈ-হৈ করে খুশীতে লাফিয়ে উঠে এরসিন।—আহ! ক্যাপ্টেন! এসে গেছ? কত্ত বছর পরে দেখলাম। আবার অ্যাডভেঞ্চারে?—ক্যাপ্টেনের হাত দুটো খুশীতে জড়িয়ে ধরে বলে এরসিন ইরমিবেস্গ্লু।

—আমার ম্যাসেজ পেয়েছ এরসিন? বুঝলে, যা ভয় পেয়েছিলাম তাইই হয়েছে। অ্যাগন সমুদ্রের মাঝ দাড়িয়ায় আমাদের বেকায়দায় ফেলে চলে গেছে আটজন গ্রীক ওরসম্যান। তাই আটজন ওরসম্যান চাইই। কিছু ব্যবস্থা করেছ? ঐসব ওরসম্যান ছাড়া আর্গো চালানই যাবে না।

—হবে হবে, সব হবে ক্যাপ্টেন। রিল্যাক্স কর, বিশ্রাম কর। খাও-দাও, রাতটা ঘুমাও। কালসকালে এসব কাজের কথা হবে। বল, আর কি খবরাখবর।

হালকা মনে সেরাতে ঘুমায় ক্যাপ্টেন টিম সেভেরিন। ক্যাপ্টেন জানে এরসিন কাজের লোক, কথার লোক। ওরসম্যান বিষয়ে ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবে!

পরদিন সকাল বেলায় এরসিন বেড়িয়ে পড়ে ওরসম্যানদের জন্য। সারাদিন চলে পরীক্ষা। শেষে মাত্র দুজন ওরসম্যাকে সিলেক্ট করে ক্যাপ্টেন। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে মাত্র দুজন ওরসম্যানকে পাওয়ায় ভীষণ হতাশ হয়ে যায় ক্যাপ্টেন টিম।

—তাইতো মাত্র দুজনকে পেয়ে কি করে চালান যাবে আর্গোকে! আর্গো চালাতে চোদ্দজন ওরসম্যান লাগেই। তারই সঙ্গে রিসার্ভ আটজন না হলে পালা করে ওরসম্যানরা বিশ্রাম পাবে কি করে? মোট বাইশজন ওরসম্যান তাই চাইই। এই দুজন ওরসম্যান যদি বা পাওয়া যায় তাহলেও ওরসম্যাদেয় সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ষোলজনে। দরকার আরও ছজন। কি হবে এরসিন?

—ক্যাপ্টেন, তুমিতো ষ্টেডি মানুষ, তবে ঘাবড়াচ্ছো কেন? তোমার ষোলজন ওরসম্যান আছে। তার সঙ্গে আর দুজন পেলে চারজন বাড়তি ওরসম্যান থাকল। এতেই আপাততঃ কাজ চলবে। পরে সব ঠিক করে নেব।

—কি বলছ এরসিন? আপাততঃ এতেই কাজ চলবে, পরে ঠিক করে নেব। কোথায় কখন ঠিক করবে এসব? বিস্মিত গলায় বলে ক্যাপ্টেন টিম।

—আহ ক্যাপ্টেন, বলতে দেবেতো সব। এখানে যদি ঠিক ওরসম্যান না পাই, তাহলে যাতে পরের বন্দরে ওরসম্যান পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করেছি। ইস্তামবুল বড় বন্দর জানই তো। দেড়শ মাইল পথ। ওখানে খবর দেওয়া আছে। জনাদশেক ওরসম্যানের কথা বলে রেখেছি ইস্তাসবুলের দুই রোইং ক্লাবে। ব্যাস্, ইস্তামবুল পৌছালেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে।

—কিন্তু ইস্তামবুল পর্যন্তই বা পৌছাচ্ছি কি করে?—এখানেতো মাত্র দুজন ওরসম্যান পাচ্ছি। আর দুজন কোথায়? অবাক গলায় বলে ঠিম।

—বাহ্! অবাক করলে ক্যাপ্টেন। তোমার সামনে দাঁড়ানো এই যে আমি এরসিন ইরমিবেস্‌গু, তোমার পুরোনো ওরসম্যান বন্ধু, সে কি মরে গেছে। বন্ধু ভুলনা, মরা হাতিও লাখ টাকা।

—জানি, মরা হাতি লাখ টাকা। কিন্তু বয়সটা কত হোল খেয়াল রেখেছে? মার্কো পোলোর রুটের অভিযানের সময়, ১৯৬১ সালে, যখন প্রথম তুমি আমার দলে এলে, তখন তোমার বয়স ছিল মাত্র আঠারো বছর। তড়তাজা কাঁচা ছেলে। ভাল রোইং করেছ সেসময়ে। কিন্তু আজ যে বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করছে। সেরকম দম জোর আর কি আছে তোমার এরসিন? তাছাড়া চতুর্থজন ওরসম্যানইবা কোথায়?

—আছে, আছে, ঠিক সময়েই দেখতে পাবে। আর আমার জন্য ভেব না। আমিতো মাত্র এই দেড়শ মাইল পথে মাঝে মাঝে হাল ধরব। সেটা খুব কঠিন হবে না। আমি তোমার রোইং মাষ্টার মার্কের সঙ্গে সব আলোচনা করে নেব। ভেবেনো কিছু। বিশ্বাস রেখো আমার উপর ক্যাপ্টেন।

—আমি তোমাকে ভরসা করি এরসিন। আশা করব তোমার ব্যবস্থায় ইস্তামবুল পর্যন্ত পেঁছাতে কোনও ঝামেলা হবে না।

—নিশ্চিন্তে থাক ক্যাপ্টেন। এরসিন ইরমিবেসগ্লু কাউকে ডুবিয়েছে এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। আর তোমার ব্যপারে? তুমি তো আমার অভিযান জীবনের গুরু' তোমাকে কি বিপদে ফেলতে পারি?

দারদানালস বন্দরে ঠিক সুর্য উঠার বেলায় একে একে সবাই হাজির হয়েছে অভিযাত্রী নৌকা আর্গোতে। ট্রনডুর, হোলিস্, রিডম্যান, হুইলার, মার্ক, জন এগান, মার্টিমোর, মোর্য়ান, চোদ্দজন ওরসম্যান। ক্যাপ্টেন টিম সেভেরিন চঞ্চল চোখে তাকিয়ে আছেন পাড়ের দিকে, ভাবছেন, খুব ভোরে কোথায় গেল এরসিন? এরসিনের বাড়ী ছেড়ে এখানে আসার আগে এরসিনকে দেখতে পেল না কেন? এরসিন কি ঝামেলায় ফেলবে? না সেরকম তো লোক নয় এরসিন।

সুর্য উঠল চারদিক আলো করে। শুরু হোল নৌ-চলাচল দারদানালস বন্দরে। সকাল ছটা বেজে গেল। যাত্রা শুরু হোতে বাকী মাত্র একঘণ্টা। কিন্তু এই সময়েও দেখা নেই কেন এরসিনের? এরসিনের সেই চতুর্থ ওরসম্যানের? অস্থিরতা ক্রমেই বাড়তে থাকে ক্যাপ্টেন টিমের। চঞ্চলতা ভাইস ক্যাপ্টেন পিটার হুইলারের চোখেও।

এমনি সময়ে, সবার চোখের সামনে দেখা দিল, দূরে আবছা এরসিনের মূর্তিটা। এরসিনের পিছনে পিছনে আসছে আর একটি আবছা মূর্তি।

—যাক্, আসছে তাহলে এরসিন আর একজন ওরসম্যানকে নিয়ে। খুশীর ঝলক ক্যাপ্টেনের গলায়।

ধীরে ধীরে এরসিনরা এসে পেঁছায় আর্গোর সামনে। ক্যাপ্টেন, ঠিক সময়েই এসেছি, কি বল? —হাঁক ছাড়ে এরসিন। —এই দেখ তোমার চতুর্থ ওরসম্যান।

ভাল করে চতুর্থ ওরসম্যানের দিকে তাকায় এরসিন। বলে,—আরে! এযে এক্কেবারে কচি ছেলে! কত বয়স?

—ষোল বছর। বয়েসটা কম, কিন্তু দারুণ ওরসম্যান। হেসে বলে এরসিন।

—পারবেতো টানতে? কোনও ট্রায়েল নিলাম না? তোমার চেনাতো হে এরসিন? —কেমন সন্দেহ ক্যাপ্টেনের গলায়।

—আরে! নিজের ভাইপোকে চিনব না। দেখই না ক্যাপ্টেন, কেমন রোইং করে ছেলেটা। এইযে মার্ক। কেমন আছ? ভয় নেই, এরসিন বাজে লোককে রেকস্যাণ্ড করে না। নির্ভয়ে তোমার অভিযানী নৌকাটা ছাড়তে পার।

আর্গো ক্যানাকেলস থেকে শুরু করে যাত্রা। এবার যাত্রা ইস্তামবুল হয়ে বসফরাসের দিকে। দেড়শ মাইলের যাত্রা। ১২-ই জুন ১৯৮৫ শুরু হোল এই পর্বের অভিযান।

পাঁচ নট্স বেগে চলতে লাগল আর্গো। এরসিনের একান্ত অনুরোধে, রোইং এর প্রথম সারিতে একপাশে গেল চব্বিশ বছরের যুবক পিটার মোর‍্যান, অন্যপাশে এরসিনের ভাইপো ষোল বছরের কিশোর মরিসন ইরমিবেসগু। ওরসম্যানদের লীড করতে লাগল এই দুজনে, নিখুত দক্ষতায়। আর্গোর গতি ক্রমেই বাড়তে বাড়তে প্রায় সাত নর্টস এ চলতে লাগল। সি-অফ-মারমারা মন্দ্রিত হয়ে উঠতে লাগল চোদ্দটি নিখুত দাঁড়ের উত্থান পতনের শব্দ ধ্বনিতে ধক্-ধক্, ধক্-ধক্, ধক্-ধক্। ছুটতে লাগল আর্গো পক্ষীরাজের মত।
আর্গোর পাটাতনের উপরে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল কিশো মরিসনের দিকে।
—ক্যাপ্টেন, আমার ভাইপো মরিসনকে কেমন দেখছ? হেসে জিজ্ঞেস করল এরসিন।
—দারুণ নৌকা টানে দেখছি। কি দম, কি জোড়। ছেলেটাইতে সেরা দাঁড়ি।—স্নেহ ঝড়া গলায় বলে ক্যাপ্টেন টিম। হুইলার, ট্রনডুর, সব্বাই একসঙ্গে বলে উঠে,—সত্যিই দারুণ ওরসম্যান পাওয়া গেছে! মরিসন আমাদের টীমে আসায় আর্গার স্পীড কত বেড়ে গেছ দেখেছেন ক্যাপ্টেন?
আর্গোর অভিযাত্রীদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল কিশোর মরিসনের কথা। খুশী সবাই, শুধু পিটার মোর‍্যান ছাড়া। ওরসম্যানদের ও লীড করলেও তার কথা কেউ বলছেনা, বলছে সবাই বাচ্চা মরিসনের কথা। নাঃ, ক্রমেই ব্যাপারটা অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল মোর‍্যানের কাছে।
সেদিন ছঘণ্টায় আর্গো প্রায় পঞ্চাশ মাইল জলপথ অতিকম করল। সি অফ-মারমাবার গভীর নীল জলে রাতে বিশ্রাম নিল আর্গো আর তার অভিযাত্রীরা। ক্লান্তিতে সবাই ঘুমে অচেতন। ঘুম এল না শুধু মোর‍্যানের চোখে। ভাবে, রোইং-এ সে লীড করবে, আর নাম হবে মরিসনের? কেন? ক্যাপ্টেনের বন্ধু এরসিনের ভাইপো বলে? তবে কি সে ফালতু লোক? নাঃ, নাঃ, এর একটা ফয়সালা করতেই হচ্ছে দেখছি।
পরদিন ৭ ই জুন, ১৯৮৪ সকাল বেলায় আর্গো আবার চলতে শুরু করল। সি-অফ-মারমাবার উদ্বেল তরঙ্গ, দুপাশের তীরের জলঢাকা উচু-নীচু পাহাড়, দুতীরের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ সি-অফ-মারমারার জলপথ, এর মাঝখান দিয়ে যখন চলতে লাগল আর্গো, ওরসম্যানরা নৌকা বাইতে গিয়ে খুবই তাড়াতাড়ি হাপিয়ে উঠতে লাগল। ঘন ঘন বদল হোতে লাগল দাঁড়িরা।
ক্যাপ্টেন টিম চেঁচিয়ে বলতে লাগল—জোরে নৌকা বাইবে না এখন। হালকা হাতে

দাঁড় টান, তানাহলে জলদি ক্লান্ত হবে। সি-অফ-মারমারার এই একশ মাইল জলপথ, দুর্দান্ত ভয়ংকর। ডুবো পাহাড়, ঘূর্নিঝড়, ঘূর্নাবর্ত মাঝে মাঝেই বিপদে ফেলবে। রোইং মাষ্টার মার্ক বলে উঠল,—ফ্রেন্ডস, তোমরা হিসেব করে দাঁড় টেনো। ডুবো পাহাড়কে সবচেয়ে ভয়। সি-অফ-মারমারার জলপথে আকাবাঁকা ভাবে যেন আর্গো না চলে। চললেই দাঁড় ভেঙ্গে যাবে, নৌকার তলা ফুটো হয়ে যেতে পারে। আর্গো যেন ঠিক সরল রেখায় চলে।

—মার্ক, আমার শরীর ভাল লাগছে না। আই ওয়ান্ট রেষ্ট। মনে হচ্ছে পুরো দিনটাই বিশ্রাম দরকার।—দাঁড়টানা বন্ধ করে জলের উপরে দাঁড়টাকে তুলে হঠাৎ বলে উঠে পিটার মোর‍্যান।

—সে কি! তুমি একদিকের ওরসম্যানদের লীড করছ! আজকে তুমি বসে গেলে কি করে চলবে?—অবাক গলায় বলে রোইং মাষ্টার মার্ক।

—উপায় নেই। তাছাড়া ভাবছ কেন, তোমাদের ব্লু-আইড্ বয়, নূতন ওরসম্যান মরিসন রয়েছে। সেই লীড করবে।—কেমন বাঁকা বেসুরো গলায় বলে মোর‍্যান!

—মোর‍্যান, ছেলেমানুষী কোরো না। আমরা অভিযানে যাচ্ছি। এটা স্পোর্টস ছাড়া কিছু নয়। স্পোর্টসম্যানরা কেউ তোমার মত ছেলেমানুষী করে না।—ধমক দেয় রোইং মাষ্টার মার্ক।

—স্পোর্টসম্যানরা তাদের যথাযথ যোগ্য সম্মানও পায়, এটাও ভুল না মার্ক। ওরসম্যানদের যদি আমি লিডই করি তাহলে লিড-ওরসম্যান হিসাবে যোগ্য মর্য্যাদা কি পাচ্ছি আমি? তোমরা কি মরিসনকে মাথায় তুলছ না?—রাগী গলা মোর‍্যানের।

—ছিঃ মোর‍্যান, তুমি ঐটুকু ছেলের উপর এত জিলাস? তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।—ধমকে উঠে ক্যাপ্টেন টিম।

—ক্যাপ্টেন, মোর‍্যানতো ঠিকই বলেছে। এতটা পথ মোর‍্যানই যখন লীড করেছে ওরসম্যানদের, ঐতো লীড ওরসম্যান। আমি না হয় পিছনের কোথায় বসব। সবচেয়ে ছোট যে, সে কখনও সব ওরসম্যানদের লীডার হোতে পারে?—সরল মিষ্টি হাসি ছাড়িয়ে সামনের দাঁড় ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় মরিসন।

—সে কি! সামনে তুমি না থাকলে চলবে কি করে?—মার্ক বিচলিত গলায় বলে।

—ঘাবড়াবেন না মার্ক। আর্গো চালাতে হলে চাই টীম স্পিরিট। একা কি কেউ এই পেল্লাই নয় টনি নৌকা চালাতে পারবে? তাই টীম স্পিরিটের জন্য অনেক কিছুই প্রত্যেককে স্যাক্রিফাইশ করতে হবে। ভাই মোর‍্যান, প্লিইজ বি ইজি। তুমিই আমাদের লীড-ওরসম্যান। আমি জায়গা চেঞ্জ করছি।—বিনীত স্বর মরিসনের।

অশান্তির কালো মেঘকে চকিতে কেমন সহজ হালকা করে দেয় ষোল বছরের কিশোর ওরসম্যান মরিসন। ক্যাপ্টেন টিমের দিকে তাকিয়ে খুশীর হাসিতে তাকায় এরসিন।

যেন চোখের ভঙ্গীতে বলে, দেখলে ক্যাপ্টেন, তোমার টীমের সবচেয়ে প্র্যাকটিক্যাল লোক আমার ভাইপো, এই ছেলেটাই।

ব্যাপারটা এত সহজে মিটলেও, আপাত দৃষ্টিতে মোর‍্যান খুশী হলেও, ঠিক সহজ হয় না মোর‍্যান। সারাদিন আর্গো চললেও নৌকার মধ্যে কেন জানি এক চাপা অস্বস্তি রয়েই যায়।

ক্যাপ্টেন টিম বলেন,—নাঃ, এবারের ওরসম্যান সিলেকশন ঠিক হয় নি। সবাই যেন কেমন কেমন?

৯-ই জুন, ১৯৮৪ আর্গো এসে ভিড়ল ইস্তামবুল পেরিয়ে বসফরাসে। এরসিন ফিসফিস করে বলল,—ক্যাপ্টেন, যদি চাও এবারই ভালভাবে তোমার ওরসম্যানদের বদলি করে নিতে পার। ইস্তামবুলের দুই রোইংক্লাবের দাঁড়িরা ভাল নৌকো টানে। তাছাড়া বসফরাস থেকে এরিগলি, এই শ'মাইল ব্ল্যাক-সি ভয়ংকর বিপজ্জনক। বড় জাহাজরাই মাঝে মাঝে বিপদে পড়ে। আর তোমার এই নৌকো, তার জন্য চাই এই জলপথের সঙ্গে চেনা ওরসম্যান। কি করবে ভেবে দেখো। দু-দিন বিশ্রাম করবে তো এখানে, যা ঠিক করার কোরো।

গম্ভীরভাবে কি যেন চিন্তা করে ক্যাপ্টেন টিম। তারপর বলে,—ছেলেরা, দুদিন বিশ্রাম করুক, স্ফূর্তি করুক। তবে নৌকো ছেড়ে সেকেন্ড ক্যাপ্টেন হুইলার, রোইং মাষ্টার মার্ক, পার্টনার প্যাটারসন আর টার্কি'স ফ্রেন্ড এরসিন যাবে না। জরুরী মিটিং আছে।

—মনে হচ্ছে, ক্যাপ্টেন, কোনও কিছু আন্দাজ করছেন আপনি?—প্রশ্ন করে হুইলার।

—ইয়েস হুইলার, একটা ঘটনা বারবারই আমার চোখে পড়ছে। সব কিছুই মিটিংএ বলব।

—ক্যাপ্টেন, মাষ্টার মরিসন কি আমাদের মিটিং-এ থাকতে পারে। ওকেতো একলা এই শহরে ছাড়তে পারি না।—মরিসনের কাকা এরিসন বলে।

—ও. কে। থাকুক, মরিসন।—ক্যাপ্টেন পারমিশন দেয়। আর্গোর অন্য সবাই চলে গেল বসফরাসের শহরাঞ্চলে। দুদিন বিশ্রাম। বড় খুশী সবাই। শুধু দুশ্চিন্তা ক্যাপ্টেন টিম সেভেরিনের চোখেমুখে। কেন বারবার এমন হচ্ছে, এটাই দুশ্চিন্তায় ফেলেছে টিমকে।

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর শুরু হোল মিটিং। ক্যাপ্টেন টিম সেভেরিন বলল—বন্ধুরা, একটা ব্যাপার বারবার ঘটছে, সেটাই তোমাদের নজরে আনতে চাইছি প্রথমে। লক্ষ্য কর, লিনিয়সের ব্যবহার। হঠাৎ কেমন যেন বিদ্রোহী হোল। স্বর্ণগুহার সোনার লোভে আটজন ওরসম্যানকে নিয়ে সরে দাঁড়াল। তারপর পিটার মোর‍্যানের কথা। ওকেতো লীড-ওরসম্যান থেকে কেউ সরায় নি। কিন্তু, হঠাৎ কেমন যেন

ক্ষেপে গেল মরিসনের উপর। অথচ, আমি লক্ষ্য করেছি, মরিসন সত্যিই বেষ্ট রোয়ার। ভাবছি, এ সবই কি সাময়িক ঘটনা, না, এর পেছনে কোনও মতলব, উদ্দেশ্য, আছে। যদি সত্যিই তা থাকে, তাহলে কিসের মতলব, উদ্দেশ্য ?

—ব্যাপারটা আমিও খেয়াল করেছি। ওরসম্যানদের মধ্যে কিসের যেন এক চাপা উত্তেজনা আছে। কিন্তু কেন, কিসের জন্য জানি না।—সেকেণ্ড ক্যাপ্টেন হুইলার বলে উঠে।

—মার্ক, তোমার কি মনে হয় ওরসম্যানরা বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, স্ট্রেইনড হচ্ছে, তাই মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে উল্টোপাল্টা কথা বলছে ?

—না ক্যাপ্টেন, এখন পর্যন্ত তেমন স্ট্রেইনড কেউ হয় নি। সি-অফ-মারমারার জলপথটা যদিও ঝঞ্ঝাটে ছিল, কিন্তু সত্যি বলতে কি মরিসনের দারুণ স্ট্রোকিং-এ আর্গো চলেছে দুরন্ত গতিতে, সহজ সরল রেখায়। আমার মনে হচ্ছে, এইসব হৈ-চৈ, ঝঞ্ঝাট যা হচ্ছে, সবই যেন কেমন গট-আপ ব্যাপার। কিন্তু কেন, বলতে পারব না।

—রাইট, রাইট মার্ক। সবই গট-আপ ব্যাপার। কিন্তু কারণটা কি জানতে চাই। আর দ্বিতীয় কাজ, সত্যিই যদি এসব গট-আপ ব্যাপার হয় তবে আমাদের করণীয় কি ? মনে রাখতে হবে, দু হাজার জলপথের মধ্যে আমরা এসেছি অর্ধ পথ, মাত্র এগারোশো মাইল। কিন্তু এরপর যখন ব্ল্যাক-সিতে পড়ব, তখন সমুদ্র হবে যেমন উত্তাল, বন্দরগুলোও পাব দূরে দূরে, সবকিছুই অজানা। এই সময়ে কোনও বিপদ এলেই সমস্ত অভিযানই হয়ত বানচাল হয়ে যাবে। তাই স্থির করতে হবে, সাবধান হবার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

—ক্যাপ্টেন, একটা কথা ঠিক, ওরসম্যানদের কিছু বাতিল করা দরকার। প্রয়োজনে লীড ওরসম্যান মোর‍্যানকেও বাদ দিতে হবে।—ঠাণ্ডা গলায় বলে মার্ক।

—সেকি ! মোর‍্যানকে বাদ দিলে ওরসম্যানদের লীড করবে কে ? মার্ক, তুমি তো দাঁড় বাইবে না প্রথম সারিতে বসে ? তবে ?

—ক্যাপ্টেন, আমি মরিসনকে লীড-ওরসম্যান করতে রাজী। বেষ্ট ওরসম্যান প্রথম সারিতে থাকাই বাঞ্ছনীয়। সে বয়সে বড়ই হোক, বা ছোটই হোক।

—নাঃ ক্যাপ্টেন, আমি লীড-ওরসম্যান হতে রাজী নই।—হঠাৎ কথাটা বলে উঠে ষোল বছরের মরিসন ইরমিবেসগু।

—কেন ? রাজী নও কেন ? আমরা যদি ঠিক করি তুমি রাজী হবে না কেন মরিসন ? প্রশ্ন করে ক্যাপ্টেন টিম।

—স্যার, আপনারা সবাই ছেলেমানুষ। আমি কি সবার চেয়ে বয়সে ছোট নই ? যদি সত্যিই সবার ছোট হই, তবে আমাকে সেকেণ্ড পজিশনে রাখুন। তাহলেও আমি আর্গোকে স্পীডে নিয়ে যেতে পারব। আপনারা তো তাই চান, নয় কি ?

—হ্যাঁ, তাই-ই চাই।—বলে ক্যাপ্টেন টিম।

—তাহলে দেখুন, আর্গো জোরেও চলল অথচ আমি ওরসম্যানদের লীড করছি, ছোট হয়েও, এই অভিযোগে কেউ আপনাদের দোষারোপও করতে পারবে না।

—কথাটা মন্দ বলনি মরিসন। ও. কে, তুমি সেকেণ্ড পজিশনেই বসবে।—বলে রোইং মাষ্টার মার্ক।

—তবে একটা কথা স্যার, অনেকেই কিন্তু দাড়কে জলে ঠিক ডীপ করে ষ্ট্রোক টানছে না। আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা ইচ্ছে করেই করছে।

—তাই নাকি!—অবাক হয় ক্যাপ্টেন।

—ইয়েস ক্যাপ্টেন। ব্যাপারটা আমারও নজর এড়ায়নি। তাই তো বলছিলাম, কিছু ওরসম্যানদের বদল করা দরকার।

—কিন্তু ওরা ফলস ষ্ট্রোক করবে কেন? ক্লান্ত হলে, ওরসম্যানরা তা করে। কিন্তু—

—মনে হচ্ছে আমার, বেশী স্পীডে আর্গো যাক, এটা কোন কোনও ওরসম্যান চাইছে না।—আস্তে আস্তে কথাগুলো বলে মরিসন।

—কি করে বুঝলে মরিসন? হয়ত জোরে ষ্ট্রোক করতে ওদের কষ্ট হচ্ছিল, অসুবিধে হচ্ছিল?

—না ক্যাপ্টেন, অসুবিধে হলে ওরা দাঁড়কে জলের মধ্যে হালকাভাবে ডুবিয়ে টানত। তা না করে এমনভাবে টানছিল যাতে আর্গো সোজা না গিয়ে একটু দুলে চলে। দুলে চললেই নৌকার গতি কমে যাবে! এভাবে দুলিয়ে নৌকা টানতে জোর ও দক্ষতা দরকার, সবাই পারে না।

—হুম।—মরিসনের কথাটা শুনে কেমন চুপ করে যায় ক্যাপ্টেন। তারপর বলে—তাহলে কোনও ষড়যন্ত্র চলছে মনে হচ্ছে।

—তাহলে কি করবে ক্যাপ্টেন?—প্রশ্ন করে টার্কি'স ওরসম্যান-বন্ধু এরসিন।

—করতে তো কিছু হবেই।

—অভিযানে এমন ঝঞ্ঝাট পাকিয়ে ওদের লাভ কি টিম?—প্রশ্ন করে পার্টনার প্যাটারসন।

—দেখাই যাক না কি হয় ব্যাপার। এসব আজেবাজে ব্যাপার নিয়ে এখন না ভাবাই ভাল। অভিযানে বহু সমস্যাই আসবে, আর তার মোকাবিলা করাই তো থ্রিল'। এইসব অভিযানের আনন্দ তো সেখানেই। ধীর সংযত কণ্ঠ ক্যাপ্টেনের।

—স্যার, আমার মনে হচ্ছে কি জানেন, আমাদের পাশাপাশি অন্য কেউ এই অভিযান চালাতে চাইছে, যাতে আমরা স্বর্ণগুহা আবিষ্কার করার আগেই তারা সেখানে পৌঁছাতে পারে। আর তারা সত্যিই যদি তা পারে তাহলে স্বর্ণগুহার উপর তাদেরই

অধিকার হবে আমাদের আগে।—সহজ গলায় স্বচ্ছভাবে কথাগুলো বলে কিশোর ওরসম্যান মরিসন।

কথাটা শুনে ক্ষণিক কিছুক্ষণ চিন্তা করে ক্যাপ্টেন সেভেরিন। ভ্রূ কুঁচকে উঠে। গম্ভীর গলায় বলে—হ্যাঁ, তোমার কথাটা ঠিক হতেও পারে মরিসন। বুঝেছি, সেই গ্রীক ওরসম্যান লিনিয়সই তাহলে দল পাকিয়ে এসব করতে চাইছে। ঠিক আছে, দেখা যাক কি হয়।

—ঘাবড়াবেন না ক্যাপ্টেন, সবাই লিনিয়সের মত স্বর্ণলোভী নয়। অ্যাডভেঞ্চারকেই শুধু ভালবাসে, এমন লোকের অভাব আপনার দলে কম নেই। আমরা অনেকেই আপনার পাশে আছি স্যার।—দৃপ্তকণ্ঠে বলে কিশোর ওরসম্যান মরিসন।

—থ্যাঙ্ক ইউ মরিসন। স্বস্তির হাসি ছড়িয়ে পড়ে ক্যাপ্টেনের গলায়।

—মরিসন ঠিকই বলেছে ক্যাপ্টেন। সবাই কি লোভী হয়? তাছাড়া এটাও তো সত্যি, সোনার মত ব্যাপার যেখানে আছে সেখানে কিছু গুণ্ডা বদমাইস জুটবেই। সেসব বদমাইসদের মোকাবিলা করবার ক্ষমতা এই পিটার ডবস রাখে।

—জানি ডবস। সেজন্যই তো তোমাকে দলে নিয়েছি। তুমি তো আর স্রেফ নৌকার পাল ঠিকঠাক করার জন্য স্ট্র্যাপিং মাষ্টার হয়ে আসনি, তুমি যেমন নামী জিওলজিষ্ট, তেমনি দুরন্ত ডাকসাইটে স্যুটার তাও জানি! সেজন্যই এই অভিযানে একসময়ে তোমারই দরকার হবে বেশী।

—ক্যাপ্টেন, তুমি আমার উপর ভরসা করেছ বলে ধন্যবাদ। তবে ব্যাপার-স্যাপার যেখানে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে এখন থেকেই ভেবে রাখা দরকার, সত্যিই যদি অন্য কোনও স্বর্ণলোভী দলের সঙ্গে আমাদের মোকাবিলা হয়, ক'জন লোককে পাব লড়াই-এ।

—ডবস, এসব নিয়ে অত ভেবো না। যারা অভিযানে চলেছে সবাই তারা জোয়ান, তরতাজা মানুষ। যারা লড়ার, তারা ঠিকই লড়বে, যারা বেইমানী করার তারা যতই দল গড়, ঠিক সময়ে, সরে দাঁড়াবে, উল্টো আঘাত করবে।

—স্যার, যে যাই করুক, লড়াই হলে সে দলে এই মরিসন থাকছে, সেটা বিশ্বাস করতে পারেন।

কথাটা শুনে হেসে ফেলে ক্যাপ্টেন সেভেরিন আর স্ট্র্যাপিং মাষ্টার পিটার ডবস। ডবস বলে—তুমি থাকছ এটা জানি। জানি, তোমাকে ভরসা করলে ভুল হবে না।

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।—মিষ্টি জবাব দেয় মাষ্টার মরিসন।

—নাঃ, অনেক রাত হোল। এবার বিশ্রাম করা যাক। যারা নৌকায় থাকতে চাও থাক। আর যারা ভাল করে বিশ্রাম চাও, তারা শহরে গিয়ে যে-কোনও সি-বীচ হোটেলে বিশ্রাম করতে পার।

—ক্যাপ্টেন, আপনি কোথায় থাকবেন?—প্রশ্ন করে মাষ্টার মরিসন।

—কেন ? এই বোটে। এই আর্গো ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারি না। আর্গোকে সব সময়ে নজরে রাখা দরকার। কে কোথায় এর ক্ষতি করে, বলা তো যায় না। এছাড়া যখন ষড়যন্ত্রের আভাষ পাচ্ছি তখন আর্গো ছেড়ে সোরে আনন্দ করতে যাবার কথা ভাবতেই পারি না।

সেই রাতে আর্গো ছেড়ে কেউই ডাঙ্গায় গেল না। আর্গোর কাঠের পাটাতনেই রাত কাটাল ক্যাপ্টেন সেভেরিন আর তার বিশেষ বাছাই ক'জন সঙ্গীরা।

১৯৮৪ সালের ১১ই জুন সকালে বসফরাস ছেড়ে রওনা হোল আর্গো। ইতিমধ্যে ১০ই তারিখে ইস্তামবুলের দুটি রোয়িং ক্লাব থেকে মোট নয়জন ওরসম্যানকে বাছাই করে দলে নেওয়া হয়েছে। যে নয়জন আর্গোর ওরসম্যানের চালচলন, দাঁড়টানা সন্দেহজনক মনে হচ্ছিল তাদের বসফরাসেই বাতিল করে দেওয়া হোল।

বাতিল নয়জন ওরসম্যানের লিডার পিটার মোর‍্যান ক্ষেপে উঠল।—ক্যাপ্টেন, এভাবে মাঝপথে আমাদের বাতিল করতে পারেন না। দিস ইজ আনফেয়ার।

—মোর‍্যান, তুমি কি আমায় ভয় দেখাচ্ছ ?

—ভয় দেখাব কেন ? তবে বাতিল হচ্ছি কেন জানতে পারি ?—রুক্ষ মেজাজ পিটার মোর‍্যানের।

—তোমরা টায়ার্ড। দাঁড় টানতে পারছ না ঠিকমত। তাই ফ্রেস ওরসম্যানদের এনে রোইং টীমকে জোরদার করছি।

—কে বলল দাঁড় টানা ঠিক হচ্ছে না ?—ক্ষীপ্ত গলা মোর‍্যানের।

—আমি বলেছি। তোমাদের ওরস বারবার জলের উপর দিয়ে স্কীড করে যাচ্ছিল কেন ? হয় ওটা ইচ্ছাকৃত ব্যাপার, নয়ত ওরসম্যানরা কমপ্লিটলি এক্সজস্টেড।—রোইং মাষ্টার মার্ক এবার রুখে উত্তর দেয় মোর‍্যানকে।

—আই সি। মার্ক, তুমিই তাহলে ক্যাপ্টেনকে এইসব বুঝিয়ে আমাদের বাতিল করিয়েছ ?

—দেখ মোর‍্যান, তোমরা জান, কি অন্যায় তোমরা করতে যাচ্ছ। এর উপর ধমকাচ্ছ আমাদের ? কি স্পর্দ্ধা তোমার ? —রোইং মাষ্টার মার্ক ক্রমেই ক্ষেপে উঠতে থাকে।

—ওঃ, এই ব্যপার। অনেক কিছু ভেবে ফেলেছ তোমরা। ঠিক আছে, এরকম ক্যাপ্টেনের কাছে থাকতেও আমরা ইচ্ছুক নই। আমরা যাচ্ছি মার্ক। তবে মনে রেখ, অপমানের শোধ ঠিক সময়েই নেব। —পিটার মোর‍্যান আর তার আটজন সঙ্গী ক্ষীপ্ত শার্দুলের মত হিংস্র চেহারা নিয়ে চলে যায় বসফরাস থেকে।

বসফরাস থেকে নূতন নয়জন ওরসম্যান নিয়ে যাত্রা শুরু করে আর্গো। ক্যাপ্টেন সেভেরিন চীন্তিত মুখে বিড়বিড় করে বলে উঠে—নাঃ, এবারের যাত্রাটাই দেখছি স্রেফ

ঝঞ্ঝাটের হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রতি পদেই কেউ না কেউ বেঁকে দাঁড়াচ্ছে, গোলমাল পাকাচ্ছে! শেষ-মেষ কি হয় কে জানে?

—কিচ্ছু ভাববেন না ক্যাপ্টেন, সব ঠিক হবে। খারাপরা চলে যাচ্ছে, ভালই তো। —নিশ্চিন্ত গলায় বলে ষোল বছরের সর্বকনিষ্ঠ ওরসম্যান মরিসন ইরমিবেসগ্লু।

—হ্যাঁ, একদিকে এটা ভাল, ঠিকই। কিন্তু, হুমকিও দিচ্ছে, ভয়ও দেখাচ্ছে। সেটাই তো চিন্তার। —চিন্তিত গলা ক্যাপ্টেন সেভেরিনের!

—স্যার, এসব নিয়ে কিছু ভাববেন না। বলেছি তো, এই মরিসন থাকতে একটুও ঘাবড়াবেন না। ইস্তামবুল রোইং ক্লাবের যে নূতন নয়জন ওরসম্যান আমাদের দলে এল, তারা যদি উল্টোপাল্টা কিছু না করে তাহলে ভয়ের কিছু নেই। দেখবেন, সব ঠিক হবে।—ভরসা দেয় কিশোর মাষ্টার মরিসন।

মরিসনের ভারীক্কি কথা বলার ঢঙে হেসে ফেলে ক্যাপ্টেন। চিন্তার জাল মুখ থেকে সরে যায়। বলে উঠে,—মনে হচ্ছে তুমি মিরাক্যাল করে দেবে মরিসন? গুন্ডা-বদমাইসদের কাউকেই ভয় পাও না তুমি?

—এসব থ্রিল হবে বলেই তো কাকাকে ধরে আপনার দলে এসেছি স্যার। স্বর্ণগুহায় যাচ্ছি, এটা দারুন ব্যাপার। অথচ বদমাইস থাকবে না, গুন্ডা থাকবে না, বিশ্বাসঘাতকরা থাকবে না, তা কখনও হয়? এখন তো সব ভিলেনদের চিনে গেছি আমরা, আর ভয় নেই এখন।

—হাঃ, হাঃ, হাঃ। —গলা কাঁপিয়ে জোড়ে হেসে উঠে সেভেরিন। —দারুন বলেছ কথাটা। সত্যিই তো, সোনা নিয়ে ব্যপার, এর মধ্যে লোভীর দল না থাকাই অন্যায়। ও. কে বস। আর চিন্তা করছি না। বরং ভাবা যাক আরও নয়শ মাইল পথ কত তাড়াতাড়ি যেতে পারি? কত তাড়াতাড়ি পেঁছাতে পারি কোলচিসে? ককেশাস পাহাড়ের কোনও গুহার দেওয়াল জুড়ে সোনার স্তর সত্যিই আছে কিনা, খুঁজে বার করতে হবে। এসো, সবাই সামনের পথের কথাই চিন্তা করি।

আর্গো নূতন উদ্যমে চলতে থাকে বসফরাস থেকে কোলচিসের পথে। ১১-ই জুন সকালে জোর গতিতেই ভেসে চলে আর্গো বসফরাস প্রণালীর বুক দিয়ে।

বসফরাস ছাড়বার পরেই প্রথমে জলের ছটায় আর্গো একটু বেসামাল হোল। ড্যানিউব, ডন ও ডিনেপারের জল তখন এসে পড়ছে সি-অফ মারমারা আর ব্ল্যাক-সির মুখে। সমুদ্র তরঙ্গ উত্তাল।

এসব দেখে মার্ক চেঁচিয়ে উঠল—সামনেই জলে ঘূর্নি আছে। সাবধান! কিক্ হার্ড। জোড়ে দাঁড় টান। —মার্কের কথার সঙ্গে সঙ্গেই কিছুটা হেলে গেল আর্গো বাঁদিকে।

এবার মরিসন চেঁচিয়ে উঠল,—রাইট ওরসম্যানরা, জলে দাঁড়গুলোকে বেশী ডীপ্ করে ষ্ট্রোক কর ভাই। লেফট্ ওরসম্যান বন্ধুরা, দোহাই তোমাদের, তোমাদের দাঁড়গুলো

জলে বেশী ডীপ না করে হালকা টানো। না হলে নৌকা যে আরও কাত হয়ে যাবে। সামলানোই যাবে না।
প্রাণপণে দুধারে দুধরণের দাঁড়টানা চলতে লাগল। আর্গো তবুও সোজা হতে পারছে না। বসফরাস বাঁক নৌ-নাবিকদের কাছে ভয়াবহ বাঁক। সোজা নব্বই ডিগ্রী বেঁকে গেছে জলপথ এখানে। ড্যানিউব-ডন-ডিনেপার নদীর জল প্রচণ্ড জোরে, বুলেটের গতিতে হিস্-হিস্-করে এসে পড়েছে সি-অফ মারমারা আর ব্ল্যাক-সি-র সংযোগস্থলে। উচ্ছলিত তরঙ্গ।
—হ্যাদি অ্যালা! হাপ হাপ! —একসঙ্গে চিৎকার করে তুর্কী ওরসম্যানরা ১৪ ফুট লম্বা দাঁড়গুলো টেনে চল্ল। নৌকা আর্গো তবুও কেমন যেন মাতালের মত এপাশ-ওপাশ হেলে যাচ্ছে।
—ব্রেভো! চমৎকার! আর মাত্র ত্রিশ মিটার যেতে হবে, তাহলেই বেবিকের দক্ষিণের এই বসফরাসের ভয়ংকর বাঁকটা পেরুতে পারব। —উৎসাহ দিতে থাকে রোইং মাষ্টার মার্ক।
মার্কের কথার সঙ্গে তাল মিলিয়ে, চিৎকার করে একতালে দাঁড় টানতে থাকে চোদ্দজন ওরস্ম্যান—হ্যাদি অ্যালা! হাপ-হাপ! হ্যাদি অ্যালা! হাপ-হাপ।
—এইতো, আর বাকী মাত্র কুড়ি মিটার। এটা পার হলেই শান্ত ব্ল্যাক সিতে পড়বে। আর মে টানতে পারবে দাঁড়। আপ বয়েস। —উৎসাহ দিতে থাকে মার্ক। —বাঃ, দশ মিটার মাত্র বাকী। ষ্ট্রোক হার্ডার। —চেঁচায় রোইং মাষ্টার।
সেই মুহূর্তে একঝলক প্রচণ্ড জলস্রোত ধাক্কা মারে আর্গোকে। প্রচণ্ড হাওয়া, জলস্রোতের বিপরীতে আর্গোর চলার চেষ্টা, এরই মধ্যে একঝলক প্রচণ্ড জলস্রোত, সব কিছু মিলেমিশে আর্গোকে লাট্টুর মত একপাক ঘুরিয়ে দেয়।
—দাঁড়কে ধরে রাখ। কিপ টাইট। তানাহলে আর্গো উল্টে যাবে। —দাঁতে দাঁত চেপে আর্গোর দাঁড় চেপে ধরে বলতে থাকে ষোল বছরের কিশোর ওরসম্যান মরিসন।
এরই মধ্যে জলের ধাক্কায় আর্গো বসফরাস প্রণালীর ভয়ংকর বাঁক পেরিয়ে আসে। তারপরই স্থির হয়ে চলতে থাকে। —আহ! এখন তাহলে ব্ল্যাক-সির-শান্তবুকে এসে পড়েছি। —স্বস্তির ভঙ্গীতে বলে রোইং মাষ্টার মার্ক।
—বাপস্! পাঁচ ছয় নটসে টেনেও নৌকা একচুল নড়ছিল না। পুরো দিনটাই লেগে গেল এইটুকু বসফরাস প্রণালী পেরুতে? —দম নিতে নিতে বলে মাষ্টার মরিসন।
—কি মাষ্টার, এখনই বেদম হয়ে গেলে? —মরিসনের পিটে সস্নেহের হাত রেখে বলে ক্যাপ্টেন সেভেরিন।
—না স্যার, আমি ঠিক আছি। আমার ওরসম্যান অন্য বন্ধুরাও ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপর আর্গো কোথায় কোথায় দাঁড়াচ্ছে? —প্রশ্ন করে মাষ্টার মরিসন।

—মোটামুটি দাঁড়াব এরপরই এরেগলিতে, প্রায় ১৫০ মাইল পথ। তারপর একটু বেশী পথ পাড়ি দেব, ধর ২০০ মাইল মত। থামব সিন্‌পে। তারপর র‍্যামসুন, অদ্দুর্, ট্র্যাবজন, হোপা, আর তারপরই পোটি হয়ে কোলচিস। প্রায় ১০০ মাইল দূরে দূরে হবে এই শেষের বন্দরগুলো। তাই খুব কষ্ট হবে না তোমাদের নৌকা বাইতে। —ক্যাপ্টেন সেভেরিন ৮৫০ মাইল বাকী জলপথ পরিক্রমার মোটামুটি ছবিটা বুঝিয়ে বলে।

—না স্যার, নৌকা বাইতে আমরা ভয় পাচ্ছি না। আমি চিন্তা করছি, এরপর সবই কি নিশ্চিন্তে কেটে যাবে? কোনও বিপদ, কোনও শত্রু আক্রমণ—

—কি বলতে চাইছ মরিসন? কিসের বিপদ? কারা আক্রমণ করবে আমাদের? বিস্মিত ক্যাপ্টেন সেভেরিন।

—মরিসন ঠিকই বলেছে ক্যাপ্টেন। কেন জানি, আমারও মন বলছে, লিনিয়স্, মোর‍্যান, ওদের সঙ্গীরা, কেউই সহজে আমাদের ছেড়ে দেবে বলে মনে হচ্ছে না। —সেকেন্ড ক্যাপ্টেন পিটার হুইলার কেমন যেন চিন্তিত গলায় বলে।

—নাঃ, নাঃ, তারা আমাদের পাচ্ছে কি করে? ওদের কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না আর। আমাদের পিছনে কোনও নৌকোও ফলো করে আসে নি। তাহলে লিনিয়স-মোর‍্যানরা আমাদের ধরছে কেমন করে?—নিশ্চিন্ত গলা ক্যাপ্টেনর।

—রাইট। আর কোনও ঝঞ্ঝাট নেই।—ক্যাপ্টেনের পার্টনার প্যাটারসনের গলাতেও নিশ্চিন্ততা।

—না স্যার, সেকেন্ড-ক্যাপ্টেন হুইলার যা বলেছেন, তাকে একেবারে উড়িয়ে দেবেন না। —মাষ্টার মরিসন হঠাৎ মাঝ থেকে কথাটা বলে উঠে।

—মাষ্টার, তোমারও মত এই?—হেসে বলে ক্যাপ্টেন।—হুইলারের মতের সঙ্গে একমত হচ্ছ কেন মাষ্টার?—সস্নেহে প্রশ্ন করে ক্যাপ্টেন।

—তা জানি না। অত সব বলতেও পারব না। তবে আমার মন বলছে এতটা নিশ্চিন্তে আমাদের বসে থাকা ঠিক হবে না। বিপদ আসবেই। সাবধান না হলে বেকায়দায় পড়ব।—বিজ্ঞসুলভ ভঙ্গী কিশোর ওরসম্যান মরিসনের।

সবশুনে হাসে ক্যাপ্টেন সেভেরিন। বলে,—তাহলে কি করা উচিত মাষ্টার? তুমি যা বলবে তাই করব। ধর, তুমিই আমাদের ক্যাপ্টেন।

—ধ্যাৎ! কি যে বলেন!—লজ্জায় মুখ নীচু করে মাষ্টার মরিসন। মুখটা লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে যায়। একটু চুপ করে থেকে বলে—ষ্ট্র্যাপিং মাষ্টার ডবসকে নজর রাখতে বলুন চারপাশে। বিপদের আভাস উনিই দেবেন ঠিক সময়ে।

—ওকে। অর্ডার বি ক্যারেড। ডবস, দূরবীন নিয়ে এবার থেকে নজর রেখো, অন্য নৌকো কোথাও দেখতে পাচ্ছ কিনা।—ক্যাপ্টেন সেভেরিন অর্ডার দেয়।—আর কিছু মাষ্টার?

—আর একটা কথা, রাত্রে বেশ কিছু লোককে জেগে পাহাড়া দিতে হবে। একজন, দুজন জেগে থাকলে হবে না। আমার মনে হয়, বিপদ রাত্রেই আসবে।—ভেবে ভেবে, ধীরে ধীরে কথাগুলো বলে মাষ্টার মরিসন

—অলরাইট, এভাবেই ব্যবস্থা হবে।—হেসে বলেন ক্যাপ্টেন সেভেরিন।—মাষ্টার, তোমার মতে বিপদ আসছেই, তুমি নিশ্চিত। কিন্তু আমরা কোথায় থাকছি শত্রুরা জানছে কি করে?

—বারে, আপনার রুট ম্যাপ যদি জানা থাকে তাহলেই আসতে পারবে।

—কিন্তু রুট ম্যাপতো কাউকে জানাইনি মরিসন। আন্দাজে এই বিরাট সমুদ্রে কি কারুর আসা সম্ভব?—ব্যাপারটাকে সহজভাবে নিয়ে বলে ক্যাপ্টেন সেভেরিন।

—আপনি না জানলে কি হবে, ওরা জেনেছে। জেনেছে বলেই তো মিথ্যে ঝগড়া করে ওরা আমাদের ছেড়ে চলে গেল। আপনি দেখে নেবেন, লিমনোসে যে লিনিয়সকে ছেড়ে এসেছেন, সেই তার আটজন ওরসম্যান নিয়ে মোর্যানের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ক্যানাকলে। ওখান থেকেই ওরা আমাদের ফলো করছে।

—কি যা তা বলছ মাষ্টার? আমাদের পিছনে কোনও নৌকো, স্পীড বোট, কিছুই আসছে না। তাহলে এসব বলছ কেন?—এবার কিছুটা যেন রেগেই যায় ক্যাপ্টেন। মনে মনে ভাবে, ছেলেমানুষীর একটা সীমা আছে তো?

—স্যার, পরে যা হবে তা পরে দেখা যাবে। এসব ছেড়ে দিন। আমরা বরং যত তাড়াতাড়ি পারি রোইং করে কোলচিসের দিকে এগিয়ে যাই, কি বলেন স্যার?

—হ্যাঁ, তাই ভাল মরিসন। আমরা অভিযাত্রীরা অহেতুক ভাবনা-চিন্তা কমই করি। সামনে যখন যা আসে তারই মোকাবিলা করি। বি রিল্যাক্সড। রোইং কর, গান কর, বিশ্রাম কর, এই হচ্ছে তোমাদের প্রোগ্রাম, ও. কে?

—ইয়েস ক্যাপ্টেন।

এরগিল, সিনুপ, স্যামসুন হয়ে আর্গো চলেছে অদুর্র পথে। আর মাত্র তিনশ মাইল পথ বাকী। তারপরই আর্গো পৌছে যাবে হোপা বন্দরে। তুরস্ক দেশের শেষ বন্দরে। এরপরই আর একশ মাইল গেলে পৌছাবে পোটিতে, সোভিয়েত জর্জিয়ার প্রথম বন্দরে। পোটিতে সমুদ্র অভিযান হবে শেষ। তারপর কোলচিসের ধারেকাছে, ককেশাস পর্বতমালার কোথায় আছে সেই সোনার হরিণের মত মরিচিকাময় স্বর্ণগুহা, তারই চলবে অন্বেষণ। নৌকা আর্গো চলেছে স্বচ্ছন্দে, অভিযাত্রীরা সবাই খুশী। অভিযানের শেষ পর্বের কাছাকাছি তারা।

ক্যাপ্টেন সেভেরিনের পার্টনার প্যাটারসনের মেজাজও খুব ভাল। আর্গোনটিকার কাল্পনিক তিন হাজার বছরের কাহিনীর অনেক কিছুই এই অভিযানে সত্যি হয়ে দেখা দিচ্ছে। বসফরাস চ্যানেলে চলতে গিয়ে গল্পের নায়ক জেইসন যখন বারবার ধাক্কা

খেয়েছে; সমুদ্রে নৌকা এগুচ্ছেনা, তখন সমুদ্র দেবতার প্রার্থনায় হারকিউলিস আর্গোনটিকাকে বসফরাস প্রণালীর শতবাধা ডিঙ্গিয়ে-ব্ল্যাক সিতে আনতে পেরেছিল। সমুদ্রের শয়তান কতবার ডুবাতে চেয়েছিল আর্গোনটিকাকে, তবুও গ্রীক দেবতারা জ্যেইসনের সঙ্গী হওয়ায় সব বাধা দূর হয়েছিল। প্যাটারসন ভাবে, তাদেরওতো বহু বাধা বারবার আসছে, কিন্তু কেটেওতো যাচ্ছে। তাদের সহায়ও কি তবে দেবতারা ? কিন্তু—

হঠাৎ থেমে যায় প্যাটাসন। ভ্রূ কুঁচকে যায়। তারপর স্মিত হাসি ফুটে উঠে মুখে। আরে! কিশোর মরিসনকে সত্যিই দেবতা হারকিউলিসের মত দেখতে। যেমন রূপবান, তেমনি শক্তিমান। মরিসন আসার পর আর্গো চলছে পঙ্খীরাজের মত, বিপদ চোখের পলকে চলে যাচ্ছে। মরিসনই কি তবে দেবতা হারকিউলিস হয়ে তাদের কাছে এসেছে ? বিস্মিত বিস্ফারিত চোখে প্যাটারসন তাকিয়ে থাকে মরিসনের দিকে।

আর্গো এসে পেঁছাল আরদুর কাছাকাছি। পড়ন্ত বেলায় ব্ল্যাক-সির নীল জলে ঝিকমিকি আলোর খেলা। ক্যাপ্টেন সেভেরিন দূরবীনে চোখ লাগিয়ে চারদিক দেখছে। অন্য দূরবীন চোখে ষ্ট্র্যাংপি মাষ্টার ডবস্।

—ক্যাপ্টেন, আমাদের ডানদিকে আরদু পোর্টের প্রায় গা ঘেঁসে যে পাহাড় ওখানে কিছু দেখতে পাচ্ছেন ? ফিসফিস করে বলে ডবস্।

—জ্যেইসন কেপের কথা বলছ ? কৈ, জ্যেইসনের কেপের ধারেকাছে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।—অবাক গলা ক্যাপ্টেনের।

—দেখিতো, আমি কিছু দেখতে পাই কিনা ? স্যার, দূরবীনটা দেবেন ?—বলেই ক্যাপ্টেন সেভেরিনের হাত থেকে দূরবীনটা চেয়ে নেয় মাষ্টার মরিসন। কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে ডানদিকের পাহাড়, জ্যেইসন কেপের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর কিছুদূরে আরদু পোর্টের দিকে তাকায়। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে,—স্যার, দেখুন, দেখুন। ঐ কারা পাহাড়ের উপর থেকে আমাদের দেখছে। আরদু পোর্টে দাঁড়িয়ে থাকা স্পীট-বোট থেকেও একদল আমাদের লক্ষ্য করছে।

—দেখি।—ক্যাপ্টেন চোখ রাখে এবার দূরবীনে।—ইয়েস, আমাদের নজরে রাখছে ওরা। তাহলে—

—হ্যাঁ ক্যাপ্টেন, উই আর ওয়াচড্। এরাই কি তবে লিনিয়স মোর‍্যানের দল ?—প্রশ্ন করে ডবস।

—বি ইজি। ওদের ভুলে যাও। ওদের যে আমরাও দেখেছি বুঝতে দিও না। সহজভাবে এগিয়ে চল। আরদু-পোর্টে আর্গোকে লাগাও। ওয়ান থিং, আর্গো ছেড়ে আজ কেউ সোরে যাবে না। আমাদের ম্যান পাওয়ার দরকার।—গম্ভীরমুখে বলে ক্যাপ্টেন সেভেরিন।

সেকেন্ড ক্যাপ্টেন হুইলার বলে,—সোরে গিয়ে খাবার-দাবার আমিই নিয়ে আসি তবে ক্যাপ্টেন।

—স্যার, আপনি এখনই এত সিরিয়স হচ্ছেন কেন? ওরা যদি আমাদের শত্রুও হয়, ওরা আমাদের অ্যাটাক করবে না।—বিজ্ঞভাবে বলে মাষ্টার মরিসন।

—কি করে বুঝলে ওরা আমাদের অ্যাটাক করবে না?—অবাক গলায় বলে ক্যাপ্টেন সেভেরিন।

—কোলচিসের কোথায় যাবেন, তার যাত্রাপথ, এসবতো শুধু আপনিই জানেন। স্বর্ণগুহায় পেঁছাবার পৃথক নক্সাও নিশ্চয়ই আছে আপনার, নয়কি ক্যাপ্টেন?

—হ্যাঁ, ঠিকই।

—তাহলে, আপনাকে নাহলে ওরা স্বর্ণগুহায় পেঁছবে কি করে? তাই, স্বর্ণগুহা পর্যন্ত ওরা আমাদের কিছু করবে না। তবে, স্বর্ণগুহার দেখা পেলেই ওরা হিংস্র হয়ে উঠবে। সেটাই সবচেয়ে বিপদ-শংকুল মুহূর্ত হবে আমাদের।

—বাঃ, খুব সুন্দর অ্যানালিসিস করেছতো মাষ্টার মরিসন! হ্যাঁ হে এরসিন, তোমার ভাইপো বয়সে সবচেয়ে ছোট হলে কি হবে, এতো দারুণ ছেলে।—মরিসনের পিটে আদুরে চাপড় মেরে বলে ক্যাপ্টেন সেভেরিন।

—তাহলে বলছ, আমার ছোট ভাইপো তোমাদের টীমের লায়েবিলিটি নয়?—হেসে বলে মরিসনের কাকা এরসিন।

—লায়েবিলিট কি? ওতো দিনকে দিন অ্যাসেট হয়ে উঠছে আমাদের কাছে।

—যাঃ কি যে বলেন স্যার।—সলজ্জ হাসি মাষ্টার মরিসনের।

ইতিমধ্যে আর্গো এসে ভিড়েছে আরদু পোর্টে। সেরাতে আর্গো ছেড়ে সোরে বিশেষ কেউই গেল না। রাত্রে পাহাড়াও চল্ল জোড়দার। কিন্তু কি আশ্চর্য! অন্য কেউ যে আর্গোর দিকে নজর রাখছে, বা তাদের পক্ষে বিপজজনক কিছু করছে এমন চিহ্ন সেরাতে একটুও পাওয়া গেল না।

উৎকণ্ঠা নিয়ে রাতটা পার হল। ভোরের সূর্যের আলোয় নীল সমুদ্র রক্তাক্ত হয়ে উঠল। স্বচ্ছ হল দূরের জনপদ। ধীরে ধীরে সচল হোল আরদু পোর্ট। সকাল আটটায় আরদু ছেড়ে রওনা হোল আর্গো ট্রবজনের দিকে। দু-তিন দিনের পথ।

ঠিক তখনই ভেসে এল স্পীডবোটের আওয়াজ। হলদে রঙের স্পীডবোট হুশ-হুশ করে পিছন থেকে ছুটে এসে আর্গোর প্রায় গা ঘেসে চলে গেল।

—ক্যাপ্টেন, ঐ দেখুন লিনিয়স আর মোর্যান দাঁড়িয়ে।—চিৎকার করে উঠে ষ্ট্র্যাপিং মাষ্টার ডবস।

—মাই গড! শেষকালে ঐ বদমাইসরা সত্যিই আমাদের পিছু নিল দেখছি!—শংকিত কণ্ঠ পার্টনার প্যাটারসনের।

—ক্যাপ্টেন, এবার সত্যিই এলার্ট হতে হবে দেখছি।—স্বল্পভাষী ডাক্তার নিক হোলিসের গলায় দুশ্চিন্তার ছাপ।

স্পীড-বোট ফট্ ফট্ শব্দ করে অনেকদূরে চলে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ক্যাপ্টেন সেভেরিন বলে উঠল—হুঁ, ওরা আমাদের নৌকোর জন্যই অপেক্ষা করছে বুঝতে পারছি। ওরা প্রকাশ্যেই লড়াই-এ নামবে মনে হচ্ছে।

—স্যার, ঘাবড়াবেন না। দেখাই যাক না, ওরা কি করে। এবার আর্গোকে নিয়ে ওদের পাশে দাঁড় করান ক্যাপ্টেন। সরাসরি জিজ্ঞেস করুন, ওরা কি চায়? কেন আর্গোকে ফলো করছে?—মাষ্টার মরিসন পরামর্শ দেয় প্রাজ্ঞ ক্যাপ্টেন সেভেরিনকে।

—কথাটা মন্দ বলনি মাষ্টার। বুঝতেই পারছি ওরা ঝঞ্ঝাট পাকাবে। তাই সামনা-সামনি ওদের চ্যালেঞ্জ জানানই ভাল।

আর্গোর দাঁড়িরা সমানেই বেয়ে চলেছে দাঁড়। আর্গো দ্রুত এগিয়ে এল স্পীড-বোটের কাছে। ক্যাপ্টেনের নির্দেশে আর্গোকে নিয়ে আসা হলো স্পীড-বোটের পাশেই।

ক্যাপ্টেন চোঙায় মুখ লাগিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল—লিনিয়স, কি ব্যাপার, আমাদের এভাবে ফলো করে চলেছ কেন?

—আহ্! দেখতে পেয়েছ তাহলে আমাদের?—ব্যাঙ্গভরা উচ্চ হাসিতে বলে উঠে বেইমান লিনিয়স, স্পীডবোট থেকে।—তোমাদের ফলো করব কেন? আমরাও চলেছি স্বর্ণগুহায়। ক্যাপ্টেন, আমাদের দল তোমাদের চেয়ে ছোট নয়, মনে রেখ।

—স্বর্ণগুহায়! সোনার লোভ যায়নি মাথা থেকে তাহলে?—প্রশ্ন করে ক্যাপ্টেন।

—সোনা যদি পাই কেন ছেড়ে দেব। তাকিয়ে দেখ, আমাদের লীডার র‍্যাদারফোর্ডকে। ভদ্রলোকের টাকা আছে, তাই সোনার মূল্যও কি জানেন।

—লিনিয়স, তোমাদের লীডার র‍্যাদারফোর্ড স্বর্ণগুহায় পৌঁছাবে কি করে? পথ চেনাবে কে?—ক্যাপ্টেন সেভেরিন সব ব্যাপারটা বুঝতে চায়।

—কি করে পথ চিনে যেতে হয় সে কায়দা আমি জানি সেভেরিন।—এবার রুক্ষ ভারী গলায় প্রত্যুত্তর দেয় লিনিয়স-মোর‍্যানের দলের লীডার, র‍্যাদারফোর্ড।

এতক্ষণ ভাল করে র‍্যাদারফোর্ডকে দেখতে পায়নি প্যাটারসন। র‍্যাদারফোর্ডের গলা শুনে ভাল করে দেখে র‍্যাদারফোর্ডকে। তারপর ফিসফিস করে ক্যাপ্টেনকে বলে—সেভেরিন! এ যে নিউইয়র্কের কুখ্যাত গোণ্ড স্মাগলার! সোনার খবর পেলেই ও মরিয়া হয়ে যায়। সোনার লোভে খুন-খারাপি করতে বিন্দুমাত্র হাত কাঁপে না। ব্যাপারটা আর উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

—তাই নাকি! ভাগ্যিস লিনিয়সদের দল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু যা মনে হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত এরা কোলচিস্ পৌঁছাতেই হয়ত দেবে না।—ক্যাপ্টেন সেভেরিন ভীষণ বিহ্বল হয়ে পড়েন।

—কি, ভয়ে যে চুপচাপ ? র‍্যাদারফোর্ড যা বলে তা করে। স্বর্ণগুহা হবে আমাদের, তোমরা সেখানে যাবার চেষ্টা ছেড়ে দিও সেভেরিন।

ক্যাপ্টেনকে উত্তর দিতে না দিয়ে উঠে দাঁড়ায় মাষ্টার মরিসন।—আমরা স্বর্ণগুহায় না পেঁছালে তোমরা পেঁছাবে কি করে র‍্যাদারফোর্ড ? আমাদের বাদ দিয়ে এক পাও চলতে পারবে না, সেটা তোমরা ভাল করেই জান র‍্যাদারফোর্ড। তাই মিথ্যে ভয় দেখিও না ক্যাপ্টেনকে।—কথাটা বলেই আবার টুক করে বসে পড়ে মাষ্টার মরিসন।

সরাসরি এই সত্যি কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না র‍্যাদারফোর্ড। কথাটা শুনে হকচকিয়ে যায়। তারপর পাশে দাঁড়ানো সাকরেদ লিনিয়সকে জিজ্ঞেস করে—ঐ পুঁচকে ছোকরাটা কে হে ? খুব লম্বা-চওড়া কথা বলল।

—আরে, ঐ তো এখন ক্যাপ্টেন সেভেরিনের সবচেয়ে পেয়ারের ওরসম্যান। ওর জন্যই তো দল ছেড়ে এলাম।—বলে দলত্যাগী অন্য ওরসম্যান পিটার মোর‍্যান।

—আই সি! তবে ছোকরা চালাক সন্দেহ নেই। সেভেরিনকে যতই ভয় দেখাই, ও না হলে কোলচিস হয়ে স্বর্ণগুহার পথের সন্ধান পাব কোথা থেকে ? যাক, ওদের না ঘাটিয়ে সামনে এগিয়ে যাই। সামনে গীরসন আইল্যাণ্ডের কাছে অপেক্ষা করি। ওদের আগে আগে আমরা যাব। কেউ তখন বলতে পারবে না র‍্যাদারফোর্ড সেভেরিনের দলকে ফলো করছে। কি বল হে লিনিয়স ?

—ঠিকই বলেছ বস। মেজাজটা এখন গরম না করাই ভাল। চল, ষ্টার্ট দাও স্পীডবোটকে। গীরসন দ্বীপে গিয়ে হল্ট করি সেভেরিনের জন্য। কথার শেষে ইঙ্গিত করে র‍্যাদারফোর্ড।—ফট-ফট-ফট, ষ্টার্ট দেয় স্পীডবোট। মরিসনের কথার প্রত্যুত্তর না দিয়ে সামনে ছুটে চলে যায় র‍্যাদারফোর্ডের স্পীড বোট।

—যাক এবারকার মত ঝঞ্ঝাট মিটল।—মুক্তির নিশ্বাস ফেলে প্যাটরসন।

—হাঃ, হাঃ, হাঃ—উচু গলায় হেসে উঠে মাষ্টার মরিসন।—স্যার, দেখলেন, সত্যি কথাটা শুনে কেমন লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেল র‍্যাদারফোর্ড তার দলবল নিয়ে।

কথাটা শুনে ক্যাপ্টেন সেভেরিন আর আর্গোর সঙ্গী সাথীরাও হো-হো করে হেসে উঠে। ক্যাপ্টেন বলে,—মাষ্টার তুমি বড্ড ডেয়ার-ডেভিল। ঐরকম বদমাইস লোকের সঙ্গে লড়তে না যাওয়াই ভাল।

—না স্যার, কিচ্ছু ভাববেন না। ভয় যত পাব ততই ওরা ভয় দেখাবে। আর রুখে দাড়ালে লেজগুটিয়ে কুকুরের মত ঠিক এমনি করেই পালিয়ে যাবে।—নিশ্চিন্ত গলায় বলে মাষ্টার মরিসন।

—রাইটলি ডান মরিসন। এবার মনে হচ্ছে আমাদের ডিফেন্স টীম নিয়ে ভাবা দরকার। —ষ্ট্র্যাপিং মাষ্টার ডবস হাত পা ছড়িয়ে মরিসনের পাশে বসতে বসতে কথা-গুলো বলে। রোইং মাষ্টার মার্কও যোগ দেয় আলোচনায়।

—স্যার, কোলচিস থেকে এখন কতটা দূরে আমরা? মনে হয় ১৭০০ মাইলে ইতি মধ্যেই পেরিয়ে এসেছি, তাই না?

—হ্যাঁ মরিসন, দুহাজর মাইলের মধ্যে সতেরোশো মাইল পেরিয়ে এসেছি। বাকী তিনশো মাইল। সামনেই পাব ট্রবজন, তারপর হোপা, তারপরই জলযাত্রার শেষ বন্দর পোটি। জলপথটাতেই চলতে হবে সাবধানে। মনে রাখতে হবে, আমরা চলেছি আদীমকালের পালতোলা নৌকায় আর বদমাইসদের দল যাচ্ছে স্পীডবোটে। তাই আমরা চলব সাবধানে।—রোইং মাষ্টার মার্ক সতর্কবাণীতে সাবধান করে মরিসন আর ডবসকে।

—মার্ক, আপনার মতে এই পথটা যেতে কত দিন লাগবে? আমরাতো পাঁচ থেকে ছয় নট স্পীডে যাচ্ছি। এই স্পীডে দিনে ছয় ঘণ্টা রোইং করতে আমাদের কষ্ট হচ্ছে না।

—মাষ্টার, তোমরা যেভাবে রো-করছ তাতে মনে হয় সহজেই ছয়-সাতদিনের মধ্যে হোপা পৌছে যাব। অর্থাৎ, আজ হচ্ছে ৭ই জুলাই। তাহলে ১৩ বা ১৪ ই জুলাই হোপায় পৌছাব। তারপর হোপা থেকে পোটি পৌছাতে ধর আরও তিন দিন। অর্থাৎ ১৮ই জুলাই. ১৯৮৪ তে আমরা পৌছে যাচ্ছি পোটিতে। সাগর ছেড়ে ডাঙ্গায় পা দেব তখন। —রোইং মাষ্টার হিসাব নিকাশ করে কথাগুলো জানায় মাষ্টার মরিসনকে।

—আই সি। তাহলে আগামী ১৫ দিন আমাদের চলতে হবে চোখ কান খুলে। এই কয়দিন সামান্য রিলাকস করলেই বিপদ এসে হানা দেবে, বুঝেছ মরিসন। মার্ক, হুইলার, তুমি আর আমি, এই চারজন এই ব্যপারে খেয়াল রাখব। অ্যাকসন কি নেব, আমরা ঠিক করে পরে ক্যাপ্টেনের ক্লিয়ারেন্স নেব, ও, কে?—মরিসনকে বোঝায় ব্যপারটা স্ট্র্যাপিংও সুটিং মাষ্টার ডবস।

ক্যাপ্টেন সেভেরিন বলে উঠে—হুইলার, তোমরা দেখছি লড়াই এর জন্য পুরেপুরি তৈরী হচ্ছ।

—হ্যাঁ ক্যাপ্টেন। প্রায় দুমাস একটানা অভিযানের শেষে আজ যখন অভিযানের মূল কেন্দ্রে পৌছাতে যাচ্ছি, তখন যত গুণ্ডা-বদমাইসরাই আসুক, তাদের প্রতিরোধ করতেই হবে। দরকারে লড়তেই হবে। তাই প্রস্তুত থাকতেই চাই।

—হুইলার এ ব্যাপারে যা করতে চাও কর, কিন্তু ঐ ছোট ছেলে মরিসনকে ঐ বিপদের মধ্যে না রাখলেই ভাল করতে।—ক্যাপ্টেন সাবধান করে হুইলারকে।

—দূরে কি রাখা যাবে ক্যাপ্টেন? ওর উত্তেজনাই সবচেয়ে বেশী। আপনিই জিজ্ঞেস করুন না মরিসনকে। ও কি চায়?—হেসে বলে সেকেণ্ড ক্যাপ্টেন পিটার হুইলার।

—স্যার, আপনি বাধা দেবেন না। ক্রমেই অভিযানের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে।

এর থেকে দূরে থাকলে আমার ভীষণ দুঃখ হবে ক্যাপ্টেন। সে দুঃখ আমায় দেবেন না স্যার।—আকুতিভরা কণ্ঠ মাষ্টার মরিসনের।

—তাইতো, বড় চিন্তায় ফেলছ মাষ্টার। অভিযানে নিয়ে এসে তোমাকে বিপদের মুখে ঠেলে দেব, এটা মন চাইছে না। কি যে করি—চিন্তিত হয়ে উঠে ক্যাপ্টেন সেভেরিন।

—বন্ধু, ভেবনা মরিসনের জন্য। ও হচ্ছে দেবদূত, আমাদের হারকিউলিস। কেউ ওর কিচ্ছু করতে পারবে না।—সেভেরিনের পিছন থেকে প্যাটারসন বলে উঠে।

প্যাটারসনের কথায় সেভেরিন ভাল করে তাকায় মরিসনের দিকে। দৃপ্ত, সতেজ চেহারা। কুঞ্চিত কেশ, দীপ্তিময় ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে মরিসন। সত্যিইতো, মরিসন ঠিক যেন হারকিউলিস। ঠিকইতো, মরিসন তাদের এক নূতন আশার আলোয়, আনন্দিত উন্মাদনায় নিয়ে চলেছে স্বর্ণগুহার দিকে। এই প্রায় দুমাসে স্বর্ণগুহা সত্যি কিনা এই নিয়ে কেউ প্রশ্ন করে নি। যত বিবাদ সবই যেন জলের মত সহজ হয়ে যাচ্ছে।

প্যাটারসনের কথায় সবার চোখই মাষ্টার মরিসনের দিকে। মরিসন কিন্তু তখন দূরবীণ চোখে দীপ্তভঙ্গীতে সুদূর নীল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। মরিসনের নীলায়ত গভীর টানাটানা চোখে নীল সমুদ্রের ছায়া। তন্ময়তায় নিবদ্ধ মরিসন।

—থাক্, থাক্, ও তোমাদের সঙ্গেই থাক। ও যা চায় তাই করুক। মরিসন আমাদের সৌভাগ্যবাহী অভিযাত্রী। ও খুশী থাকলেই এই অভিযাত্রীদলের মঙ্গল হবে। —পার্টনার প্যাটারসন বলে উঠে।

কথাটা শুনে স্মিত হাসি হাসে সেভেরিন। বলে,—ও. কে।

আরও তিনরাত পার হয়ে গেল। ট্রবজন পোর্টও পেরিয়ে এসেছে আর্গো। জোর হাতে দাঁড় টানছে মাষ্টার মরিসন ও তার সঙ্গী ওরসম্যানরা। আর্গো চলছে দুরন্ত গতিতে, প্রায় ছয়-সাত নট স্পীডে।

পড়ন্ত বিকেল। নীল সমুদ্রের বুকে অ্যালবেট্রস উড়ে যাচ্ছে। নীল আকাশের ছায়ায় সমুদ্রের তরঙ্গহীন স্তর মায়াময়, নীলাভ। আড়াই মাসের যাত্রাপথের শেষ প্রান্তে এসেছে অভিযাত্রীরা। সবারই চোখে খুশীর ঝলক।

শুধু চিন্তার মেঘ জমে থাকে ক্যাপ্টেন সেভেরিনের মুখে, সেকেণ্ড ক্যাপ্টেন হুইলার ভঙ্গীতে। সচকিত ব্রস্ততায় চারদিকে দূরবীণের কড়া নজরের পাহাড়া চালাচ্ছে ষ্ট্র্যাপিং মাষ্টার ডবস। রোইং মাষ্টার মার্ক ঘনঘন ওরসম্যানদের বদল করছে। আর্গোর গতি বিন্দুমাত্র মন্থর না হয় তার প্রচেষ্টা মার্কের চলাফেরায়। শুধু অস্থিরতা নেই, ভাবনা নেই মাষ্টার মরিসনের চোখেমুখে। যেন মরিসন জানে, যাই ঘটুক না কেন, আর্গো বা তার অভিযাত্রীদের বিন্দুমাত্র ক্ষতির ভয় নেই।

পার হোল হোপা বন্দর। তুরস্ক দেশ ছেড়ে এবার আর্গো ঢুকবে রাশিয়ায়। আর মাত্র দুদিনের পথ। জলযাত্রা বুঝি এবার সত্যিই শেষ হবে।

ডাক্তার হোলিস্ বলেন,—যাক্ ক্যাপ্টেন, মনে হচ্ছে ভালয় ভালয় পেঁছে গেলাম সোভিয়েত জর্জিয়ায়। ডাঙ্গায় থাকলে ভয় থাকে না, কি বলেন ? জলেই বিপদ। তার উপর পাল তোলা নৌকায়, শুধু হাওয়া আর জনা কয়েক ওরসম্যানের উপর ভরসা করে এতটা পথ আসা, কিছুটা পাগলামী বৈকি।

—তা ডাক্তার, এলেন কেন আমাদের সঙ্গে ? রুজি-রোজগার বন্ধ করে ভূতের বেগার খাটতে না এলেই পারতেন।—হেসে বলে ক্যাপ্টেন সেভেরিন।

—আরে ক্যাপ্টেন সাধে কি এসেছি। তিন হাজার বছর আগে কে না কে আর্গোনটিকার আজগুবি গল্প লিখেছে, সেই গল্পের পথ ধরে, কল্পনার স্বর্ণগুহায় চলছেন, খবরটা শুনে বড় মজা লাগল। তাইতো এসেছি, সবটাই কল্পনা, না, কল্পনাও সত্যি হয়ে যায়, তাই দেখতে।

—তা এখন কি মনে হচ্ছে ডাক্তার ? আর্গোনটিকার কাহিনী সবই কাল্পনিক ? সেই তিনহাজার বছরের নৌকা, সেই তিনহাজার বছর আগে আঁকা জলপথের নক্সা, সবই কি মিথ্যে ?

—না ক্যাপ্টেন, জলপথ ধরে সত্যিইতো ঠিক ঠিক জায়গায় এসেছি, হয়ত দু-একদিনের মধ্যে কোলচিসেও পেঁছাব। তাই সত্যি করে বলতে গেলে, মনে এখন দারুণ উত্তেজনা হচ্ছে। এতটাই যদি সত্যি হয়, স্বর্ণগুহাই বা সত্যি হবে না কেন ?

—ডাক্তার ! আপনিও তবে থ্রিলড হচ্ছেন ?—পার্টনার প্যাটারসন হেসে বলে।

—আমি কেন, আমার বিশ্বাস এই আর্গোর সব্বাইই এখন থ্রিলড। আচ্ছা ক্যাপ্টেন, স্বর্ণগুহা কি সত্যিই পাওয়া যাবে ?—ছেলেমানুষের মত উত্তেজিত কণ্ঠ ডাক্তার নিক হোলিসের।

হঠাৎ ভেসে আসে ষ্ট্র্যাপিং মাষ্টার পিটার ডবসের উত্তেজিত কন্ঠ,—ক্যাপ্টেন, দূরে আবার দেখা যাচ্ছে হলুদ স্পীড বোট। আমাদের দিকেই ছুটে আসছে।

বৈকালী সূর্যের স্বর্ণাভ ঝিকমিক আলোর খেলার মধ্যে দূরে সত্যিই দেখা গেল হলুদ রঙের স্পীড বোট। ফট-ফট-ফট শব্দে ছুটে আসছে আর্গোর দিকে, হুহু করে।

—স্টপ রোইং। দেখা যাক্ র‍্যাদারফোর্ড কি করতে চায় ? জল-অভিযানের শেষ মুহূর্তে কি বদমাইসি করবে ওরা বোঝা যাচ্ছে না।—বিড়বিড় করে বলে ক্যাপ্টেন সেভেরিন।

—স্যার, আপনি কোন কথা বলবেন না, যা বলার আমি বলব। আপনি নির্লিপ্তভাবে চুপ করে বসে থাকুন। র‍্যাদারফোর্ডকে তোয়াকাই করছেন না, এমন ভাব দেখান। দেখবেন ওতেই কাজ হবে।—মাষ্টার মরিসন উপদেশ দেয় ক্যাপ্টেন সেভেরিনকে।

—হ্যাঁরে মরিসন, মনে হচ্ছে তুইই ক্যাপ্টেন, এমন ভঙ্গীতে কথা বলছিস ? আর তোর কথা শুনছেও সেভেরিন সারা রাস্তায়, এই মজাটা দেখে আসছি, ব্যাপারটা কি ?—কিছুটা ধমক লাগায় মাষ্টার মরিসনকে, তার কাকা এরসিন।

—আহহা, ওকে কিছু বলবেন না এরসিন। মাষ্টার মরিসনই তো সৌভাগ্যবাহী আমাদের দেবদূত হারকিউলিস্। ওকে ওর মত কাজ করতে দিন।—পার্টনার প্যাটারসন এরসিনকে ঠাণ্ডা করে কথাগুলো বলে।
স্পীডবোড ইতিমধ্যে আর্গোর কাছাকাছি আসে। চারপাশে কয়েকবার চক্কর দেয়, তারপর আবার ফট-ফট শব্দ করে ফিরে যায়। যাবার সময় শুধু ভেসে আসে র‍্যাদারফোর্ডের ব্যাঙ্গঝরা হাসি আর কর্কশ কণ্ঠস্বর—সেভেরিন, জানিয়ে গেলাম আমরা আছি। ঠিক সময় ঠিক জায়গায় দেখা হবে। স্বর্ণগুহার দখল আমরাই নেব, মনে রেখ। হাঃ, হাঃ, হাঃ—চলে যায় স্পীডবোট।
স্পীডবোট চলে যেতেই উঠে দাঁড়ায় ক্যাপ্টেন সেভেরিন। অবাক গলায় বলল,—কি ব্যপার! ওভাবে হঠাৎ এলই বা কেন, চলে, গেলই বা কেন? ওরা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে সেটা জানাতেই কি শুধু এসেছিল?
—তাছাড়া আর কি।—বলে প্যাটারসন।
—না ক্যাপ্টেন, ওরা দেখতে এসেছিল ওদের দেখে আমরা কতটা ভয় পাই। আপনাকে নির্লিপ্তভাবে বসে থাকতে দেখে আর আমাকে দাঁড়াতে দেখেই ওরা চলে যায়। কেন জানি, আমাকে পছন্দ নয় র‍্যাদারফোর্ডের।—হাসতে হাসতে বলে মাষ্টার মরিসন।
—ক্যাপ্টেন আমার টেলিসকোপিক লেন্সে স্পীডবোটের লোকজনদের ছবি তুলে নিয়েছি। বিশেষ করে র‍্যাদারফোর্ডের।—ফটোগ্রাফার এগান জানায় ক্যাপ্টেন সেভেরিনকে।
—আমার লেন্সে অন্য ব্যপার ধরা পড়েছে ক্যাপ্টেন। স্পীডবোট রুমের ভিতরের ছবি তুললাম। দেখলাম বেশ কিছু আর্মস আছে ওদের। তাছাড়া কোদাল, গাইতি, ব্লাষ্টিং মেটিরিয়লসও রেখেছে স্পীডবোটের মধ্যে। —খবরটা জানায় অন্য ফটোগ্রাফার শিঠ মর্টিমার।
—বাঃ। র‍্যাদারফোর্ড ধরেই নিয়েছে, স্বর্ণগুহা পাচ্ছেই। আর পেলে কি করে সোনা খোঁদাই করে আনবে তার ব্যবস্থাও রেখেছে। —পিটার হুইলার রেগে বলে।
—দাঁড়াও, পাওয়াচ্ছি স্বর্ণগুহা। ক্যাপ্টেন, সত্যিই যদি স্বর্ণগুহা পাই, তবে শেষ রক্তবিন্দু থাকতে সেই গুহা থেকে এক কণাও সোনা র‍্যাদারফোর্ডদের নিতে দেবনা।
—আহ্‌হ হুইলার, উত্তেজিত হোয়ো না। এখনও সোরে পৌছাই নি। মনে রেখো, ডাঙ্গায় না পৌছানো পর্যন্ত সমুদ্রপথের বিপদ যায় না। শেষমুহূর্তেও বহুভরাডুবি হয়, তা কি দেখনি। —ক্যাপ্টেন সাবধান করে হুইলাকে।
—স্যরি ক্যাপ্টেন। এভাবে উত্তেজিত হওয়া সত্যিই ঠিক হয় নি।—সলজ্জিত কণ্ঠ হুইলারের।
দাঁড় টানা ছেড়ে ইতিমধ্যে মরিসন আর স্ট্রাপিং মাষ্টার ডবস আর্গোর এককোনে গিয়ে ফিস ফিস করে কি যেন আলোচনা করতে থাকে। ব্যপারটা নজর এড়ায় না সেভেরিনের। —অ্যানি প্রবলেম?—প্রশ্ন করে ক্যাপ্টেন।

—নো স্যার। এ স্রেফ আমাদের ব্যক্তিগত কথা। —ডবসকে কিছু বলতে না দিয়ে চট করে বলে মাষ্টার মরিসন।

মরিসনের চোখে চোখ রাখে ক্যাপ্টেন। বুঝতে পারে কিছু যেন গোপন করতে চাইছে মরিসন আর ডবস। মরিসনও বুঝতে পারে কথাটা বিশ্বাস করল না ক্যাপ্টেন। তাই মিষ্টি হেসে বলে,—স্যার আমি বেইমান বা বিশ্বাসঘাতক নই। আর্গো বা আপনার ক্ষতিকারক কোন কাজই আমি করব না, বিশ্বাস করতে পরেন।

—আই নো মাই বয়। তোমাকে আমরা কেউ অবিশ্বাস করি না। কিন্তু তুমি যেমন ডেয়ারিং ছেলে, কখন যে কি কর তার বিশ্বাস নেই। আমাদের জন্য লাইফ রিস্ক করে যেন কিছু কোর না, এইটুকুই বলতে চাই। —স্নেহের আভাস ক্যাপ্টেনের প্রতিটি কথায় ফুটে উঠে।

—স্যার, আপনি যে আমায় স্নেহ করেন তা আমি জানি। আমি জানি, প্যাটারসন থেকে আরম্ভ করে এই আর্গো নৌকার সবাই আমাকে ভালবাসে। এমন ভালবাসার বদলে দরকার হলে কিছুতো প্রতিদান দিতেই হবে স্যার।

—মাষ্টার, তোমার মত ছেলেও এতটা সেণ্টিমেণ্টল ?—কথাটা বলে হেসে ফেলে ক্যাপ্টেন।—মনে রেখো, এই আর্গোর একজন সহযাত্রীকেও আমি হারাতে চাই না। আমরা স্বর্ণলোভী নই, আমরা অ্যাডভেঞ্চারিষ্ট। সোনা পেলাম ভাল, না পেলে খালি হাতেই ফিরব। তার জন্য জীবন মরণ চেষ্টা চালাব কেন? —ক্যাপ্টেন বোঝায় মরিসনকে।

—না স্যার, আপনার সঙ্গে একমত হোতে পারছি না। স্বর্ণগুহা সত্যিই আছে কিনা, না জেনে ফেরা মানেই অভিযান শেষ না করা। তাই শেষটুকু পর্যন্ত না দেখে আমরা ফিরতে চাই নে স্যার ?

—মরিসন! তুমিও তবে স্বর্ণগুহার জন্য লালায়িত! ছিঃ! স্বর্ণগুহা পেলাম কি না পেলাম তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। —ক্যাপ্টেন সেভেরিনের গলায় কিছুটা ধিককার ফুটে উঠে।

—আমি লালায়িত নই স্যার। কিন্তু সবটুকু না দেখে ফিরে যাওয়া মানে র‍্যাদাফোর্ডের মত লোকদের স্বর্ণগুহায় দরজা দেখিয়ে চলে যাওয়া, এটা বুঝছেন না কেন স্যার। আমরা স্বর্ণগুহা শুধু আবিস্কার করতে চাই, তার মালিক হবার ইচ্ছে তো নেই আমাদের। —বেশ সতেজ গলা মরিসনের।

—ঠিকই তো, ঠিক কথাই বলেছ মাষ্টার মরিসন।—পার্টনার প্যাটারসন ওদের পিছনে এসে বলে—স্বর্ণগুহা আছে কি নেই, না জেনে ফেরা ঠিক হবে না সেভেরিন।

—ওঃ, এসে গেছ তুমি? তাহলে তো মরিসনকে আর কিছু বলাই যাবে না। মরিসন তো তোমার কাছে দেবদূত হারকিউলিস। —হেসে বলে ক্যাপ্টেন সেভেরিন।

—ঠিকই তো। মরিসনই আমাদের দেবদূত হারকিউলিস। কেউ ওর কিছু ক্ষতি করতে পারে না, পারবে না, দেখে নিও। —প্যাটারসন জোর গলায় বলে।

কথাটা শুনে, লজ্জা পায় মরিসন, বলে—স্যার এবার রোইং-এ যাচ্ছি।—সলজ্জ মুখে চলে যায় মরিসন আর্গোর দাঁড় ধরার জন্য।

আর্গো চলেছে। আর্গোর চিত্রিত পাল হাওয়ায় উড়ছে পতপত করে। দাঁড়িরা জলযাত্রার শেষমুহূর্তে এসেছে। তাই একসঙ্গে দাঁড় টানতে টানতে সুর করে গাইছে ওরসম্যান—

চলুক আর্গো—হেঁইয়ো।
নীল সমুদ্রে—হেঁইয়ো।
সোনার দেশ, কোলচিস—হেঁইয়ো।
পাবই পাব, আমরাই—হেঁইয়ো।
চলুক আর্গো—হেঁইয়ো।
তূফান বেগে—হেঁইয়ো।

ক্যাপ্টেন খুশী চোখে তাকিয়ে থাকে ওরসম্যানদের দিকে। সূর্যাস্তের আলোর শেষ রক্তিমাভাও ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে নীল সমুদ্রের বুক থেকে। ক্লান্ত, শ্রান্ত অভিযাত্রীদের চোখের ভাষায় তীরের সীমানায় পৌছাবার আকুলতা।

—ফ্রেণ্ডস, হয়ত কালই পৌছাব জলযাত্রার শেষ প্রান্তে, অভিযানের শেষ বন্দর পোটিতে। প্রায় আড়াই মাস একনাগারে নৌচালনার পরে আমরা পৌছাব জর্জিয়ার ভূখণ্ডে অর্থাৎ তিনহাজার পূর্বের কল্পিত শহর কোলচিসে। আমাদের অভিযানের প্রথম পর্ব সেখানেই শেষ হবে। তারপর শুরু হবে স্বর্ণগুহা আবিস্কারের অভিযান। আমরা খুশী, শত অসুবিধে সত্বেও আমরা, সমস্ত অভিযাত্রীরাই, নিরাপদে পৌছাচ্ছি ভূপ্রান্তে। এই জন্য তোমাদের সকলের একান্ত সহযোগীতার জন্য ধন্যবাদ। আজ আর্গোর চলা বন্ধ হোক এখানে। আজ বিশ্রাম কর এইখানে, সমুদ্র বুকেই। কাল দু-তিন ঘণ্টা নৌ-চালনার পরই আমরা পৌছাব পোটিতে। বি রিল্যাক্সড।

—থ্যাঙ্ক ইউ ক্যাপ্টেন। —অভিযাত্রীদের হর্ষধ্বনিতে নৌবক্ষ গুঞ্জরিত হয়ে উঠে। ওরসম্যানরা পাটাতনের উপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে।

রাত ক্রমেই গভীর হতে থাকে। মেঘমুক্ত নীল আকাশ ছেয়ে গেছে সহস্র কোটি তারার মালায়। সমুদ্রের হীমেল হাওয়ার স্পর্শে ক্লান্ত ওরসম্যানরা গভীর ঘুম আচ্ছন্ন। নিদ্রিত অন্য অভিযাত্রীরা।

এই সময়ে নিঃশব্দে দাঁড় বেয়ে আর্গোর গায়ে এসে ভিড়ল ছোট্ট দাঁড়টানা বাইচ নৌকো। শব্দহীন পদে কয়েকজন মানুষ নামল ছোট্ট বাইচ নৌকা থেকে আর্গোর বুকে। সামান্য শব্দ। তারপর কি যেন নিয়ে আবার ফিরে গেল মূর্তিরা বাইচ

নৌকায়। বাইচ নৌকা ছপ-ছপ স্বল্প শব্দে দ্রুত মিলিয়ে গেল দূরে। তারপর নৌকার শব্দ থেমে গেল। একটু পরেই ফট্-ফট করে স্পীড বোট ছাড়ার শব্দ জেগে উঠল। রাতের নিস্তব্ধতায় সমস্ত ঘটনাটি ঘটে গেল মিনিট কয়েকের মধ্যে, ঠিক ছায়া ছবির মত।

নিদ্রিত অভিযাত্রীরা আর্গোর বুকে কি ঘটে গেল কিছুই জানল না কেউ। সবাই ঘুমে অচেতন। শুধুমাত্র একজন ঘুমহীন চোখে সমস্ত ঘটনাটা লক্ষ্য করল বিস্ফারিত চোখে।

স্পীড বোটের শব্দ মিলিয়ে যেতেই জাগরিত মূর্তিটি আর্গোর পাটাতনের উপর উঠে বসে। আস্তে আস্তে আসে সেকেন্ড ক্যাপ্টেন হুইলারের কাছে। ফিস-ফিস করে হুইলিরকে ডাকে—হুইলার, জাগুন। তাড়াতাড়ি উঠুন মিষ্টার হুইলার।

—কে! ওঃ, মরিসন। কি ব্যপার?

—ডবস আর মার্কের কাছে চলুন। দারুণ বিপদ ঘটে গেছে। সময় নষ্ট করার নেই।

—কি বলছ মরিসন! তোমার কথা তো কিছুই বুঝতে পারছি না! —বিস্মিত গলা হুইলালেরর।

—চলুন মার্কের কাছে। এখন কথা বলার সময় কম। —মার্ক আর ডবসকে ঘুম থেকে উঠায় মরিসন।

—কি ব্যপার! মাঝরাতে কি হোল? কি বলতে চাইছ মরিসন? —অবাক গলা মার্ক আর ডবসের।

—একটু আগেই নৌকো করে এসেছিল র‍্যাদারফোর্ড, লিনিয়স, মোরয়ান আর পাঁচজন লোক। এসে ক্যাপ্টেন সেভেরিনকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। —ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে মরিসন।

—সে কি! —চমকে উঠে হুইলার।

—অসম্ভব! —বিস্মিত গলা ডবসের।

—তুমি কি স্বপ্ন দেখেছ মরিসন! —অবাক স্বরে বলে মার্ক।

—দেখুন, এই দীর্ঘ আড়াই মাস কোন রাতেই আমি ঘুমতাম না। চুপকরে শুয়ে দেখতাম সব ঠিক আছে কিনা। তাই আজও সেভাবেই সব দেখেছি। যা বলছি সব সত্যি।

—কিন্তু ক্যাপ্টেন বাধা দিতে পারলেন না? চিৎকার করেওতো ডাকতে পারতেন? —প্রশ্ন করে মার্ক।

—হঠাৎ ওভাবে এসে ঘুমন্ত ক্যাপ্টেনকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে নিয়ে যেতে কোনও অসুবিধে হয় নি ওদের। —উত্তর দেয় মরিসন।

—তুমিওতো চিৎকার করতে পারতে মরিসন। তাহলে তো আমরাও উঠে পড়ে বাধা দিতে পারতাম। —কিছুটা ক্ষুব্ধ গলা হুইলারের।

—না, পারতাম না, মিষ্টার হুইলার। ওদের হাতে ছিল স্টেনগান। বাধা দিলে প্রথমে ক্যাপ্টেনকে মারত, তারপর আমাদের বহু লোক মারা যেত। তাই চুপ করে থাকতেই হোল আমাকে।

—তাইতো মরিসন কি করবে এখন ?

—হুইলার, এখন আমাদের আর্গোকে আপনি লিড করুন। আমি নিশ্চিত, পোটির কাছাকাছি কোথায় ওরা আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, ভোর হবার আগে অন্ধকারে ওরা কোথায় পোটি ছেড়ে যাবে না, যেতে পারে না। —নিশ্চিন্ত গলা মরিসনের।

—তাহলে এখন কি করব আমরা ? —প্রশ্ন হুইলারের।

—আমরা এই জ্যোৎস্নারাতেই নৌকা ষ্টার্ট করব। আমাদের দ্রুত হাতে হাল বাইতে হবে যাতে ভোর হবার আগেই পোটিতে পেঁছাতে পারি। এভাবে যে আমরা পোটিতে পেঁছাবো তা র‍্যাদারফোর্ড কল্পনাও করতে পারবে না।

—তারপর মরিসন ? পোটিতে পেঁছিয়ে—

—তারপর কি হবে আমি জানি না মিষ্টার হুইলার। তবে তখন ওদের মোকাবিলা করার সুযোগ থাকবে। আর দেরী করলে ক্যাপ্টেনেরও বিপদ, আর স্বর্ণগুহার অন্বেষণও কল্পনাই হয়েই থাকবে। —ঘটনার গুরুত্ব বোঝায় মাষ্টার মরিসন।

—ও.কে.। আমরা এখুনি রওনা হব। —দ্রুত বলে হুইলার।—মার্ক, তোমার ওরসম্যানদের জাগাও। লেট আস ষ্টার্ট ইমিডিয়েটলি। এখুনি আমাদের আর্গো ছাড়তে হবে।

মুহূর্তে আর্গোর অভিযাত্রীদের জাগিয়ে তোলে মার্ক আর ডবস। ঘটনার গুরুত্ব জানায়। পলকের মধ্যে ওরসম্যানরা যে যার জায়গায় বসে পড়ে। মরিসন বলে,—মার্ক, আপনি আর আমি দুদিকে লীড করি ওরসম্যানদের। ভোর হতে দুঘণ্টা মত বাকী। এরমধ্যে পেঁছাতেই হবে পোটি। ওদের নজরে প্রথমেই আমাদের দিকে না পড়া ভাল। তাই আঁধারের মধ্যে পোটিতে না পেঁছালে সব হাতের বাইরে চলে যাবে।

মধ্যরাতে, জ্যোৎস্না—প্লাবিত সমুদ্রের আবছা আলোয় যাত্রাশুরু করে আর্গো। আর্গোর প্রতিটি মানুষের মনে ভীত শংকা, ক্যাপ্টেন সেভেরিন তো বেঁচে আছেন ? র‍্যাদারফোর্ডরা তো মেরে ফেলেনি ক্যাপ্টেনকে ?

আর্গোর ডেকে, একপ্রান্তে চুপ করে গালে হাত দিয়ে চিন্তিত মুখে বসে প্যাটারসন। ডবস কাছে এসে বসে। বলে,—আপনি ভয় পাবেন না প্যাটারসন।

—এঁ্যা! ভয়! না, না, ভয় নয়। সোনা থাকলেই যে বিপদ থাকবে আগে বোঝা উচিত ছিল। এই অভিযানে না এলেই ভাল ছিল। গড নোস্, কেমন আছে সেভেরিন।

ওহ! ওরকম ডেয়ারিং মানুষটাকে ওরা উঠিয়ে নিয়ে গেল? —কেমন ফ্যাকাশে মুখ প্যাটারসনের।
—সব ঠিক হয়ে যাবে প্যাটারসন। —আশ্বস্ত করতে চায় ডবস।
—আর ঠিক হবে? মনে হচ্ছে ডাঙ্গায় পেঁছালে আরও বিপদ ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের মাথায়। মাই গড! কি যে করি এখন?

নৌকা চালাতে চালাতে এক ফাঁকে মাষ্টার মরিসন ফিস্‌ফিস্‌ করে জিজ্ঞেস করে,—মিষ্টার হুইলার, স্বর্ণগুহায় যাবার রুট ম্যাপের কপি আপনার কাছে আছে?
—রুট ম্যাপ! নাঃ। সেরকম ম্যাপতো আমাদের নেই। —অবাক গলায় বলে হুইলার।
—বাঃ, ক্যাপ্টেনের কাছে তো রুটম্যাপ ছিল। —এবার বিস্ময় মাষ্টার মরিসনের গলায়।
—নাঃ, নাঃ, সেটা রুট ম্যাপ নয়। সেই তিন হাজার বছর পুরোনো আর্গোনটিকার গল্পে একটা পথের কথা ছিল। সেটার কথাই হয় তো বলেছে ক্যাপ্টেন।
—ওঃ, তাই নাকি! —কেমন যেন হতাশ হয়ে যায় মাষ্টার মরিসন। একটু ভাবে, তারপর বলে,—আর্গোনটিকা গল্পের পথটা আপনি জানেন, মিষ্টার হুইলার?
—আর্গোনাটিকা গল্পে স্বর্ণগুহার পথে যেতে গেলে যে বিবরণটা পড়েছি, তা বলতে পারি। যেমন সেই প্রাচীন গল্পে আছে, ব্ল্যাক-সি-র শেষ প্রান্তে পাওয়া গেল ফেসিসের মোহনা। এই মোহনার বাঁদিকেই রয়েছে মাথা উঁচু করে ককেশাসের সুউচ্চ পর্বতমালা। পর্বতমালার পাদদেশেই দেখা গেল শহর এইই। আর ফেসিসের ডানদিকে এরিসের সমতল ভূমি। এই সমতল ভূমির গা ঘেঁষে উঠে গেছে পাহাড়। সেই পাহাড়েই পাওয়া গেল দেবতাদের গোপন ধনভাণ্ডারময় স্বর্ণগুহা।
—তারমানে ফেসিসের বাঁদিকে ককেশাস পর্বত আর ডানদিকের শহরের লাগোয়া পর্বতে আছে স্বর্ণগুহা? সেকথাই বলেছে আর্গোনটিকায়?—কথাটা ভালো করে বুঝতে চায় মরিসন।
—হ্যাঁ। ঠিক বলেছ। ফেসিসের মোহনার এসে মিলেছে রাইনো নদী। পোটির পরেই রাইনো নদী। তাই পোটি আর রাইনোর মধ্যে ককেশাসকে বাঁদিকে রেখে, ডানদিকে গেলে স্বর্ণগুহা পাবার কথা। তবে এসব সেই তিন হাজার বছরের কল্পকাহিনী আর্গোনটিকার মতে। আসলে এটা আজ সত্যি হবে কিনা জানি না।
—আচ্ছা হুইলার, স্বর্ণগুহায় যে এভাবে যেতে হয় এই কথাটা আমাদের দলের আর কি কেউ জানে?
—হ্যাঁ মাষ্টার। প্যাটারসন জানেন। তিনিই সেজন্য এনেছেন জিওলজিষ্ট ডবসকে। উনি, ক্যাপ্টেন আর আমি ছাড়া আর কেউ জানত না।

—থ্যাঙ্ক ইউ মিষ্টার হুইলার। মনে হচ্ছে ক্যাপ্টেনকে খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না। পোর্টিতে র‍্যাদারফোর্ডদের না পেলেও কোন্‌দিকে গেলে ওদের পাব এখন বুঝতে পারছি।
—তার মানে,—
—ভয় নেই স্যার। সব ঠিক হয়ে যাবে! এখন একটাই কাজ পোর্টিতে পেঁছান।
—দ্রুত হাতে রোইং করতে করতে কথাগুলো বলে মরিসন।
মার্ক অন্যধার থেকে বলে উঠে,—মরিসন, তোমার ষ্ট্রোকিং হার্ড কর। স্লো হচ্ছে যে।
—স্যরি মার্ক, একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলাম।—জোর হাতে দাঁড় টানতে থাকে এবার মরিসন। চেঁচাতে থাকে, কিক্—হার্ড, কিক্-হার্ড।—তরতর করে ছুটে চলে আর্গো।
ক্রমেই ক্ষীণ আলোর ক্ষণিক আভাস ফুটে উঠে আকাশে। প্রত্যুষের পদধ্বনি যেন। মার্ক বলে উঠে,—মরিসন, ভোর যে হয়ে এল।

ডবস দূরবীণ চোখে বসে থাকতে থাকতে চেঁচিয়ে উঠে,—ঐ, ঐ যে দেখা যাচ্ছে পোর্টি বন্দর! আরে! ঐ যে হল্‌দে রঙের স্পীড বোট!

—আহা! তবে ঠিকই জায়গায় এসেছি।—এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস পার্টনার প্যাটারসনের গলায়।

উৎসরিত আনন্দের মাঝে কখন যে ধীরে ধীরে আকাশে ছেয়ে গেছে মেঘ, শুরু হয়েছে একটু একটু সমুদ্রের তুফান, খেয়ালই হয় নি কারুর। কিন্তু যখন খেয়াল হোল, সমুদ্র তখন উত্তাল। উত্তলিত ঢেউ-এ বারবার আছড়ে পড়ছে আর্গো সমুদ্রের জলে। রোইং মাষ্টার মার্ক বারবার চেঁচাচ্ছে।—কড়া হাতে দাঁড় ধরে টানতে থাক, থেমোনা। পাল খুলে দাও ডবস। হাওয়া যেদিকে আর্গোকে নিয়ে যায়, যেতে দাও।

—ওঃ। চারদিক যেন ছেয়ে ফেল্ল শত্রুতে। ঘণ্টাখানেক আগে এলো বদমাইস র‍্যাদরফোর্ডের দল। এবার প্রকৃতি চালাল বিষের ছোবল। আঃ, সবশেষ হয়ে গেল এবার!—পার্টনার প্যাটারসন ভেঙ্গে পড়েন দুর্যোগে।

মার্ক আর মরিসন কিন্তু দাঁত চেপে টেনে চলেছে দাঁড়। তারই সাথে অন্য বারোজন দাঁড়িও আপ্রাণভাবে দাঁড় টানছে। আর্গো কোথায় যাচ্ছে বোঝবার উপায় নেই। সামুদ্রিক ঝড়ের তাণ্ডব তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে।

ঝড় হঠাৎ যেন যাবার বেলায় কেঁপে উঠল দুরন্তভাবে। সেই দাপটে ছিটকে ফেল্ল আর্গোকে। আর্গো ছিটকে এসে পড়ল তীরে। আর্গোর অভিযাত্রীরা কেউ ছিটকে পড়ল পাটাতনে, কেউবা সমুদ্রের জলে, কেউবা তীরে। সাময়িকভাবে সবাই কেমন যেন মূর্চ্ছিতপ্রায় হয়ে গেল।

কিছু পড়ে ঝড় থামল। শান্ত হোল ব্ল্যাক-সি। আকাশে সূর্য্য উঠার রক্তিমাভা।

সমুদ্রের জলে খেলা করছে শান্ত রক্তমালা। আর্গোকে জলে ঠেলে নিয়ে এল আর্গোর অভিযাত্রীরা। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসল নৌকায়।

পিটার হুইলার বল্ল—মার্ক, ছাড় নৌকা। ডবস, দেখো তো, পোর্ট পোটি কতদূরে?

প্যাটারসন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল,—আরে! কোথায় মরিসন? কোথায় ডবস? কোথায় গেল ওরা?

—অ্যা! তাইতো! ওরা দুজন কৈ?

ডাক্তার হোলস্ পাশ থেকে বলে উঠল,—হুইলার, আমার যেন মনে হচ্ছে, ওদের দুজনকে জলে পড়তে দেখেছি।

—তাই নাকি! কিন্তু জলেতো ওদের দেখা যাচ্ছে না? তাহলে?—কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যায় প্যাটারসন।

হুইলার কি যেন চিন্তা করে। তারপর বলে,—এভাবে এখানে চিন্তা করলে কিচ্ছু হবে না। পোর্টি-পোর্টের দিকে যাই। যা হয়, ওখানে পেঁছালেই হবে।

—কিন্তু মরিসন, ডবসকে না নিয়ে যাওয়া কি ঠিক হচ্ছে হুইলার? প্রথমে সেভেরিন, তারপর মরিসন, ডবস, তিন-তিনজন দল থেকে হারিয়ে গেল? এমনটি এর আগের কোনও অভিযানে হয় নি।—প্যাটারসনের ভেঙ্গে পড়ার অবস্থা।

—আপনি হতাশ হবেন না, ভেঙ্গে পড়বেন না। একটা কথা বলি, মরিসন একদিন বলেছিল, কখনও যদি ওকে আর ডবসকে একসঙ্গে পাওয়া না যায় বুঝতে হবে, ওরা ইচ্ছে করেই কোথাও গেছে। চিন্তা করার দরকার নেই। তাই,—

—কিন্তু ওরা যে সমুদ্রের জলে ছিটকে পড়ে হারিয়ে গেল হুইলার? ওরা জলে যে ডুবে যায় নি কে বলছে?—প্যাটারসন মানতে চায় না হুইলারের কথা।

—ওরা ডোবে নি, এটা আমি বলতে পারি। মরিসন দারুণ সুইমার।—মরিসনের কাকা এরসিন এই প্রথম কথা বলে।

—প্যাটারসন, আপনি মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন। সামনে তাকান। একশ মিটার দূরে কি দেখতে পাচ্ছেন, হলদে স্পীড বোট। ওটা র‍্যাদারফোর্ডের স্পীড বোট নয়?

—অ্যাঁ, তাইতো!—চমকে উঠে প্যাটারসন।

—তাহলে ওটাই পোর্ট পোটি। ওখানেই তো আমাদের পেঁছাবার কথা।—ডাক্তার হোলিস চঞ্চল হয়ে উঠেন।

—হ্যাঁ, ওটাই পোটি। তাই এই একশ মিটার যে সাঁতরে ওরা চলে যায় নি, তাইবা কে বলছে। হয়ত আমাদের সঙ্গে একসাথে মরিসনরা পোটিতে নামতে চায়নি, র‍্যাদারফোর্ডকে ধোঁকা দেবার জন্য। এটা ভাবা কি অসম্ভব?—সেকেণ্ড ক্যাপ্টেন হুইলারের কথার যৌতিকতায় চুপ করে যায় প্যাটারসন।

আর্গো চলতে শুরু করে মরিসন আর ডবসতে না নিয়েই। আর্গোর অভিযাত্রীদের মুখে কথা নেই। হুইলারের কথায় কেউ প্রতিবাদ না করলেও মরিসন আর ডবসকে

ফেলে এভাবে যাওয়ার ব্যাপারে সবাই যে বিহ্বল হয়ে গেছে, সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। তবু সব অস্বস্তির মধ্যেও সোনালী ভোরের আলোয় আর্গোকে দাঁড় টেনে নিয়ে চলে ওরসম্যানরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই আর্গো এসে পড়ে পোর্ট পোটিতে। প্রভাতী সূর্যের আলোর ছটায় পোটি বন্দর তখন উজ্জ্বল, কর্মচঞ্চল। কিন্তু দুশ্চিন্তার কালোছায়া আর্গোর প্রতি অভিযাত্রীর মনে।

মাষ্টার মরিসন আর জিওলজিষ্ট ডবস আর্গো থেকে ছিটকে পড়ল সমুদ্রে। উত্থাল সমুদ্রের ঢেউএর দোলায় ধাক্কা খেতে খেতে অল্প সময়েই দুজনে তীরভূমিতে এসে ছিটকে পড়ল।

বিমূঢ় দুজনে একটু পরে সুস্থির হয়। ডবস চারদিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—মরিসন, এ কোথায় এসে পৌঁছালাম? আর্গো থেকে তবে কি হারিয়ে গেলাম আমরা?

মাষ্টার মরিসন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। সামনে এগিয়ে যায় সমুদ্রের দিকে। খুঁজতে চেষ্টা করে কোথায় গেল তাদের নৌকা আর্গো। বুঝতে চেষ্টা করে কোথায় ছিটকে এলো তারা। সমুদ্রের জলের দিকে এপাশ ওপাশ তাকাতেই চমকে উঠে মাষ্টার মরিসন। আরে! ঐ তো হলদে রঙের স্পীড বোটটা। তারমানে এটাই পোটি বন্দর। এখানেই তবে ক্যাপ্টেন সেভেরিনকে ধরে নিয়ে এসেছে বদমাইস র‍্যাদারফোর্ডরা? চিৎকার করে উঠে মাষ্টার মরিসন—ডবস, কুইক। দেখ না, কি ব্যাপার।

ডবস ছুটে আসে মরিসনের কাছে। ব্যাপারটা দেখে ডবসও চমকে উঠে। বলে,—তাহলে কি করব এখন?

মরিসন একটু চিন্তা করে। তারপর বলে—চল ডবস, হলদে স্পীড বোটের কাছে ঘুরে আসি। দেখে আসি ওখানে কেউ আছে কিনা?

—না, না মরিসন। ওখানে গেলে ওদের হাতে ধরা পড়ে যাব। তাহলে কি আমাদের নিস্তার আছে?

—ডবস, চলই না কাছাকাছি। অবস্থা বুঝে কাজ হবে।—মরিসনের জেদাজেদিতে দুজনে একটু একটু করে এগিয়ে যায় হলদে স্পীড বোটের কাছে। কাছাকাছি এসে দেখে, নাঃ, কেউ নেই স্পীড বোটে।—ওঃ, ভোর হোতেই ওরা তবে রওনা হয়েছে স্বর্ণ গুহার দিকে।

—তাহলে কি করবে মরিসন? অপেক্ষা করবে, যদি আর্গো আসে এখানে তারই জন্য, না, স্বর্ণগুহার দিকে এগুবে!—প্রশ্ন করে চিন্তিত মুখে ডবস।

—তাইতো, কি করা উচিত? আমরা যে নিরাপদে এখানে এসেছি এটাতো হুইলারদের জানানো দরকার। না জানিয়ে গেলে ওরা ভীষণ দুশ্চিন্তায় থাকবে। আর চুপ করে

এখানে বসেই যদি থাকি, তবে, ক্যাপ্টেন সেভেরিনকেও উদ্ধার করা যাবে না। স্বর্ণগুহার অন্বেষণেও যাওয়া যাবে না। তাইতো—মাথা নীচু করে ভাবে মাষ্টার মরিসন।

ডবসও দুশ্চিন্তায় থাকে। সত্যিইতো, এখন কি করবে তারা ? দোটানায় পড়েছে দুজনে। হঠাৎ মাষ্টার মরিসন বলে উঠে—ডবস, আমাদের আর্গোর অভিযাত্রীদের ছয় ইঞ্চি সাইজের মেটালিক মেমেণ্টো, ব্যাজ আছে না ? স্পীড বোটের গায়ে বাইরের দিকে ওটাকে ঝুলিয়ে রেখে যাই। তাহলে, আর্গোর কারুর না কারুর চোখে পড়বে। তাহলেই বুঝবে আমরা পোটিতে পৌঁছেছি।

—বুদ্ধিটা মন্দ নয়। তারপর মরিসন ?

—এরপর প্রথমে এগুবো সামনে, ব্ল্যাক-সির শেষপ্রান্তে, ফেসিসের মোহনায়। জায়গাটা হওয়া উচিত খুবই কাছে। ওরই বাঁদিকে পাব ককেশাস পর্বতমালা। ওখান থেকেই যাব স্বর্ণগুহার দিকে।

—বেশ, চলো মরিসন। সূর্যের তেজ এখন কম। সমুদ্রের পাড় ধরে এগুনো যাক। তাহলে চট্ করে রাইনো নদীর মোহনায়, ফেসিসে পৌঁছান যাবে। কি বল মাষ্টার ?

—হ্যাঁ। চল ডবস। ভালকথা, তোমার কম্পাস, জিওলজিষ্টের ছোট্ট হাতুড়ে, ছোট্ট অটো রিভলভার, কার্তুজ, সেসবতো সঙ্গে আছে ?

—আছে, সব আছে। কোমড়ের ও বুকের বেল্টে এসব সবসময়ই বেঁধে রাখতাম, এখনও আছে। তুমিও তো তৈরী মরিসন ?

—হ্যাঁ ডবস। আমার আছে দারুণ অস্ত্র। দেখা যায় না। সময়কালে অস্ত্র বেরোয়। দরকার হলে দেখবে। —হেসে বলে মাষ্টার মরিসন।

—সেটা কেমন অস্ত্র ? আলট্রাসনিক কিছু ? লেসার কণ্ট্রোলড্ যন্ত্র ? —অবাক গলায় বলে ডবস।

—দেখবে ভাই, সবই দেখবে। বরং দাঁড়িয়ে শুধু শুধু কথা না বলে ফেসিসের মোহনার দিকে এগুনো যাক্। —মরিসন আর ডবস এগিয়ে চলে রাইনো নদীর দিকে, ফেসিসের মোহনার উদ্দেশে।

ঘণ্টা দেড়েক চলার পরই সামনে ভেসে উঠে ককেশাস পর্বতমালা। স্বল্প পরেই ফেসিসের মোহনা। মোহনা ছেড়ে একটু এগুতেই ককেশাসের পর্বতমালার পাদদেশে পৌঁছাল মরিসন ও ডবস।

—এই এলাম তবে ককেশাসের নীচে। এখানেই ধারে কাছে যে শহর ছিল, গ্রীক মহাকাব্যে তাকেই বলা হয়েছিল এইই শহর। নাঃ মরিসন ?

—হ্যাঁ, এটাই ধ্বংসপ্রাপ্ত এইই শহরের প্রান্তদেশ। —ডবস স্থির চোখে ককেশাস পর্বতমালার পাদদেশে ঝিরঝির বয়ে যাওয়া নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে। বালু আর

কাঁকরকুচির বুক দিয়ে বয়ে চলেছে ককেশাস থেকে নেমে আসা পাহাড়ী নদী। জিওলজিষ্ট ডবসের চোখ হঠাৎ উজ্বল হয়ে উঠে। দ্রুত নেমে আসে পাহাড়ী নদীর বালুস্তরের উপর। পিঠের হ্যাভারস্যাক থেকে পাতলা সীপস্কীনটা বার করে। বিছিয়ে দেয় ককেশাসের পাদদেশের ঝিরঝির নদীর বালুস্তরের উনর।

—কি ব্যাপার ডবস! হঠাৎ একি করছ? —অবাক চোখে ডবসের কাজকারবার দেখতে দেখতে বলে মাষ্টার মরিসন।

কথার জবাব না দিয়ে নদীর জলস্তরের দিকে তাকিয়ে থাকে ডবস। চোখের তারায় দারুণ উত্তেজনা। ধীরে ধীরে পাহাড়ী নদীর বুকে বিছানো ভেড়ার চামড়ার পাতলা আস্তরণ ঝিক্‌মিক্‌ করে উঠতে থাকে।



ককেশাসের পাদদেশে, ঝিরঝিরে পাহাড়ী নদীতে বিছানো সীপস্কীনের উপর জমে থাকা সোনার গুড়ো তুলছে ডবস।

—ডবস্, ভেড়ার চামড়ার উপরে ওগুলো কি ভাসছে বলত? এত ঝক্ঝক্ করছে, মনে হচ্ছে সোনার গুঁড়ো কে যেন বিছিয়ে দিয়েছে। —বিস্মিত গলা মাষ্টার মরিসনের।

—সোনার গুঁড়োর মত যা ঝিক্মিক্ করছে তা সোনার গুঁড়োই মাষ্টার। এই দেখ --ককেশাসের পাদদেশে, ঝিরঝিরে পাহাড়ী নদীতে বিছানো ভেড়ার চামড়ার আস্তরণের উপর জমে থাকা সোনার গুঁড়ো তুলে ধরে ডবস।

—ডবস্! এই সোনার গুঁড়ো আসছে তাহলে ককেশাসের কোনও পাহাড় ধুয়ে, এ্যা!

—হ্যাঁ মাষ্টার। তোমার সামনে এই যে ঝিরঝিরে নদী দেখছ, এই নদীই ককশাসের পাহাড় থেকে নেমে আসার সময় পাহাড়ের গা ঘষে, সূক্ষ্ম পাথরকণাকে বহণ করে এনেছে নীচে, এই জলস্তরে। পাথরকণার মধ্যে সোনার কণা মানেই ককেশাসের কোনও পাহাড়ের গায়ে নিশ্চয়ই আছে সোনার স্তর। তবে মুস্কিল এটাই, এই সুবিশাল ককশাসের কোথায় সেই পাহাড় স্তর, সেটা জানব কি করে?

মাষ্টার মরিসন মন দিয়ে শোনে পিটার ডবসের কথা। চিন্তা করে কিছুক্ষণ। তারপর বলে—একটা কথা ডবস্, আর্গোনটিকা মহাকাব্যের মতে, জ্যেইসন পেয়েছিল সোনার গুহা ককেশাস পাহাড় থেকে ডাইনে গিয়ে, এরিসের সমতল ভূমির পরে, কোনও এক পাহাড়ী গুহায়। অথচ ককেশাস তো আমাদের বাঁদিকে দাঁড়িয়ে। তাহলে?

—সেটাই তো ভাবছি মাষ্টার। ককেশাসের পাহাড়ী নদীতে ভাসছে অজস্র সোনার কণা। অর্থাৎ ধারে কাছে সোনারস্তর আছেই কোথাও পাহাড়ীস্তরে, এটা নিশ্চিত। কিন্তু কোনদিকে যাব? বাঁদিকের ককেশাস পর্বতে, না, জ্যেইসনের গল্পের পথে ডানদিকে, সমতল ভূমির দিকে? —বিহ্বল ডবস পিটার।

—ডবস্, সোনার কণা বয়ে নিয়ে এসেছে সামনের এই পাহাড়ী নদী, তাই তো? আমরা যদি এই নদীকে অনুসরণ করে পাহাড়ের দিকে যাই, তাহলে কোন পাহাড় থেকে নদী নেমেছে জানব। তারই সঙ্গে দেখতে দেখতে যাব, সেই পাহাড়ের বুকে সোনার স্তর লুকিয়ে আছে কিনা? কাজটা করা অসম্ভব?

—না মাষ্টার, অসম্ভব নয়, তবে বেশ কঠিন। নদী যখন পাহাড় থেকে নামে, তখন কখনও সহজভাবে সহজপথে, কখনও বা সড়াসাড়ি খাড়াপথে। খাড়াপথে ওভ বে কি পাহাড়ে চড়তে পারব আমরা? পাহাড়ে চড়ার সেসব ব্যবস্থা তো আমাদের নেই।

—ডবস্, তবুও চেষ্টা করতে দোষ কি? দেখা যাক্ না কি হয়? নদীকে ধরে কিছু দূর তো যেতে পারবই। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে। প্লিইজ ডবস্, আপত্তি কোর না। রাজী হও ভাই।

--ও. কে. মাষ্টার। বলছ যখন, চলই। তবে মনে হয় না বেশীদূর নদীকে ধরে যেতে

পারব। তবুও, তোমার যখন ইচ্ছে বাধা দিচ্ছি না। —পাহাড়ী নদীকে অনুসরণ করে তার উৎস-মুখের দিকে রওনা হয় ডবস আর মাষ্টার মরিসন।
প্রভাতী সূর্য তখন কিছুটা উঠেছে ঊর্ধাকাশে। প্রজ্বল আলোয় উদ্ভাসিত ককেশাস পর্বতের বিস্তৃত অঞ্চল। ককেশাসের পাদদেশ ধৌত করে চলেছে পাহাড়ী নদী। নদীর আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগিয়ে চলেছে উত্তেজিত দুটি মানুষ, পিটার ডবস আর মাষ্টার মরিসন ইরমিবেসগলু।

আর্গো এসে ভিড়ল বন্দর পোটিতে। ঠিক হলদে স্পীড বোটের গায়েই। হুইলার তাকাল স্পীড বোটের দিকে। —নাঃ, কেউ নেই স্পীড বোটে। মরিসনদেরও দেখা যাচ্ছে না। প্যাটারসন, কি করি বলুন তো এখন? —সত্যিই ভীষণ ভয় পায় এবার সেকেণ্ড ক্যাপ্টেন পিটার হুইলার।
—বলিনি হুইলার, সোনা থাকা মানেই সর্বনাশ। চারদিকে শত্রুরা কেমন ঘিরে ধরেছে আমাদের, দেখলে? কি যে করি আমরা? —হতাশ গলা প্যাটারসনের।
দুশ্চিন্তার কালোছায়া সবারই মুখে। সত্যিই তো, এভাবে উপে যাবে ক্যাপ্টেন সেভেরিন, ষ্ট্র্যাপিং মাষ্টার ডবস্, তরতাজা কিশোর ওবসম্যান মরিসন? র‍্যাদারফোর্ডরা সত্যিই কি ওদের মেরে ফেলবে? সবাই চুপচাপ, থমথমে। আর্গোর অভিযাত্রীরা সবাই মূক, পাথরের মত নিশ্চল।
হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে রোইং মাষ্টার মার্ক। —হুইলার, স্পীড বোটের দিকে তাকাও। স্পীড বোটের গায়ে ও দুটো কি ঝুলছে? আর্গোর মেটালিক মনোগ্রাম না! ওটা ওখানে গেল কি করে! কে ঝুলাল ওভাবে?
—এ্যা! আর্গোর মেটালিক ব্যাজ? —হুইলার ঝুকে পড়ে সামনে। তাকায় ভাল করে। উজ্বল হয়ে উঠে চোখ দুটো খুশীতে। —প্যাটারসন! মাষ্টার মরিসন আর ডবস পোটিতেই আছে। ওদের ব্যাজ তাই লাগিয়ে রেখে গেছে স্পীড বোটের গায়ে।
—কিন্তু ওদের ব্যাজ স্পীড বোটের গায়ে ঝোলাবে কেন? —অবাক হয় পার্টনার প্যাটারসন।
—ওখানে ওভাবে ঝুলিয়ে বোঝাতে চেয়েছে, ওরাও স্পীডকে খালিই দেখেছে। ওরা স্পীডবোটের লোকজনদের পিছনেই ধাওয়া করেছে।
—হুইলার, এটা যদি সত্যি হয় তাহলে ভাবনার কথা। র‍্যাদারফোর্ডের একদঙ্গল লোকজনের সঙ্গে ওরা দুজনে পারবে কি করে? ওরাও তো বন্দী হবে র‍্যাদারফোর্ডের হাতে।
—প্যাটারসন, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমাদের এখুনি রওনা হওয়া দরকার স্বর্ণ-গুহার দিকে। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র তো আমাদের বেশী নেই। তাহলে?

তড়িৎ সভা বসে আর্গোর মধ্যে। ঠিক হয় আঠারো জনকে নিয়ে প্যাটারসন আর হুইলার যাবে ফোসিসের মোহনা হয়ে এরিসের সমতল ভূমির গায়ে স্বর্ণগুহার দিকে। ওখানেই হয়ত মোকাবিলা হবে বদমাইস স্মাগলার র‍্যাদারফোর্ডের দলের সঙ্গে। মার্কের সঙ্গে দশজন ওরসম্যান এই বোটেই রয়ে যাবে আর্গোকে পাহাড়া দেবান জন্য। জর্জিয়া শহরে পুলিশের সাহায্য নেবার জন্য যাবে এরাসিন আর নিক্ হোলিস। দুজনেরই বয়েস হয়েছে। তাই লড়ই টড়াইএ ওদের না জড়িয়ে দূতের কাজ করানোই ভাল। দুজন ফটোগ্রাফারের মধ্যে জন এগান যাবে প্যাটারসনের সঙ্গে স্বর্ণগুহার দিকে আর শেঠ মর্টিমার রয়ে যাবে আর্গোতে।

সভা শেষ হয়। আর্গোর অভিযাত্রীরা দ্রত যে যার নির্দিষ্ট পথে চলে যায়। থমথমে হাওয়া, উত্তেজিত শংকা আর্গোয় তেত্রিশজন অভিযাত্রীদের মনে। তাদের তিনজন সঙ্গী হারিয়ে গেছে। স্বর্ণগুহা পাওয়া যাক বা না যাক, হারানো তিন অভিযাত্রীকে উদ্ধার করতেই হবে। অলিখিত শপথ সবার চোখেমুখে।

—সেভেরিন, সত্যি বলছ পথের নক্সাটক্সা নেই? আমাদের বোকা বানাবার জন্য মিথ্যে বলছ নাতো?—ধমকে উঠে র‍্যাদারফোর্ড।

—দেখ র‍্যাদারফোড, আমি তোমার মত সোনার স্মাগলিং করি না। তাই সোনার উপর বিন্দুমাত্র লোভ নেই আমার। আমি অ্যাডভেঞ্চার ভালবাসি। কিছু আবিষ্কার করাই আমার একমাত্র আনন্দ। তাই এখানে এসেছি কাল্পনিক কাহিনীকে অনুসরণ করে। পথের নক্সা, স্বর্ণগুহার মানচিত্র, এসব থাকলে যে কোন লোকইতো আসতে পারে। তাহলে আমার মত অ্যাডভেঞ্চারিষ্ট আর কি করল? আমার মুখের কথায় বিশ্বাস করেই তোমাদের আমার সঙ্গে আসতে হবে।—কড়া গলায় বলে ক্যাপ্টেন সেভেরিন।

—বেকায়দায় ফেলবে নাতো? দেখ সেভেরিন, আমাদের কারুর কিছু হোলে তোমাকে জ্যান্ত রাখব না, মনে রেখো কথাটা।—হুংকার দিয়ে বলে র‍্যাদারফোর্ড।

—আরে ক্যাপ্টেন, উল্টোপাল্টা কিছু করলে পাহাড় থেকে গড়িয়ে ফেলে দেব নীচে। বুঝলে ক্যাপ্টেন, স্বর্ণগুহার সোনা আমরা চাইই।—লোভী গলায় বলে দলছুট গ্রীক ওরসম্যান লিনিয়স।

—সোনা পাব বলেইতো তোমার আর্গো ছেড়ে র‍্যাদারফোর্ডের দলে ভিড়েছি। হয় সোনার গুহায় নিয়ে যাবে আমাদের, না হয়, প্রাণ যাবে তোমার, বুঝলে ক্যাপ্টেন। —পিটার মোর‍্যানও হুংকার ছাড়ে।

—দেখ, ফালতু ভয় দেখিও না আমায়। আর একটা অপমানজনক কথা বলেছ কি এক পাও যাব না। সোনার গুহায় যাব, সত্যিই গুহা আছে কিনা দেখার জন্য।

তবে একথা ভেব না, সেই সোনা তোমরা তুলে নিয়ে যাবে।—রুখে দাঁড়ায় ক্যাপ্টেন।
—কেন তুমি বাধা দেবে?—পাল্টা গর্জন স্মাগলার র‍্যাদারফোর্ডের।
—হ্যাঁ। আমার শেষ রক্তবিন্দু থাকতে এককণাও সোনা নিতে দেব না স্বর্ণগুহা থেকে। তা ছাড়া—
—তা ছাড়া? তা ছাড়া কি করবে?—ফুঁসে উঠে র‍্যাদারফোর্ড।
—আর্গোর অন্য লোকজনরা মরে যায়নি, একথাটা মনে রেখো। মনে রেখো, মরিসন তোমার মত বদমাইসকে ঠাণ্ডা করার বুদ্ধি রাখে।—ধমকায় ক্যাপ্টেন সেভেরিন।
—মরিসন? মরিসন কে?—অবাক হয় র‍্যাদারফোর্ড।
—ছোঃ, ঐ ছোকরা মরিসন আমাদের সঙ্গে পাঞ্জা কসবে? আসুক না কাছে, মেরে গুঁড়িয়ে দেব ছোকরাকে। ও তোমার পেয়ারের ওরসম্যান হোতে পারে, কিন্তু আমরা ওকে পেলে টুকরো টুকরো করে দেব।—হিসহিস করে ফুসতে ফুসতে বলে লিনিয়স।
—সময়কালে দেখা যাবে কে কাকে টুকরো করে দেয়। বাজে কথা ছাড়। যদি স্বর্ণগুহায় যেতে চাও, রওনা হও এখন। রাত হোলে পাহাড়ী সর্পিল রাস্তা চলার পক্ষে বিপজ্জনক হবে। জন্তু জানোয়ারের ভয় থাকে তখন।
—চল, চল হে লিনিয়স। আগে তো স্বর্ণগুহায় পেঁছাই, তারপর সেই সোনার মালিকানা কার, তখন ঠিক হবে। ওখানেই ঠিক হবে, মরিসন আমাকে ঠাণ্ডা করে না, আমি মরিসনকে ঠাণ্ডা করি। কিন্তু সেভেরিন, তোমার পেয়ারের মরিসন ছোকরারা কৈ? ব্ল্যাক-সি এতক্ষণেতো আর্গোর নৌকাশুদ্ধ ওদের সবাইকে গিলেই ফেলেছে— হাঃ, হাঃ, হাঃ, রাক্ষসের মত ভয়ংকর হাসি হেসে উঠে র‍্যাদারফোর্ড।
—শয়তান।—রাগে দাঁত চেপে বলে সেভেরিন।—চল, আর দেরী করলে স্বর্ণগুহার দিকে যাব না আমি।
বন্দী সেভেরিনকে নিয়ে র‍্যাদারফোর্ড আর তার দলবল রওনা হয় স্বর্ণগুহার দিকে।

একদিকে স্বর্ণগুহার দিকে রওনা হোল র‍্যাদারফোর্ডের দল বন্দী ক্যাপ্টেন সেভেরিনকে গাইড করে। অন্যদিকে, প্যাটারসন হুইলারেরা রওনা হোল আর্গো থেকে জোইসনের পথে, স্বর্ণগুহার দিকে। তৃতীয় দলটি মরিসন—ডবসের। তারা স্বর্ণগুহা অন্বেষণে রওনা হয়ে গেছে পাহাড়ী নদীপথ ধরে ধরে। একদল ছুটছে স্বর্ণক্ষুধা মেটাবার জন্য। অন্য দুই দল চেষ্টা চালাচ্ছে স্বর্ণগুহা আবিষ্কার করে স্বর্ণভাণ্ডারকে সুরক্ষিত করবার জন্য। উত্তেজনায় তিন দলই চঞ্চল।
নদীর চলরেখা ধরে ধরে, পাহাড়ের খাড়াই বুকে, সরীসৃপের মত বুক দিয়ে হেঁটে হেঁটে, মরিসন আর ডবস এগিয়ে চলল। মরিসন বলল,—ডবস, লক্ষ্য করেছ, নদীটা ধীরে ধীরে কতটা ডাইনে চলে এসেছে। ককেশাস পাহাড়ের মল শৃঙ্গ থেকে কতটা ডাইনে সরে এসেছি।

—তাইতো মাষ্টার।—অবাক হয়ে বলে ডবস।—হঠাৎ বিস্ময়ে বলে উঠে ডবস, —মাষ্টার, দেখ, দেখ, এখানের জলের মধ্যেও কিছু কিছু সোনার কণা দেখা যাচ্ছে। তাহলে তো আমরা সঠিক দিকেই যাচ্ছি।

—ডবস, তবেতো জোইসনের তিন হাজার বছরের কাহিনী মিথ্যে নয় দেখা যাচ্ছে। ককেশাসের ডানদিকের পাহাড়ের দিকেই যাচ্ছি আমরা। হয়ত ওখানে পেতেও পারি স্বর্ণগুহা। যাই হোক্, তাড়াতাড়ি যেতে হবে। র‍্যাদারফোর্ডের আগে স্বর্ণগুহার দখল নিতে হবে আমাদের।

—ও. কে। চল ডবস। তাড়াতাড়ি চল।

বিকেলের পড়ন্ত সূর্য জর্জিয়া-কোলচিসের আকাশে স্বর্ণালী রঙের রংবাহারী আলপনা এঁকে চলেছে। দূরে ককেশাস পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় শেষ সূর্যের স্বর্ণচ্ছটা। চারদিকের আকাশে-বাতাসে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ ছায়ার সংকেত।

ক্লান্ত-শ্রান্ত মরিসন আর ডবস এসে পৌঁছেছে অরণ্যরাজীর মাঝখানে, পর্বতমালার মধ্যিখানের গুহার সামনে।

—ডবস, সন্ধ্যে হয়ে এল। পাহাড়ী নদীও হঠাৎ যেন কোথায় হারিয়ে গেল। আমরাও বড় ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। আজ রাত্রে এখানেই অপেক্ষা করতে হবে কোথাও।—ক্লান্তকণ্ঠে বলে মাষ্টার মরিসন।

—কিন্তু এই পাহাড়ী জঙ্গলের মধ্যে রাতটা থাকব কোথায়? ভয়ংকর জংগল, দেখতেই তো পাচ্ছ মরিসন।

—চলো ডবস, খুঁজে পেতে পাহাড়ের মধ্যে রাতটা কাটাবার আস্তানা খুঁজে বার করি।

—ছোট্ট, ইলেকট্রনিক টর্চটা বের করে চারিদিকে অন্ধকারের মধ্যে আশ্রয় খুঁজতে থাকে মাষ্টার মরিসন। মরিসনের পিছনে পিছনে চলেছে ডবস।

অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘন হয়ে এসেছে। অজানা বনজ পাখীর ডাকও থেমে গেছে। টর্চের সূক্ষ্ম আলোয় ধীর পদে এগুচ্ছে মরিসন-ডবস। চলতে চলতে হঠাৎ সামনের পথ রূদ্ধ হয়ে যায়।—একি। রাস্তা যে বন্ধ।—এপাশে-ওপাশে টর্চের আলো ফেলে মরিসন।

—একে পাথরের দেওয়ালের ঘেরাটোপের মধ্যে এসে পড়েছি আমরা।—বিস্ময় ভরা গলায় বলে ডবস।

—ডবস! তাকাও! ভাল করে তাকাও। মনে হচ্ছে, কোনও এক গুহার মধ্যে ঢুকে পড়েছি আমরা! লক্ষ্য কর ভাল করে ডবস!—উত্তেজিত কণ্ঠ মরিসনের।

—গুহা! দেখি, দেখি!—মরিসনের হাত থেকে টর্চ ছিনিয়ে নিয়ে চারদিকে পরখ করতে থাকে ডবস। দেওয়াল, মেঝে, ছাদের চারদিক। হঠাৎ আসা টর্চের আলোয়, গুহার দেওয়ালে, ছাদে ছড়িয়ে থাকা অজস্র সাপের দল নড়েচড়ে উঠে।

—মাই গড! একে স্বর্ণগুহা!—এক পা লাফিয়ে উঠে বলে মাষ্টার মরিসন।

—চল হে মাষ্টার, অন্য গুহা খুঁজি। এখানে থাকলে স্বর্ণ ঘাতেই মরতে হবে।

—দাঁড়াও ডবস, ভাল করে গুহাটা আর একবার দেখে নিই।—টর্চের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে থাকে মরিসন। অজস্র সাপ দেওয়াল ও ছাদকে ছেয়ে রেখেছে। বনজ গুল্ম গুহার দেওয়ালের মাঝখানে মাঝখানে ছড়িয়ে আছে। গুহা থেকে শব্দ উঠছে গুড়-গুড়-গুড়। গুহার একধার দিয়ে চিলতে আলো আসছে।

—এ শব্দ কিসের? এ আলো কোথা থেকে আসছে ডবস? অন্ধকার গুহায় আলো আসবে কোথা থেকে অবাক গলা মরিসনের।

—মরিসন, এই রাতটায় বাইরে না গিয়ে যেভাবেই হোক এই স্বর্ণগুহায় রাত কাটাতে হবে। রাতের অন্ধকারে, শুধু টর্চের ভরসায় পরীক্ষা না চালানই ভাল।—অবস্থা বুঝে সাবধান করে ডবস।

—ঠিক আছে, অন্য পরীক্ষা না হয় সকালেই করা যাবে। কিন্তু গুড়-গুড় শব্দ আসছে কোথা থেকে, চিলতে আলোই বা কোথা থেকে আসছে জানা দরকার। একটু ওদিকে যাচ্ছি, দেখি আলোটা কিসের।—ডবসের প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করে গুহার যেদিক থেকে আলো আসছে সেদিকে চলে যায় মরিসন। তারপর ডবসের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। কিছুক্ষণ নিথর নিস্তব্ধতা নেমে আসে গুহায়। হঠাৎ মরিসনের চিৎকার ভেসে আসে।—আহ্! ডবস! মাই গড! একি!—

মরিসনের চিৎকারে অন্ধকারের মধ্যেই ছুটে যায় ডবস। তারপরেই থমকে দাঁড়ায়।

—একি মরিসন!—অবাক হয়ে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে যায় ডবস।—এপাশ দিয়ে পাহাড় ঘেঁসে নেমে গেছে তাদের সেই হারিয়ে যাওয়া নদী। আর যেখানে সে দাঁড়িয়ে, সেটা গুহা পথের অন্য একটি মুখ। পাহাড়ের বাইরের গায়ে, পাথরে, বারবার নদী এসে যেখানে আঘাত করে নেমে যাচ্ছে, সেখানে, পাহাড়ের গা চন্দ্রালোকে ঝিকমিক করছে স্বর্ণচ্ছটায়।

—ডবস, একি ঝিকমিক করছে। পাহাড়ের বাইরের দেওয়ালে একি। সোনার স্তর নয়তো! এই সোনার স্তরের গুড়োই কি নীচে নামছে পাহাড়ী নদীর সঙ্গে!

—মাষ্টার, এ সোনাই। স্বর্ণস্তরেই আঘাত করে নেমে যাচ্ছে নদী। তার মানে—

—তার মানে স্বর্ণগুহার মধ্যেই চলে এসেছি আমরা! মাই গড! সো, উই গট ইট! আমরা স্বর্ণগুহা আবিষ্কার করেছি তবে! ডবস!—আনন্দে ডবসকে জড়িয়ে ধরে মরিসন।

রাতের চন্দ্রালোকে, শীতল হীমেল হাওয়ায়, পাহাড়ী বনমালা খুশীতে কাপছে, থিরথির। শান্ত ধরিত্রী। নিদ্রিত দূরদূরান্তের জনপদ। শুধু তারই মধ্যে স্বর্ণগুহার মুখে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত সুখের আনন্দে টলমল কিশোর মরিসন আর জিওলজিষ্ট ডবস। উত্তেজনা, বিহ্বলতা, সব নিয়েই প্রভাতী আলোকধারা নেমে আসে স্বর্ণগুহার সামনে। ক্রমে দিনের আলো প্রজ্বল হয়। ডবস আর মরিসন স্বর্ণগুহার ভিতরে লক্ষ্য করে

সবকিছু অনুসন্ধিৎসু চোখে। গুহার দেওয়ালের প্রায় সবটাই যে সোনার স্তর সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না ডবসের।

—মাষ্টার, এরপর? স্বর্ণগুহাতো পেলাম। কিন্তু ক্যাপ্টেন সেভেরিনকে উদ্ধার না করলে, আমাদের দলবলকে না পেলে, স্বর্ণগুহা পেলেই বা কি লাভ হবে?

—ঠিকই ডবস, কে জানে র‍্যাদারফোর্ডরা ক্যাপ্টেনকে নিয়ে কি করছে? যদি ওরাও স্বর্ণগুহায় আসত, তবে তো ক্যাপ্টেনকে উদ্ধার করার কোনও মতলব বার করা যেত।

—কিন্তু কি করবে এখন? নদীপথ ধরেই ফিরে যাবে ফেসিসের মোহনায়, অভিযানী নৌকা আর্গোতে? না, এখানেই আজকের দিনটা অপেক্ষা করবে র‍্যাদারফোর্ডদের জন্য?—প্রশ্ন করে ডবস।

—এখানেই আজ অপেক্ষা করি। মন বলছে ডবস, ওরা আসবে, ওদের এখানে আসতেই হবে। সোনার লোভ ওদের এখানে টেনে আনবেই। কিন্তু ডবস, এসব কথা এখন থাক। চল বাইরে ভাই, কিছু ফলমূল বন থেকে জোগাড় করি। দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে।

—ঠিকই বলেছ মাষ্টার। ক্ষিদেতে যে আমিও কাহিল।

বনজ ফলমূল জোগাড় করে, পেটভরে খেল, দুজনে! তারপর পাহাড়ী নদীর স্ফটিক শুভ্র জলে স্নান করে, স্বর্ণগুহার পিছনে, নদীর পাশে, গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ল। উত্তেজনার শেষে শ্রান্ত দুজনে নিবিড় ঘুমে তলিয়ে গেল মুহূর্ত মধ্যেই।

বহু মানুষের শব্দ, হৈ-হল্লা, উত্তেজিত কথায় ঘুম ভেঙ্গে যায় মরিসনের। কান পেতে শোনে সব। তারপর ধাক্কা দেয় ডবসকে।—ডবস, উঠ উঠ। কারা যেন স্বর্ণগুহার কাছে এসেছে।

মরিসনের ধাক্কায় ঘুম থেকে উঠে পড়ে ডবস। স্বর্ণগুহার দ্বিতীয় প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকে পড়ে দুজনে স্বর্ণগুহায়। দিনের আলোতেও স্বর্ণগুহার ভিতরটা তত আলোকিত নয় তখন।

—নাঃ, স্বর্ণগুহার ভিতরে তো কেউ নেই।—মরিসন আর ডবস এসে দাঁড়ায় স্বর্ণগুহার মূল প্রবেশ মুখের সামনে।

—ডবস, দেখো, দেখো। ঐ কিছু দূরে ওরা কারা? ঐ তো ক্যাপ্টেন সেভেরিন! পিছনেই তবে বদমাস র‍্যাদারফোর্ডের দল।—ফিসফিস করে বলে মাষ্টার মরিসন।

—যাক, ক্যাপ্টেন বেঁচে আছে তাহলে!—স্বস্তির নিশ্বাস ডবসের গলায়।

—কিন্তু বেঁচে থাকলেও, ঐ বিরাট দলের হাত থেকে ক্যাপ্টেনকে উদ্ধার করি কি করে বলত ডবস? তাছাড়া, ওরাও ঢুকবে এবার স্বর্ণগুহায়। ওদের লোভী হাত থেকে স্বর্ণগুহার সোনাকে বাঁচাব কি করে?—দুশ্চিন্তা ঝড়ে পড়ে মাষ্টার মরিসনের গলায়।

—ওরা প্রায় সবাই আর্মড। আমার কাছে শুধু একটা ছোট্ট ষ্টেনগান। তোমার

অস্ত্রটা বার কর এবার মাষ্টার। জানিনা, দুজনে কি করে লড়ব ঐ বিরাট দলের সঙ্গে?
—অসহায় কণ্ঠ ডবসের।

মরিসন একটু চিন্তা করে। তারপর হেসে বলে—আমার অস্ত্র হচ্ছে ব্রেইনগান। ডবস, আমার ব্রেইন থেকে বুদ্ধির গোলায় ওদের কেমন কুপোকাৎ করি দেখবে এবার। তবে, ক্যাপ্টেনকে উদ্ধার করি কি করে, সেটাই মাথায় আসছে না।

র্যাদারফোর্ডরা হল্লা করতে করতে এসে গেল স্বর্ণগুহার অনেকটা কাছে। মুহূর্তে স্বর্ণগুহার ভিতরে ঢুকে গেল মরিসন ডবসকে নিয়ে।—এসো, তাড়াতাড়ি এসো। অনেক কাজ আছে।—বলেই গুহার দ্বিতীয় ছোট্ট প্রবেশপথ দিয়ে বাইরে এল।

—কি করতে চাও মরিসন? কি করছ?—অবাক হয়ে মরিসনের ছোটাছুটি দেখে ডবস।

—আঃ, দাঁড়িয়ে কেন। এসো, হাত লগাও। নষ্ট করার সময় নেই।—এবার ধমকই লাগায় মাষ্টার মরিসন।

—আহ্‌া, বলবেতো, কি করব?—ডবস ক্রমেই অবাক হয় মরিসনের ব্যাপার-স্যাপার দেখে।

—শুকনো লতা-পাতা, ডাল-পালা, জড়ো কর স্বর্ণগুহার মধ্যে। যতটা পার, যত তাড়াতাড়ি পার। সময় নেই, একদম সময় নেই।—তাগাদা লাগায় মাষ্টার মরিসন।

—জানিনা বাবা কি করতে চাও। তবে বলছ যখন, করছি।—দ্রুত হাতে শুকনো ডাল-পালা, লতাপাতা তুলতে তুলতে বলে ডবস।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই বহু শুকনো কাঠ, লতাপাতা জমা হয় স্বর্ণগুহার মধ্যিখানে।

—যাক, এবার তৈরী আমরা। স্বর্ণগুহার সোনা এবার নিরাপদ।—নিশ্চিন্ত গলা মাষ্টার মরিসনের।

—জানি না বাবা কি করবে তুমি? বলবে তো কিছু আমায়?—অভিমান ডবসের গলায়।

—দেখবে একটু পরেই সবকিছু। জরুরী কথা ডবস, আমরা নজর রাখব ক্যাপ্টেনের উপর। স্বর্ণগুহায় যেই ঢুকতে যাবে র্যাদারফোর্ডরা, তখনই ক্যাপ্টেনকে ছিনিয়ে আনতে হবে ওদের হাত থেকে।

—কি করে ছিনিয়ে আনব? ওরা কত সশস্ত্র, দেখছ না? পাগলের মত কথা বোলো না মরিসন।

—দেখ না ভাই, কি ম্যাজিক হয়। ঐ, ঐ ওরা এসে গেছে গুহার মুখে। ওরা স্বর্ণগুহায় ঢুকলেই তুমি বাইরে চলে যাবে।

—আর তুমি? তুমি কি করবে মরিসন?—মরিসনের অদ্ভূত কথাবার্তা, কাজ কারবার দেখে ক্রমেই বিস্মিত হোতে থাকে ডবস।

—আমিও যাব বাইরে। তবে তোমার কিছু পরে। মনে রেখ ডবস, ক্যাপ্টেনকে উদ্ধার করাই আমাদের কাজ এখন। স্বর্ণগুহার চিন্তা মাথা থেকে ফেলে দাও এখন।

—তার মানে, স্বর্ণগুহা ওদের দখলে চলে যাবে ?
—দেখই না কি হয়।—মুচকি হেসে বলে মাষ্টার মরিসন।

—আঃ, এই তবে স্বর্ণগুহা ?—উল্লাসে চিৎকার করে উঠে র‍্যাদারফোর্ড।
—থ্রি চিয়ার্স ফর র‍্যাদারফোর্ড।—কুশ্রী ভঙ্গীতে হাত-পা নেড়ে লাফাতে লাফাতে
চেঁচাতে থাকে লিনিয়স, মোর‍্যান, অন্যান্যরা।
--উফ্। গুহার সব সোনা তবে আমার!—র‍্যাদারফোর্ডের চোখ লোভার্ত।
—নাঃ, কোনও সোনা তোমাদের নয়। এ সব জাতীয় সম্পত্তি। কাউকে এর এককণা
নিতে দেব না। আমার প্রাণ থাকতে কেউ একে ছুঁতেও পাবে না।—অসহায়ভাবে
চিৎকার করতে থাকে ক্যাপ্টেন সেভেরিন।
—দেখ হে লিনিয়স, তোমার ভূতপূর্ব ক্যাপ্টেনের আস্ফালন। দেখি, কে বাধা দেয়।
সব সোনা তুলে নিয়ে যাব।—র‍্যাদারফোর্ড কড়া কর্কশস্বরে বলে।
—বস, স্বর্ণগুহায় তো এসেই গেছি। এখন ক্যাপ্টেনকে শেষ করে দিলেই তো হয়।
আরতো গাইডের দরকার নেই।—লিনিয়স বুদ্ধি দেয় র‍্যাদারফোর্ডকে।
—বাঃ, দারুণ কথা বলেছ।—সোল্লাসে বলে মোর‍্যান।
—না হে নাঃ, ক্যাপ্টেন দেখুক, ওর সামনে দিয়ে কেমন করে স্বর্ণগুহার সোনা দখল
করি। তারপর ওকে মেরে ফেলে দেব পাহাড়ী খাদে।—হাঃ, হাঃ, হাঃ, রাক্ষুসে
হাসি হাসে র‍্যাদারফোর্ড।—চলো, চলো হে স্বর্ণগুহার ভিতরে। ক্যাপ্টেন আসুক
পিছনে পিছনে। দেখুক, কি করি আমরা।—স্বর্ণগুহার ভিতরে র‍্যাদারফোর্ড দলবল
নিয়ে ঢুকে পড়ে। অসহায়, বিমূঢ় ক্যাপ্টেন সেভেরিন স্বর্ণগুহার বাইরে স্থানুর মত
দাঁড়িয়ে থাকে।
র‍্যাদারফোর্ডরা ভিতরে ঢুকতেই বাইরে চলে আসে ডবস। স্থানুর মত ক্যাপ্টেন
সেভেরিনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দুহাতে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠে,—ক্যাপ্টেন!
—ডবস! তুমি! তুমি কি করে এলে এখানে? মাষ্টার মরিসন কৈ?—হঠাৎ এভাবে
ডবসকে দেখে অবাক হয়ে যায় ক্যাপ্টেন সেভেরিন।
—মাষ্টার স্বর্ণগুহার ভিতরে আছে। একটু পরেই বাইরে আসবে। ঘাবড়িও না।
বরং আমরা লুকিয়ে পড়ি। র‍্যাদারফোর্ডদের নজরে পড়া ঠিক হবে না।
--কিন্তু ডবস, স্বর্ণগুহা যে র‍্যাদারফোর্ডরা দখল করে নিচ্ছে?—অসহায়তা ক্যাপ্টেন
সেভেরিনের কণ্ঠে।
—ঘাবড়াবেন না ক্যাপ্টেন। মাষ্টার বলেছে স্বর্ণগুহার সোনা নিরাপদ।
—নিরাপদ! কি করে নিরাপদ হবে ডবস? দেখেছ, কত কোদাল, গাঁইতা, জিলোটিন
নিয়ে গুহায় ঢুকল ওরা? গুহা থেকে সোনা খোদাই করে আনবেই ওরা? একলা মরিসন

গুহায় থেকে কি করে বাধা দেবে ?—ক্যাপ্টেন সেভেরিন অস্থির হতে থাকে ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে।

হঠাৎ গুহার প্রবেশ পথের দিকে নজর যেতেই চম্‌কে যায় ক্যাপ্টেন।—ডবস ! গুহাতে কি আগুণ লাগল ? অত ধোঁয়া আসছে কোথা থেকে ? এসব কি হচ্ছে ডবস ? মরিসনইবা কোথায় ? ছোকরা কি ওদের হাতে বন্দী হোল ?—অস্থির উত্তেজনায় ছটফট করতে থাকে ক্যাপ্টেন সেভেরিন।

হঠাৎ পাহাড়ী পথের নীচ থেকে ভেসে আসে বহু মানুষের কলকণ্ঠ, পদশব্দ।—কারা আসছে ডবস ?—স্বর্ণগুহা থেকে চোখ ফেরায় নীচে, পথের দিকে।—এরা আবার কারা ?

মুহূর্ত পরেই মানুষের চেহারা ভেসে উঠে চড়াইই পাহাড়ী পথে।—ডবস, ও কে ! হুইলার না ? আরে ! ঐতো প্যাটারসন ! আহহা ! আমার আর্গোর লোকেরা এসে গেছে এখানে ? ফাইন।

নীচ থেকে প্যাটারসনও দেখতে পেয়েছে ক্যাপ্টেনকে, ডবসকে।—লুক ! লুক হুইলার ! ঐযে সেভেরিন ! ঐ দেখ ডবস ! তাহলে মরিসনরা বেঁচে আছে ?—আনন্দ উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে আর্গোর বিশজন অভিযাত্রীর মধ্যে। ছুটতে ছুটতে চড়াই পেরিয়ে চলে আসে সবাই ক্যাপ্টেনের কাছে।

কিন্তু ক্যাপ্টেনের কাছে এলেই থমকে পড়ে প্যাটারসন।—মাষ্টার কৈ ? আমার মরিসন কৈ ?

—ও আছে স্বর্ণগুহার ভিতরে, ঐখানে।—আঙ্গুল তুলে ডবস দেখিয়ে দেয় ধুমায়িত স্বর্ণগুহার প্রবেশপথ।

—ওকি ! ওখানে যে ধোয়ার কুণ্ডলী ! স্বর্ণগুহায় আগুণ লেগেছে যে ! আহ, ছেলেটাকে ওখানে থাকতে দিলে ?—অস্থির চোখে বলে পার্টনার প্যাটারসন।

—কারুর কথা শোনে ডাকাবুকো ছেলেটা। জোর করে আমাকে বাইরে পাঠিয়ে ভিতরে যে কি করছে কে জানে ?—বিড়বিড় করে বলে ডবস।

—তুমিইবা ওকে ভিতরে রেখে বাইরে এলে কেন ? বাচ্চা ছেলেটা যে গুহাতেই রয়ে গেল ?—প্যাটারসন গজগজ করতে থাকে।

—শুধু কি তাই, র‍্যাদারফোর্ডরা দলবল নিয়ে ঐ স্বর্ণগুহাতেই আছে।—ক্যাপ্টেন সেভেরিনও অখুশী ব্যাপারটার জন্য।

—সেকি ! বাঘের মুখে ছেলেটাকে রেখে চলে এলে ? ডবস, তুমি বয়সে বড় হলে হবে কি, একটুও বুদ্ধি নেই ঘটে ?—এবার ধমকে উঠে প্যাটারসন।

—কি করব, ওযে বলল, বাইরে যাও, ক্যাপ্টেনকে উদ্ধার কর। ওদিক নাকি ওই সামলাবে।—অপরাধীর গলা ডবসের।

—আচ্ছা, তোমরা ডবসকে ধমকাচ্ছো কেন বলতো? তোমরা জাননা মাষ্টার মরিসন
কেমন একগুঁয়ে ছেলে।
হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে ডবস।—দেখুন, দেখুন ক্যাপ্টেন, স্বর্ণগুহার ভিতর থেকে র‍্যাদার-
ফোর্ডের লোকেরা ছুটে বেড়িয়ে আসছে। দেখুন, কি আতঙ্ক ওদের চোখেমুখে।
—তাইতো! ভয়ে কাপছে সবাই।—প্যাটারসনও চমকে উঠে।
—কুইক। ভাববার সময় নেই। ওরা যে কারণেই হোক ভয় পেয়েছে। এই সুযোগ,
যারাই বাইরে আসছে বন্দী কর তাদের।—সম্বিত ফিরতেই বলে ক্যাপ্টেন সেভেরিন।
মুহূর্তে আর্গোর লোকজনেরা বন্দী করে ফেলে র‍্যাদারফোর্ড আর তার দলবলকে।
বলতে গেলে, বিনা বাধায় সবাই ধরা দেয়। প্রত্যেকটি লোকের মুখ দারুণ ভয়ে
পাংশুটে, বিবর্ণ।
—কি ব্যপার বল তো হে ডবস? এরা এত ভয় পেল কি দেখে? স্বর্ণগুহায় আছে
কি?—অবাক গলা সেভেরিনের।
অনেক যন্ত্রণা ভোগ করেছে সেভেরিন র‍্যাদারফোর্ডের হাতে। তাই র‍্যাদারফোর্ডের
এই অবস্থা দেখে হেসে ফেলে। হেসে বলে—কিহে র‍্যাদারফোর্ড, স্বর্ণগুহা থেকে
সোনা না নিয়েই যে ফিরে এলে, ব্যপার কি?
—স্বর্ণগুহা? ওখানে কোথায় সোনা? ওটাতো সর্পগুহা। বাপরে! শত
সহস্র সাপ ছেঁকে ফেলেছিল আমাদের। জনাকয়েক তো সাপের ছোবল খেয়ে গুহার
মধ্যেই ছটফট করছে। সাপের নিঃশ্বাসে আগুণ জ্বলছে, দেখনি তার কুণ্ডলিকৃত ধোঁয়া।
—সাপের নিঃশ্বাস থেকে আগুণ? আগুণ থেকে ধোয়া? কি আবোল—তাবল
বকছ? তোমারা গুহায় সোনা দেখতে পাওনি?—অবাক গলায় প্রশ্ন করে ক্যাপ্টেন
সেভেরিন।
—সোনা? বাপস, প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি এই যথেষ্ট। ঐ গুহা স্বপর্দ নোর
কবলে। বাপরে! শত সহস্র সাপ! ওখানে মানুষ যেতে পারে না। সোনা থাকুক
আর নাই থাকুক, ঐ গুহার আমরা কেউ যাচ্ছি না আর।—ভীত কম্পিত গলায়
বলে র‍্যাদারফোর্ড। ওর সঙ্গী সাথীরাও ভয়ে নির্জিব হয়ে চুপচাপ দাড়িয়ে আছে।
ব্যাপারটা এমনটি হবে ভাবতে পারে নি ক্যাপ্টেন সেভেরিন। ক্যাপ্টেন কিছুক্ষণ চুপ
করে থাকে, তারপর বলে—আর্গোনটিকায় অবশ্য বলেছিল স্বর্ণগুহা পাহাড়া দিত
সর্পরাজ, তার দলবল নিয়ে। কিন্তু সেটাও যে সত্যি হবে ভাবতে পারি নি। চলতো
ডবস গুহার ভিতরে, একবার দেখা যাক ব্যাপারটি কি?
ক্যাপ্টেন সেভেরিন ডবসের সঙ্গে প্যাটারসন ও হুইলারকে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে
গেল স্বর্ণগুহার মূল প্রবেশ মুখের দিকে। যেতে যেতে ডবসকে জিজ্ঞেস করল,—
ডবস, স্বর্ণগুহায় ধোঁয়াটা কিসের বলতে পার?
—কি জানি? তবে মরিসন আর আমি গুহার মধ্যে শুকনো ডালপালা জড়ো করে-

ছিলাম। হয়ত মরিসন তাতেই আগুণ দিয়েছিল। সেই ধোঁয়াই আমরা দেখেছি বাইরে থেকে।

—চলো, দেখি সত্যি ব্যাপারটা কি?—গুহায় ঢুকেই থমকে দাঁড়ায় ক্যাপ্টেন। চমকে উঠে সবাই। ধিকি ধিকি কাঠের আগুণে স্বর্ণগুহা আলোকোজ্জ্বল। তারই মধ্যে ও কি দেখেছ তারা? বিহ্বল ক্যাপ্টেন বলে উঠে,—কি সর্বনাশ! মাষ্টার মরিসন যে মারা পড়বে এবার? ওকে ঘিরে ধরেছে সহস্র সাপ? ওকে বাঁচাব কি করে ডবস?

—মাষ্টার!—চিৎকার করে ডাকে প্যারটারসন।

এতক্ষণে সম্বিত ফেরে মাষ্টার মরিসনের। মুখ ফেরায় ক্যাপ্টেনদের দিকে। মুখে অপার্থিব হাসি। সেখানে ভয়ের চিহ্ন নেই। বিপদের শংকা নেই। হাসিতে খুশীর ঝলক। মাষ্টার বলে,—উপরের দেওয়ালের দিকে তাকান ক্যাপ্টেন।

—দেওয়ালের চারিদিকে, বৃত্তাকারে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বিষধর সাপ, দেখতে পেয়েছেন?

—হ্যাঁ। ওরাযে ভয়ংকর! যে কোনও মুহূর্তে নেমে এসে ছোবল দেবে তোমায়। ছোবল দেবে আমাদের।

—না স্যার, আমাদের কাউকে ওরা কিছু বলবে না। আসুন না এখানে, দেখুন। আমাকে ঘিরে রয়েছে যে শত সহস্র সাপ, তারাও ছেড়ে দেবে পথ আপনাদের। —নির্ভয় কণ্ঠ মরিসনের।

—তবে র‍্যাদারফোর্ডরা ভয়ে পালাল কেন? ওদের কাউকে কাউকে এই বিষধর সাপ নাকি কামড়েওছে? —শংকা-বিহ্বলতা ক্যাপ্টেন সেভেরিনের গলা।

—ঠিকই ক্যাপ্টেন। ঐতো, ঐ কোণায় পড়ে রয়েছে স্বর্ণলোভী কটা পিশাচ। এই গুহার এককণা সোনাও যদি আপনি স্পর্শ করেন, এই শত-সহস্র সাপ একসংগে ঝাপিয়ে পড়বে। তাদের বিষের ছোবলে আপনাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে মুহূর্তে। আর—

—আর যদি শুধু দেখতেই আসি স্বর্ণগুহাকে, তবে? —এবার প্রশ্ন করে প্যাটারসন।

—তবে শতসহস্র এই বিষধর, এমনি করেই ফণা তুলে, আপনাকে স্বাগত জানাবে, শ্রদ্ধা জানাবে। এরা যে এই তিনহাজার বছর ধরে এই সহস্রকোটি মূল্যের স্বর্ণগুহাকে রক্ষা করছে, পাহাড়া দিচ্ছে। এরা সত্যদ্রষ্টা, ভগবান। তাই এরা শত্রু আর মিত্র, দুজনকেই চিনতে পারে। —রক্তাভ অগ্নিচ্ছটার মাঝখানে, অমূল্য স্বর্ণবলয় বেষ্টিত স্বর্ণগুহায় দাঁড়িয়ে, দৃপ্ত-সতেজ ভঙ্গীতে বলে মাষ্টার মরিসন।

—তোমার একটুও ভয় লাগছে না মরিসন? বুক কাঁপছে না এভাবে স্বর্পবেষ্টিত হয়ে থাকতে? —প্যাটারসন সহজ হয়েও সহজ হতে পারছে না।

—না স্যার, কোন ভয় নেই। এরা জানে, আমি এদের বন্ধু। এরা বুঝেছে, এই

স্বর্ণগুহাকে রক্ষা করতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। এই জোইসনের প্রহরীরা তাই আমার কিছু করবে না। আসুন না আপনারাও এখানে। আপনাদেরও কিছু বলবে না।

—না মরিসন, আমরা এখানেই থাকি। এখান থেকেই তোমাকে অভিনন্দন জানাই। তোমার মত সাহস আমাদের নেই।

হাসে মরিসন। বলে,—স্যার, চলুন স্বর্ণগুহার বাইরে। আমাদের আর্গোর বন্ধুরা উৎকণ্ঠায় পথ চেয়ে আছে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক, ঠিক। চল বইরে। —প্যাটারসন, হুইলার, ডবস আর মরিসনকে নিয়ে ক্যাপ্টেন সেভিরিন বাইরে আসতেই অধীর উৎকণ্ঠায় অপেক্ষমান আর্গোর অভিযাত্রীরা আনন্দে হর্ষধ্বনি করে উঠে।

স্বর্ণগুহা অভিযানের খবর পেয়ে পাহাড়ের দুরান্ত থেকে ইতিমধ্যেই জড়ো হয়েছে অগুন্তি মানুষ। পাহাড়ী ফুলের স্তবকে জনতা অভিনন্দিত করে ক্যাপ্টেন সেভেরিনকে।



পাহাড়ী ফুলের স্তবকে জনতা অভিনন্দিত করে ক্যাপ্টেন সেভেরিনকে

পুষ্পস্তবক উপহার পেয়ে স্মিত হাসে ক্যাপ্টেন সেভেরিন। বলে,—পাহাড়ী বন্ধুরা, আর্গোর সহযাত্রীরা, এই অভিযানের অধিনায়ক আমি হলেও সত্যিকারের যিনি নায়ক এই পুষ্পস্তবকের উপহার তারই পাওয়া উচিত। —ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে ক্যাপ্টেন মাষ্টার মরিসনের দিকে। বুকে জড়িয়ে ধরে সস্নেহে। তুলে দেয় পুষ্পস্তবক মাষ্টার মরিসনের হাতে।

—থ্রি চিয়ার্স ফর মরিসন। —অভিযাত্রীরা সহর্ষে অভিনন্দন জানায় মাষ্টার মরিসনকে। বিনীত ভঙ্গীতে মাথা নত করে মরিসন।

স্বর্ণগুহার প্রবেশমুখ তখন আনন্দে উদ্বেলিত। হঠাৎ ভেসে আসে ক্ষীণ কণ্ঠ। —মরিসন, আমাদের ক্ষমা কোর ভাই। সত্যিই, তোমার জন্য আমরাও গর্বিত। দুর্বুদ্ধি আমাদের। তা না হলে, এই জয়ের মুহূর্তে আমরাও তো তোমাদের সঙ্গী হতাম। —হতাশায় মাথা নীচু করে লিনিয়স-মোর্যানরা।

—তোমাদের ভুল তাহলে বুঝতে পেরেছ লিনিয়স? স্বর্ণক্ষুধার মোহ মিটেছে তোমাদের?

—মরিসন, আজ বুঝতে পেরেছি, স্বর্ণক্ষুধায় আছে অপমান, জ্বালা, অনাদর। আর অভিযানের ক্ষুধা? তাতে আছে আনন্দ, গৌরব। ভাই মরিসন, আমাদের যদি আবার ফিরিয়ে নিতে তোমাদের দলে? —করুণ আকুতি লিনিয়সের কণ্ঠে।

—ক্যাপ্টেন? —এবার বিনীত প্রার্থনা মরিসনের কণ্ঠে। —স্বর্ণগুহা-অভিযান সাফল্যের আজ এই সুন্দরতম মুহূর্তে, সবাই যদি সুখী হোত, তবে সেই সুখে ককেশাসের আকাশ-বাতাস আপনারই জয়গান গাইত ক্যাপ্টেন। আর্গোর অভিযান অক্ষয় হয়ে থাকত মানুষের মনে।

—কি চাও মরিসন আমার কাছে? —মরিসনের দিকে স্নেহচোখে তাকায় ক্যাপ্টেন সেভেরিন।

—লিনিয়স-মোর্যানদের ক্ষমা করুন। ফিরিয়ে নিন অভিযাত্রী দলে।

স্নিগ্ধ স্নেহার্তচোখে মরিসনের দিকে তাকায় ক্যাপ্টেন সেভেরিন। স্মিত হাসে, বলে—বেশ, তাই হবে মরিসন। এই অভিযানের সত্যি নায়ক তুমি। তোমার আদেশ যে মানতেই হবে মরিসন।

—থ্রি চিয়ার্স ফর ইয়ং ক্যাপ্টেন মরিসন। —আর্গোর অভিযাত্রীরা আবার জয়ধ্বনি করে। তারই সঙ্গে কণ্ঠ মেলায় লিনিয়স-মোর্যানের সাথীরা—চিয়ার্স ফর বিলাভেড মরিসন।

ককেশাসের পাহাড়-বনাঞ্চল তখন সূর্য-উজ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত। আকাশে-বাতাসে সুখী মানুষদের আনন্দ-স্নিগ্ধ সঙ্গীত।

পার্টনার প্যাটারসন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে মাষ্টার মরিসনের কাছে। আবেগে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে মাষ্টারকে। বিড়বিড় করে বলে প্যাটারসন,—আমি জানতাম, জানতাম, জানতাম, আমার এই মরিসন হচ্ছে দেবদূত। সুখের দেবতা, যৌবনের দেবতা, মিলনের দেবতা। মরিসন হচ্ছে আমার স্বর্গের দেবতা হারকিউলিস! —সুখের আবেগে প্যাটারসনের চোখ বেয়ে জল নামে, প্লাবিত করে দেয় মরিসনকে।

ককশাসের পর্বত, দিগন্ত বিস্তৃত নীলাকাশ, তিনহাজার বছরের ঐশ্বর্যবাহী জেইসনের স্বর্ণগুহা, সবাইকে স্বাক্ষী রেখে, এমনি করেই তিনহাজার বছরের কল্পকথা আর শাশ্বত বর্তমান একাকার হয়ে যায়।

সমুদ্রতলের বিস্ময়রাজ্যে

সমুদ্র কেন আমায় এমন করে টানে আজ সে কাহিনীই শোনাব আপনাদের। আমার
নাম? ওহো, তাইই বলিনি? আমি হচ্ছি সিলভিয়া আরলি। অতলান্ত সমুদ্রের
গভীর থেকে গভীরে যেতে আমার বড় ভাল লাগে। এই ব্যাপারে আমার একমাত্র সঙ্গী
অ্যাল-গিডিংস। অ্যাল দারুণ ফটোগ্রাফার। অতলান্ত সমুদ্রতলে যখন দুই বন্ধু
ডুব দিতাম, তখন আমি খুঁজে বেড়াতাম সমুদ্রতলের অজানা জলজ-উদ্ভিদদের, অদেখা
সামুদ্রিক প্রাণীদের। আর আমার বন্ধু অ্যাল তুলে বেড়াত অপূর্ব সমুদ্রতলের
অদ্ভুত দুর্মূল্য সব ছবি।

ওহোঃ, ধরেই ফেলেছেন তাহলে আমার আসল কি কাজ? হ্যা, ঠিকই তাই, যা
ভাবছেন তাইই আমি। আমি পরিবেশ-বিজ্ঞানী, সমুদ্রের উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের
অপূর্ব সম্পদ খুঁজে বেড়ানই আমার কাজ। বহুদিন ধরেই ছুটে বেড়াচ্ছি সমুদ্রে
সমুদ্রে, তবু তেমন সামুদ্রিক সম্পদ পেলাম কোথায়?

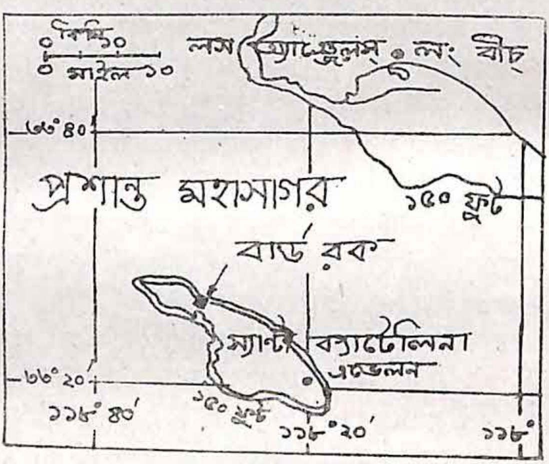
শেষে কিছু বন্ধুর পরামর্শে শুধু প্রশান্ত মহাসাগরের বুকেই শুরু করেছি আমার
সমুদ্র অন্বেষণের কাজ। প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েক জায়গায় খুঁজেওছি নূতনতর
জীব ও উদ্ভিদ। কিন্তু নূতন ধরণের কিছুই পাই নি। তবে হতাশা কথাটা আমার
মধ্যে নেই। তাই প্রশান্ত মহাসাগরের অন্বেষণের কাজ চলেছেই আমার।

ঘুরতে ঘুরতে এসেছি লস-এঞ্জেলসে। ওখানে জীববিজ্ঞানী ও সমুদ্রবিজ্ঞানীদের সঙ্গে
পরামর্শ করেছি। না, বিশেষ কিছু নূতন খবর ওদের কাছেও নেই। তবে আমি
ঠিক করেছি এই লস-এঞ্জেলস থেকে ক্রমেই দক্ষিণের দিকে যাব, যেমন এরপর
কোস্টারিকা, তারপর পেরুর কাছে। এমনি ভাবেই চলবে নানান পয়েন্টে আমার সমুদ্র-
তলের অনন্ব প্রাণসম্পদ অন্বেষণের কাজ।

লস-এঞ্জেলসে আছি কয়েক দিন। এবার সমস্ত প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলেছি। কালই
নামছি আমি আর অ্যাল সমুদ্রতলে। দিনে কয়েকঘণ্টা চলবে সমুদ্রতলে খোঁজাখুঁজির
পালা, তারপর আবার উঠে আসবে উপরে। তারপর লিখব রিপোর্ট, কি দেখলাম,
কি পেলাম সমুদ্রতলে। কে জানে, এবারও হতাশার পালা কিনা?

লস-এঞ্জেলস থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে, প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে স্যান্টা-ক্যাটেলিনা
দ্বীপ। আমি সমুদ্রতলের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাব এই ক্যাটেলিনা দ্বীপ থেকেই।
দেখি ভাগ্যে কতটা সহায় হয় এবার।

জানেন, আজ দারুণ উত্তেজিত হয়েছি আমরা। দু-বন্ধু, আমি আর অ্যাল, দুজনে ডুবুরীর পোষাকে নেমেছিলাম প্রশান্ত মহাসাগরের সমুদ্রে। যতই নীচে যাচ্ছিলাম, সমুদ্রের রঙের রকমফের হোতে লাগল। ধূসর-সবুজে রঙের জল, উপরে আর নীচে ঘিরে রাখছিল আমাদের। ক্রমেই জলের রঙ ধূসরতর হোতে লাগল। এরপর যখন ১২০ ফুট নীচে পেঁছালাম, হঠাৎ দেখলাম জলের রঙ স্বচ্ছতর হয়ে গেল। তারপর সাদা, স্ফটিকের মত পরিষ্কার স্বচ্ছ হয়ে গেল। মনে হোল, বরফের সাদা ঝকঝকে সুবিশাল সমতল প্রান্তরে যেন দাঁড়িয়ে।



সমুদ্রতলের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক্যাটেলীনা দ্বীপ থেকেই

জলস্তর ভেদ করে যখন সমুদ্রতলের স্ফটিকময় ভূখণ্ডে পা দিলাম, চমকে উঠলাম দু-বন্ধু। আরে! স্ফটিকশুভ্র ভূখণ্ড বলে যাকে মনে হচ্ছিল, তা হচ্ছে সহস্র-সহস্র বিচিত্র ধরণের সাদা রঙের মাছের সারি।

ভাবতেই পারিনি আমরা দুজনে যে লস-এঞ্জেলেসের থেকে মাত্র কুড়ি মাইল দূরে, প্রশান্ত মহাসাগরের নীচে, এমন প্রাণময় জগতের দেখা পাব। মনে হোল আমাদের, পাতাল-রাজ্যে যেন এসেছি। জলজ গুল্ম, ঝোপ-ঝাড়, গাছপালায় সমুদ্রতলের সেই রাজ্য অপূর্ব প্রাণময়। কল্পপ্ জাতীয় জলজ-গাছ আর অসংখ্য ছোট ছোট মাছ খেলে বেড়াচ্ছে সেখানে। নানান্ রঙের ফুল। বিশাল বনরাজীতে যেমন নানান্ রঙের ফুলের বাহার, সমুদ্রতলের রাজ্যে ফুলের বাহার যেন তার চেয়েও রমণীয় মনে হোল।

—সিলভিয়া, মনে হচ্ছে, এবার আমাদের সমুদ্র অভিযান সফল হচ্ছে।—খুশী খুশী গলা ফটোগ্রাফার বন্ধু অ্যালের।

—তাইতো মনে হয় অ্যাল। এই বোধ হয় প্রথম আমার ডাইরীর পাতায় সমুদ্রতলের

সত্যিকারের খবর কিছু লিখতে পারব। পৃথিবীজুড়ে চলছে আজ বাঁচায় লড়াই। গাছ-পালা, কীট-পতঙ্গ, জন্তু-জানোয়ারদের সমানে লড়তে হচ্ছে মানুষের সঙ্গে তাদের বাসস্থানের জন্য, খাদ্যের জন্য, বাঁচার জন্য। পৃথিবীর স্থল আর আকাশের পরিবেশ আজ দারুণ বেসামাল অবস্থায়। কিন্তু তারই সঙ্গে সমুদ্রতলের রাজ্যের খবর কতটুকু আমরা জানি? সমুদ্র-সম্পদ যে আমাদের কাছে কত অমূল্য তা যদি সত্যি জানতাম আর্ল, তাহলে ভূখণ্ডের পরিবেশ সংরক্ষণের কথা যতটা ভাবতাম, তার চেয়ে বেশী ভাবতাম সমুদ্র পরিবেশ রক্ষণের কথা।—বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠে সিলভিয়া।

—বন্ধু, সমুদ্রের কথা বলতে গিয়ে এত উত্তেজিত হও কেন তুমি?—হেসে বলে আর্ল গিডিংস।

—সাধে কি বলি? এই দেখনা, আমরা দু-বন্ধু আজ কয়েক বছর ধরে সমুদ্রতলে ডুবই দিয়ে চলেছি। সমুদ্রতলে নুতন বিচিত্র রাজ্য, বিচিত্র প্রাণের সন্ধান চালিয়েছি। এই প্রথম, বোধ হয়, আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বলতো অ্যাল, এই ব্যাপারে, আর্থিক সাহায্যই বা কতটা পাচ্ছি মানুষদের কাছ থেকে, আর সত্যি করে পরামর্শইবা কতজন মানুষ দিয়েছেন আমাদের?—ক্ষোভ সমুদ্র-পরিবেশ বিজ্ঞানী সিলভিয়ার।

—বন্ধু, সাধারণ মানুষ অজানা-অজ্ঞাত জিনিসের ব্যপারে প্রথমে কোনদিনই আগ্রহ দেখায় নি। কিন্তু দেখবে, যখন সত্যি কিছু আবিষ্কার করবে, জনতাই তোমাকে মাথায় তুলে নাচবে। সবভাবে সাহায্য করবে। বিজ্ঞানীদের মান-অভিমান সাজে না সিলভিয়া।

—নাঃ, নাঃ, অভিমান করিনি। শুধু বলছি, সমুদ্রতলের এই অফুরন্ত অনন্ত সাম্রাজ্য নিয়ে মানুষ একটুও ভাববে না, চিন্তা করবে না?

—আজ জুলাই ১৯৮০ সালে মানুষ হয়ত এই ব্যাপারে সচেতন নয়। কিন্তু সত্যিই যদি আমরা সমুদ্রতলের রাজ্যের অপূর্ব জগতকে তুলে ধরতে পারি, জনতা জাগবে। এই সমুদ্র সম্পদের জন্য শুরু হবে তখন বারবার অভিযান। সেদিন মানুষ তোমাকেই বারবার কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে সিলভিয়া।

—থ্যাঙ্ক ইউ আর্ল।

আজ মাসখানেক ধরে ডুব দিচ্ছি স্যানটা-ক্যাটালিনা দ্বীপ থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে। প্রতিদিন যখন সমুদ্রতল থেকে উঠে আসি, মন খুশীতে ভরে উঠছে। বিশ্বাস করুন, প্রতিদিন নুতন করে সমুদ্রের ভালবাসায় পড়ে যাচ্ছি। উপরের থেকে আপনারা সমুদ্রকে যেমনটি দেখেন, সমুদ্রের তলে যদি যান, দেখবেন, সমুদ্র তার চেয়ে শত-সহস্রগুণ রোমাঞ্চকর, আনন্দময়। এক অপূর্ব জগৎ, এক অনন্ত রত্নভাণ্ডারের দেশ ঐ সমুদ্রতল।

সত্যি বলছি, এই স্যানটা-ক্যাটেলিনা দ্বীপে যদি না আসতাম, হয়ত ক্রমেই হতাশা আমায় গ্রাস করে ফেলত। কিন্তু আজ? আজ প্রতিদিনের নূতন নূতন আবিষ্কারের ছবি আমাকে ক্রমেই সমুদ্র মায়ায় বেঁধে ফেলেছে। এই তো, আজ রাতে ডাইরীর পাতা খুলে যখন হিসাব-নিকাশ করছিলাম, তখন দেখলাম, এই একমাসে প্রায় পঞ্চাশ রকম নূতন ধরণের মাছ ও মেরুদণ্ডহীন জলজ প্রাণীকে খুঁজে পেয়েছি। ক্যাটালিনা দ্বীপের চারপাশের জলস্তরের নীচে তারা মনের সুখে খেলে বেড়াচ্ছে। ফুলসাজে সজ্জিত জলজ গুল্ম ছোট-বড়, এমনভাবে জলস্তরের নীচে রয়েছে, দেখলেই হয়ত ভাববেন মাটির উপরে কোনও পুষ্পোদ্যানে রয়েছেন।

আশ্চর্য্য, মাটির উপরের প্রাণীদের মতন সমুদ্রতলের ঋতু বদলের পালাও জলজ জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে? ঋতু পরিবর্তন বা জায়গার অবস্থানের হেরফেরে জলজ জীবনের চালচলনও দেখলাম বদলে যাচ্ছে। আশ্চর্য!

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশে আমি দেখেছি জলজগুল্ম সমুদ্রতলের ৬০০ ফুট নীচেই জন্মায়। কিন্তু যেখানে জল অনেকটা স্বচ্ছ, জলের উত্তাপ কম, এমন ঠাণ্ডা নদীস্তরে এই জলজ গুল্মদের দেখেছি ১৫০ ফুট জলতলের কাছাকাছি। কিন্তু এই ক্যাটেলিনা দ্বীপের চারপাশে দেখছি জলজগুল্ম জন্মাচ্ছে মাত্র ৬০ ফুট জলতলের নীচে। এর নীচে ক্রমেই জলজ উদ্ভিদ, গুল্ম কমে কমে একদম অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মজার ব্যাপার, সমুদ্রতলে আবার জলজ গুল্মদের দেখতে পাচ্ছি।

ক্যাটেলিনা দ্বীপের চারপাশে সমুদ্রতলের এই জলজগুল্ম অন্বেষণের কাজ বেশ কয়েক মাস চালাতে হবে দেখছি। বুঝেছি, ক্যাটেলিনা দ্বীপ আমায় মায়ায় বেঁধে ফেলেছে।

বুঝতে পারছি আমাদের প্রচেষ্টায় অনেকেই বেশ উৎসাহ পাচ্ছেন। তাই তিনমাসের মাথায়, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাহায্যের প্রস্তাব এল। নামী বিজ্ঞানী সংস্থা ক্যালিফোর্নিয়া অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্স সাহায্য করতে চাহিল। টাকাও চাই। নানান যন্ত্রপাতিও চাই। তাই সাহায্য নিতেই হোল। কিন্তু সমস্যা হোল, দু-একজন মেরিন-বাওলজিষ্ট চাই, সহকারী হিসাবে। কথাটা বাজারে চাওর হতেই পেয়ে গেলাম দুজন দুরন্ত সহকারীকে। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরিন বাওলজিষ্টের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্র জেমস-কোয়েব আর অ্যালেকজানড্রা জোউগ্‌-হগ্‌লুনড্‌। ক্যাটেলিনা মেরিন সায়েন্স সেণ্টার তার লেবোরেটারী ব্যবহার করার অনুমতি দিল আমাদের।

সাহায্যের বহর দেখে ফটোগ্রাফার বন্ধু আমায় ক্ষেপাবার সুযোগটা নিয়ে নেয়। বলে—কিহে বন্ধু, অভিমান, গেল এবার? চারদিক থেকেই যে দরাজ হাতে সাহায্য আসছে? তোমার কাজের মূল্য তবে বুঝছে জনতা?

মুচকি হাসি। বলি—স্যরি অ্যাল। সেদিন ঐ রিমার্ক না করাই উচিত ছিল। সত্যিইতো, কি করছি না করছি সেটা না জানলে অন্য বিজ্ঞানীরা, সাধারণ মানুষেরা এগিয়ে আসবে কেন ?

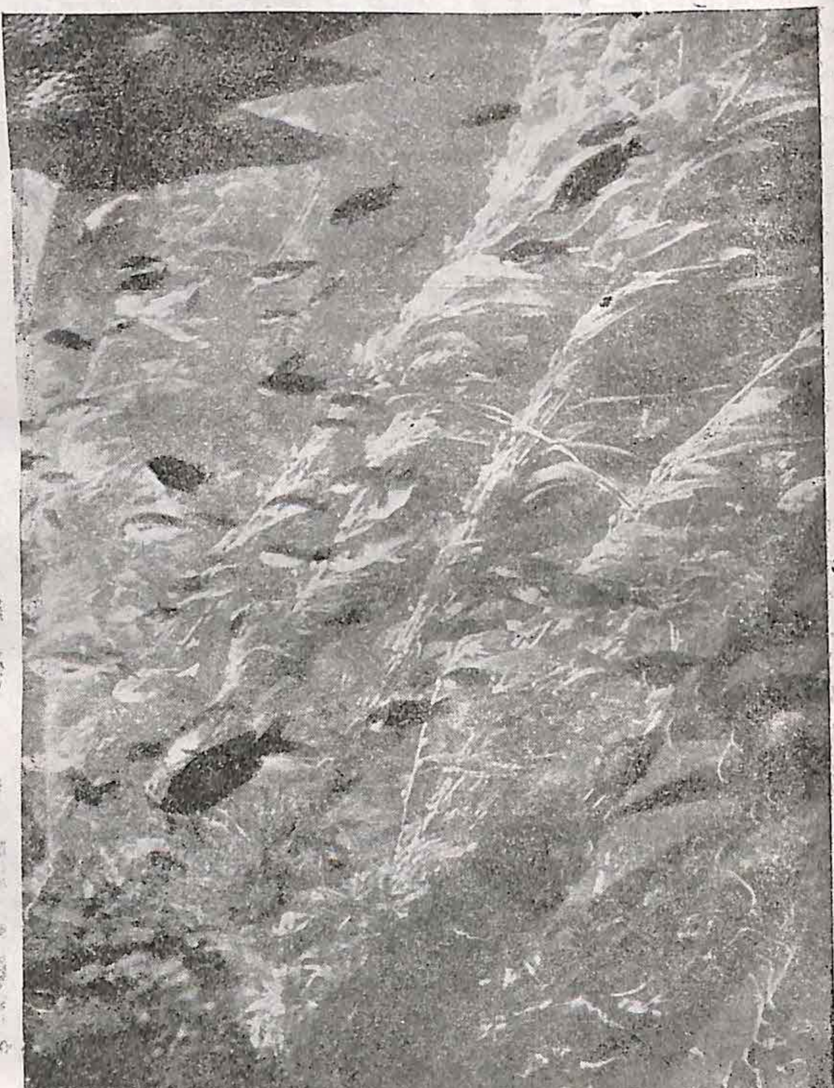
এরপর দারুণ উৎসাহে কাজ শুরু হয় আমাদের দু-বন্ধুর। আমি আর অ্যাল প্রতিদিন ডুব দিতে থাকি সমুদ্রতলে, ক্যাটেলিনার সমুদ্রতলের কেলপ ফরেস্ট রাজ্যে। আমি সংগ্রহ করি জলজ প্রাণীর প্রকৃতি, জলজ-গুল্মের নমুনা। আর অ্যাল তুলে আনে বিচিত্র রকম সব ছবি। আমরা ঠিক করি একবছর ধরে চালাব এই পরীক্ষা। বছরের ঋতু পরিবর্তনে সমুদ্রতলেও কি তার প্রভাব পড়ে, এটাও হবে আমাদের পরীক্ষার বিষয়। ক্যাটেলিনার সামুদ্রিক ভারসাম্যর পুরো ছবিটা এমনি করেই তৈরী করব, এটাই তখন আমার প্রোগ্রাম হয়ে দাঁড়ায়।

ভাবি, ক্যাটেলিনার মানুষেরা এখনও জানে না, তাদের চারপাশে সমদ্রের জলজগুল্ম, জলজপ্রাণী কি ভয়ঙ্কর ভাবে বেড়ে উঠছে। এর প্রভাব ক্যাটেলিনায় মানুষদের পক্ষে, তীরভূমির পক্ষে ভাল কি মন্দ সেটাও খতিয়ে দেখতে হবে আমাকে। অজ্ঞ-অজ্ঞ মানুষদের এখনই সজাগ করা দরকার। তারা জানুক তার চারপাশে কি ঘটছে, ঘটতে চলেছে। এখনই স্যাণ্টা ক্যাটেলিনার অপূর্ব পরিবেশকে, তার চারপাশের সমুদ্রতলের পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। পরীক্ষা চালাতে চালাতে শীত এল। বন্ধ হোল সমুদ্রতলের অভিযান।

এরপর আমি আর অ্যাল, শীতের শেষাশেষি আবার সমুদ্রে নামতে শুরু করলাম। স্যাণ্টা-ক্যাটেলিনার একপ্রান্তে নিমজ্জিত-পাহাড় বার্ড-রক থেকে এবার শুরু করলাম পরীক্ষা।

পৃথিবীর সব সমুদ্রের ঠাণ্ডা জলে যেমনটি দেখা যাও এখানেও ঠিক তাইই দেখলাম। এখানেও সামুদ্রিক মাছরা জলজ-গুল্ম খেয়েই বড় হচ্ছে। আবার জলজ-গুল্ম, সমুদ্রতলে নানান খুদে খুদে বস্তু আর কিছু অমেরুদণ্ডী জলজপ্রাণী থেকেই জোগাড় করছে তাদের খাদ্য। জলতলে, অদ্ভুদভাবে জলউদ্ভিদ আর জলজপ্রাণী এমনি ভাবেই ধরে রেখেছে সামুদ্রিক ভারসাম্যকে। আমি দেখতে চাই ঠিক কোন জলজ-উদ্ভিদ খেয়ে বাঁচছে ঐসব জলজপ্রাণী। আবার সঠিক কোন ধরণের খাদ্য খেয়ে বড় হচ্ছে জলজউদ্ভিদরা। কে কোন খাদ্যপ্রানের উপর বেঁচে থাকে, সেটাই খুঁজে বার করার চেষ্টা করছি সমুদ্রতলে। এখানেই প্রথমে দেখলাম ছোট্ট সমুদ্র—খরগোস, চকচকে মসৃণ-চামড়ায় ঢাকা ড্র্যাগন, খোলসহীন ও খোলসসহ শামুক জাতীয় প্রাণী। ভারী মজা লাগল যখন ছোট্ট সামুদ্রিক খরগোসরা বেছে বেছে খেতে লাগল শুধু লাল-লাল রঙের শেওলা। অর্থাৎ সমুদ্র খরগোসরা লাল রঙটাকে পচ্ছন্দ করে বুঝতে পারলাম।

বন্ধু অ্যাল বলল—সিলভিয়া, ব্যপারটা দাড়চ্ছে এই লালচে রঙের শেওলা জাতীয়



জলতলে অদ্ভূদভাবে জলজউদ্ভিদ আর জলজপ্রাণী ধরে রেখেছে
সামুদ্রিক পরিবেশ ভাবসাম্য।

অ্যালগীদের ধারকাছেই সমুদ্র খরগোস, বা, ঐ জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণী থাকছে, তাইতো ?

—হ্যাঁ, সে রকমই দাঁড়াচ্ছে অ্যাল। সেভাবেই রেকর্ড রাখছি। বার্ড-রকে কাজ করতে গিয়েই দারুণ ফলাফল পেলাম। সমুদ্রতলে যে এত অফুরন্ত খাদ্য ভাণ্ডার আছে তাকি আগে জানতাম? পরীক্ষার মেরিন বাওলজিষ্ট জেমস কোয়ের জানাল সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম একহাজার পাউণ্ড জলজ-গুল্ম থেকে রূপান্তর প্রক্রিয়া মাধ্যমে খাদ্যপ্রাণ জোগাড় করে এক পাউণ্ড মাংসাশী জলজপ্রাণী। টুনা আর কড্ জাতীয় মাছের সৃষ্টি হয় এমনি ভাবেই।

খবরটা শুনে ফটোগ্রাফার বন্ধু অ্যাল বলল—প্রয়োজনীয় টুনা, কড্ এইসব দামী মাছদের বাঁচিয়ে রাখতে কতটা জলজগুল্ম লাগবে তার একটা হিসেব পেয়ে ভাল হোল সিলভিয়া। সমুদ্রতলে কতটা জলজগুল্মকে রক্ষা করা দরকার, আমাদের প্রয়োজনেই, এবার তার ছবি দুনিয়াকে জানানো যাবে, কি বল ?

—বটেইতো অ্যাল। তাইতো জানা দরকার খুশীমতো সমুদ্রতলে কিছু করাই মানেই সমুদ্র দুনিয়ায় বিপর্যয় আনা। জান, জেমস কি জানিয়েছে? আট বছর লাগে ঐসব দামী মাছদের সঠিক মাপে বড় হোতে, অথচ তার আগেই ওদের তোলা মানেই সমুদ্রতলে জলজ-উদ্ভিদ জগতের জংগল সৃষ্টি করা।

—কেন ? জলজ-উদ্ভিদের জংগল হবে কেন সিলভিয়া ?

—বাঃ, হবে না ? জলজ-গুল্ম ইত্যাদি থেকেই ছোট্ট জলজপ্রাণী বাঁচবে। আর তাদের খেয়ে বাঁচবে বড় মাছেরা। কিন্তু মাছই যদি না থাকল তবে জলজগুল্ম ইত্যাদি খাবে কে? সমুদ্রতলে ভয়ংকর জংগল তৈরী হবে না ? আর সেই জংগলের লতা-পাতা পচে সমুদ্রতলে সৃষ্টি হবে এক দূষিতজগত, ঠিক পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে যেমনটি হচ্ছে তেমনি ভাবেই। ভেবেছ, কি ভয়ংকর ব্যাপারটা ?

—তাইতো? ভাবিয়ে তুললে সিলভিয়া।

—আরে, সেই ভাবনা থেকে মুক্তির পথ খুঁজতেই তো সমুদ্রতলে আমাদের নামা, সেট ভুলছ কেন ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাইতো।—সহজ হয় অ্যাল।

এমনি করেই সমুদ্রতলে চলতে লাগল আমাদের পরীক্ষা। ক্রমে এল বসন্তকাল। এল মে মাস। দেখতে দেখতে যে একটা বছর আমরা হয়ে গেছি স্যাণ্টা ক্যাটেলিনা দ্বীপে খেয়ালই হয়নি। ডাইরীর পাতাই জানাল বছর পরিক্রমা শেষ। সমুদ্রতলে এক বছরের ঋতু বদলের রেকর্ড নথীভুক্ত আমাদের। হিসাব-নিকাশের সারাংশ তৈরী করলাম আমরা, মেরিন-বাওলজিষ্ট জেমস ও আলেজজানড্রাকে নিয়ে।

পরীক্ষায় বিস্ময়কর ব্যাপার দেখতে পেলাম। ৩০ থেকে ৬০ ফুট সমুদ্রগভীরে, ক্যাটেলিনা দ্বীপের চারপাশের ডুবো পাহাড়ের গায়ে নূতন জলজ-উদ্ভিদের রাজ্য তৈরী হচ্ছে। দিনে তারা প্রায় দুফুট করে বেড়ে উঠছে। এর নীচে ৬০ থেকে ১২০ ফুট গভীর সমুদ্রতলে কেলপ জাতীয় জলজ-উদ্ভিদরা হু-হু করে বেড়ে উঠছে আকাশের দিকে। ফলে জলজ প্রাণীদের ডিম আর শাবকরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এক বছরেই তাদের আগের আশ্রয়স্থল থেকে। অর্থাৎ, জলজ-উদ্ভিদের বিস্ময়কর সমুদ্ররাজ্য দখলের ফলে জলজ-প্রাণীরা ভয়ংকর বিপদের মুখে এসে দাঁড়াচ্ছে।



জলজ উদ্ভিদরা সমুদ্রতলে দু ফুট করে বেড়ে উঠছে দিনে।

এই এক বছরের সালতামামিতে দেখলাম বার্ড-রকের চারপাশে যেমন অজস্র কেলপ জাতীয় উদ্ভিদ আছে তেমনি আছে ১৩০ রকমের প্ল্যানকটন জাতীয় জলজ-উদ্ভিদ। হিসেব কষে দেখিয়েছে এই মেরিন বাওলজিস্ট জেম ও আলেকজানড্রা যে সালোক সংশ্লেষের ফলে বছরে হাজার হাজার টন খাদ্যবস্তু তৈরী হচ্ছে এখানের এই সমুদ্রতল থেকেই। ৭৫০ ধরণের মাছ ও অমেরুদন্ডী প্রাণীকে দেখলাম আমরা এই স্যান্টা ক্যাটেলিনার সমুদ্রতলে। যা বুঝলাম, তাতে দেখছি একটি কেলপ জাতীয় জলজ-উদ্ভিদের থেকে পাঁচলক্ষ ক্ষুদ্রকার জলজ-প্রাণী বাঁচতে পারে। কেলপের এই অসামান্য প্রাণশক্তি জোগানোর ক্ষমতা দারুণ বিস্ময়ের, মানতেই হোল।

জিম বলল,—স্যার, এতদিন যা দেখলাম, তাতে স্মরনীয় বাওলজিষ্ট চার্লস ডারউইনের ১৮৩৪ সালের বিখ্যাত উক্তিটা মনে পড়েছে। ডারউইন বলেছিলেন, কেলপ উদ্ভিদের সঙ্গেই সমস্ত রকমের প্রাণীজগতের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। সমুদ্রতলে যদি বিচরণ করা যায়, তবে সমুদ্র-গুল্মের অপূর্ব ক্ষমতা আমরা জানতে পারব। স্যার, এই এক বছর সমুদ্রতলে পরীক্ষায় আপনি কেলপ-গুল্মের অদ্ভুত ক্ষমতার কথাতো দেখলেন।

— সত্যি, কেলপ-গুল্মের জন্যই এমনভাবে প্রাণজগত-উদ্ভিদজগৎ গড়ে উঠতে পারে ভাবতেই পারিনি। আমার মনে হয়, স্যাণ্টা ক্যাটেলিনার সমুদ্রজগৎ মেরিন বোটানিষ্টাদের স্বর্গ।—বিস্ময়ের স্বরে বলি আমি।

আমার কথা শুনে মেরিন-বাওলজিষ্ট আলেকজাণ্ড্রা বলে—ডারউইন সাহেব আর একটু দামী কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে একটি দেশের সমস্ত জংগল ধ্বংসে হলেও যত রকমের প্রাণী মারা যাবে, তার চেয়েও বহু-বহুগুণ প্রাণী মরবে এই সমুদ্রতলের কেলপের জলজ গুল্ম ধ্বংস হওয়ায়। কিন্তু স্যার, সবচেয়ে দুঃখের কথা, আজ তাইই ঘটতে চলেছে। দক্ষিণ কালিফোর্নিয়ার কোষ্টলাইনের নীচে, কেলপের রাজ্য আজ প্রায় শেষই হয়ে গেল সমুদ্রদূষণের ফলে।

—ঠিকই বলেছ আলেকজাণ্ড্রা। পরিবেশ দূষণ ভয়ংকর বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে আমাদের। অতলান্ত সমুদ্রের গভীরে কি আছে না আছে মানুষ কতটাই বা খেয়াল রাখছে। তাই দূষণের ভয়ংকর আক্রমণ সমুদ্র রাজ্যেই চলছে বেশী। তাই সমুদ্রতলের জগত কি, মানুষকে দেখাবার জন্যই এই পরীক্ষা নিরীক্ষা।

—স্যার, একটা কথা বলব? কেমন দ্বিধাগ্রস্থ গলায় বলে জিম।

—এত দ্বিধা কেন? বলনা কি বলবে?—হেসে আশ্বস্ত করি জিম কয়ারকে।

—সমুদ্র দুনিয়ার প্রাণ-প্রাণীদের বিগত হাজার হাজার বছরের ছবিটাই যদি না জানেন, যদি না জানেন ভারসাম্যের অভাবে কত জলজ প্রাণী-প্রাণ উদ্ভিদ কেন হারিয়ে গেল, তাহলে আজ যেসব প্রাণ-প্রাণী বেচে অছে তাদের বাঁচার পথও বার করতে পারবেন না। আর তা জানতে হলে ডারউইন সাহেব যেখানে শুরু করেছিলেন তার কাজ, সেখানেই যেতে হবে আগে।

—কথাটা মন্দ বলনি জিম। ঠিক, এবার তবে ডারউইন প্রথমে পরীক্ষা যেখানে শুরু করেছিলেন সেখানেই আমাদের সেকেন্ড এক্সপেরিমেণ্ট ক্যাম্পিং হবে। কিন্তু সেই জায়গায়টা কোথায় সঠিক আমি জানিনা। তবে ওখানকার কোনও বিজ্ঞানী যদি সাহায্য করতেন সুবিধে হোত। এ ব্যপারে তোমাদের সংস্থার কোনও সাহায্য পাব জিম ?

—পাবেন স্যার। আপনাকে এখান থেকেই যোগাযোগ করিয়ে দেব স্যাণ্টা-ক্রুজ আইল্যাণ্ডের চার্লস ডারউইন রিসার্চ ষ্টেশনের সঙ্গে। এছাড়াও ইকোয়েডোরিয়ন ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিস ষ্টেশনের সঙ্গেও যোগাযোগ করলে কাজের সুবিধে হবে। আপনাকে যেতে হবে গ্যালপোগোস্ দ্বীপে। কোষ্টা রিকার দক্ষিণে, পানামা হয়ে যাবেন কলোম্বিয়ায়। কলোম্বিয়ার ঠিক দক্ষিণেই হচ্ছে ইকুয়েড়ার—ম্যাপে জায়গাটা বুঝিয়ে দেয় জিম।



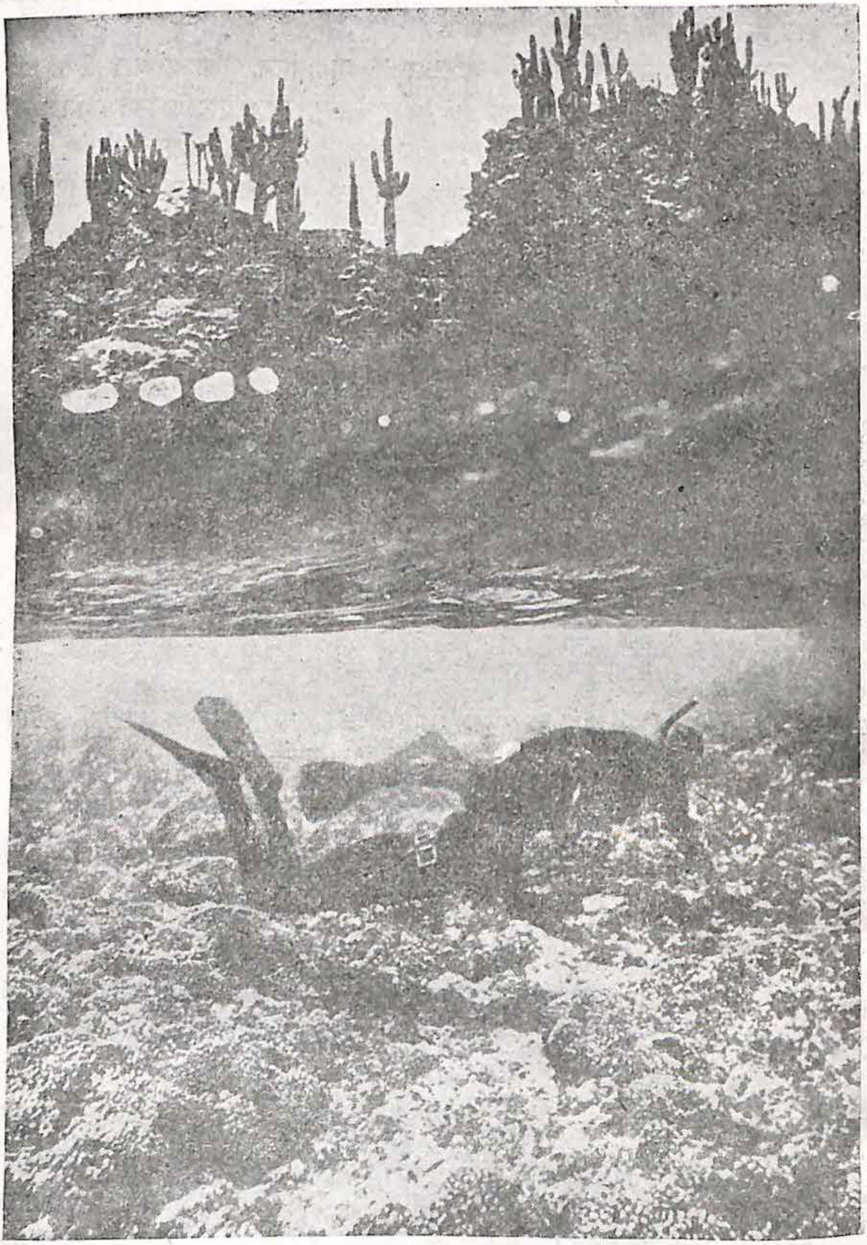
গ্যালপগাস দ্বীপে ডারউইন রিসার্চ ষ্টেশন

—দেখলেনতো স্যার, ইকুয়েডার কোথায় ? এই ইকুয়েডর থেকে হাজার কিলোমিটার প্রশান্ত মহাসাগরের ভিতরে গেলে, বিষুবরেখার উপরেই পাবেন গ্যালপোগোস্ দ্বীপ। ওখানে গিরারর্ড ওয়েলিংটনের সঙ্গে দেখা করুন। ভদ্রলোক আপনাকে সাহায্য করবেন। সব যোগাযোগ ব্যবস্থাই করে দিচ্ছি আমাদের সাউথ ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির রিসার্চ ষ্টেশন থেকে।

—থ্যাঙ্ক ইউ জিম। তোমাদের এখানে সবরকম সাহায্যের জন্য তোমাকে, আলেকজাণ্ড্রাকে, তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ শাখাকে অজস্র ধন্যবাদ।

অ্যাল আর আমি আজ বেশ কিছুদিন হোল আস্তানা গেড়েছি গ্যালপোগোস দ্বীপে।

তিন হাজার বর্গমাইল জুড়ে পাহাড়ী দ্বীপ, প্রকৃতির অপূর্ব দান। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে
সৃষ্টি হয়েছিল এই স্বল্পপরিসর দ্বীপপুঞ্জ।
প্রশান্ত মহাসাগরের নানান ধরণের জলস্রোতের মধ্যিখানে, বিষুবরেখার উপর এই
দ্বীপেই আজ প্রায় দেড়শ বছর আগে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, তরুণ ইংরেজ নিসর্গ বিজ্ঞানী
চার্লস ডারউইন আবিষ্কার করেছিলেন, কেমনভাবে জলজ প্রাণী আর উদ্ভিদ, একে
অন্যের উপর নির্ভর করে বাঁচে। তিনি অবিষ্কার করেছিলেন তার বিখ্যাত তত্ত্ব
"এভলিউশন অফ ন্যাচারেল সিলেকশন"।
এই দুর্দান্ত গ্যালপোগোস দ্বীপেই ১৯৫৯ সালে ন্যাশনাল পার্ক সৃষ্টি হোল।
দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা এখানে আসতেন, দেখতেন, বিচিত্র রকমের প্রাণী ও উদ্ভিদের
সমাহার। আমরা এখন সমুদ্রতলে গিয়ে দেখতে চাই সেদিনের সেই প্রাণী ও উদ্ভিদের
কতটা পরিবর্তন হয়েছে, কতটা ক্ষয়ক্ষতি, কতটা ব্যাপ্তি হয়েছে।
গিরারর্ড ওয়েলিংটন আর তাঁর নিজস্ব ফটোগ্রাফার ডেভিড ডবিলেটের স্ত্রী অ্যানা
আমাদের পেয়ে ভারী খুশী হোল। অ্যানা হেঁসে বলল—যাক, আমাদের মত
পাগল তাহলে আরও কিছু আছে দেখছি।
কথাটা শুনে হাসি সবাই। আমি বলি—সমুদ্র যাকে একবার টেনেছে তার মুক্তি
আছে সেই সম্মোহনী আকর্ষণ থেকে? আর সমুদ্রতলের স্বপ্নরাজ্যে একবার যারা
ডুব মেরেছে তাদের তো মরনকাল পর্যন্ত সমুদ্রতলেই বারবার ডুব দিয়ে সমুদ্রতলের
রহস্য খুজতেই হবে ম্যাডাম।
—রাইট। দারুণ কথা বলেছেন সিলভিয়া। এইতো, কিছুকাল আগে, সটান
দুবছর ছিলাম এখানে। আবার দেখুন, তার কিছুদিন পরে আবার চলে এসেছি।
আসল কথা কি জানেন, যতবার এই গ্যালপোগোস দ্বীপের চারপাশে সমুদ্রতলে
নামছি, নূতন নূতন অভিজ্ঞতা হচ্ছে। এখানের চারপাশে, প্রশান্ত মহাসাগরের নানান
মুখী জলস্রোতে, জলজপ্রাণী যেমন চলাফেরা করতে পারে এমনটি আর কোথাও
পারে না।
আমরা সমুদ্রতলে নামতে লাগলাম সব খবরাখবর নেবার পর। লক্ষ্য করলাম ঠাণ্ডা
পেরুস্রোত পূব থেকে পশ্চিমে বয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমে এই ঠাণ্ডা পেরুস্রোত নাম নিচ্ছে
দক্ষিণ বিষুবীয় জলস্রোতে। শীতল জল পছন্দ করে যেসব জলজপ্রাণী, তারা আরামে
এই পেরুস্রোত ধরে পূব থেকে পশ্চিমে চলাফেরা করছে। নানান ধরণের বিভিন্ন রঙের
কত যে বিচিত্র মাছ দেখতে পেলাম এখানে তার ফিরিস্তি দিলে আপনারা চমকে যাবেন।
আমার ডাইরীর পাতা আর বন্ধু অ্যালের অ্যালবাম সেই বিচিত্র বর্ণের মাছের ছবিতে
ভর্তি হয়ে উঠল কিছু দিনের মধ্যেই।
একদিন আমি, অ্যানা ডাউবিলেট আর ফটোগ্রাফার বন্ধু সমুদ্রতলে ঘুরছি, নূতন কি
পাই, না পাই, দেখবার জন্য। আর তখনই দেখলাম সেই অপূর্ব দৃশ্য। কোর‍্যালের



কোর‍্যাল রাজ্যের উপর দিয়ে আমরা সাঁতরে বেড়ালাম।

বিস্তীর্ণ ভূতল ছড়িয়ে আছে সমুদ্রতলে। কতক্ষণ যে কোর‍্যাল রাজ্যের উপর দিয়ে আমরা সাঁতরে বেড়ালাম বলতে পারব না। ইংরেজ নিসর্গবিজ্ঞানী ডারউইনের রেকর্ডে এই অপূর্ব কোর‍্যাল জগতের কথা কিন্তু পাইনি আমরা।

অ্যানই কথাটা ধরিয়ে দিল,—সিলভিয়া, এই কোর‍্যাল পুঞ্জকে এর আগে ডারউইন সাহেব দেখতে পান নি, তারমানে, এই দেড়শ বছরে তৈরী হয়েছে এই কোর‍্যাল জগত।

ভাবি। তারপর বলি,—না অ্যান, তা নয়। সে সময়ে সমুদ্রতলে এতক্ষণ ধরে চলাফেরা করার মত যান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল না। তাই ডারউইন এর খবর পান নি। কি বিস্তীর্ণ, অজস্র, অসংখ্য কোর‍্যালের সমাহার। একি দেড়শ বছরে সৃষ্টি হোতে পারে? নাঃ, তা নয়। তবে একটা কথা, এই কোর‍্যালদের ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। এখানের বিভিন্নমুখী জলস্রোত থেকে ঠাণ্ডা-গরম দুধরণের প্রয়োজন উত্তাপ ও স্থিতি পায় কোরালরা। তাই নিশ্চিন্তে কোর‍্যাল এখানে জন্মায়। ফিরে আসি সমুদ্রতল থেকে নূতন দেখার বিস্ময় নিয়ে। কোর‍্যালজগতের কথা লিপিবদ্ধ হয় আমার ডাইরীতে।

গ্যালপোগাসের সমুদ্রতলে এরপরে দেখতে পেলাম দুরন্ত দেখতে ষ্টার-ফিস্। গুল্ম-পরিবেষ্টিত সমুদ্রতলের উপরে তারা মনের সুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপর দেখলাম বিরাটকায় অদ্ভূত চেহারার রাক্ষুসে চিংড়ি। রাক্ষুসে চিংড়ি ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরছে সেখানে। এখানেই প্রথম দেখলাম প্রজাপতির পাখার মত বিচিত্র বর্ণের লিফ ফিস। আমাকে জানাল গিরারড, বহু আগে, প্রশান্ত মহাসাগরের সমুদ্রতলেই এই লিফফিস দেখা গিয়েছিল, স্যান-স্যালভেডরের কাছে। পরিবেশের হেরফেরে এরা সেখান থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বহু বহু বছর পরে আবার দেখা গেল এদের এই পূব-প্রশান্ত মহাসাগরে গ্যালপোগাস দ্বীপপুঞ্জের কাছে। চমৎকার ঘটনা।

—সত্যিই, গিরারড, যত দিন যাচ্ছে নূতন নূতন বিস্ময়ের জগৎ খুলে যাচ্ছে আমার কাছে। প্রথমে যখন স্যাণ্টা-ক্যাটেলিনা দ্বীপের কাছে, প্রশান্ত মহাসাগরে ডুব দিয়েছিলাম, সমুদ্রতলের ঐ জগতকে দেখে ভেবেছিলাম অপূর্ব। কিন্তু আজ এই গ্যালপোগাস দ্বীপের প্রশান্ত মহাসাগরের রহস্য মনে হচ্ছে দুরন্ত, অবর্ণনীয়।

এরপর কদিন ডুব দিলাম উত্তরের দিকে। এবারে আলাপ হোল প্রাচীন ও বিজ্ঞ মেরিন বাওলজিষ্ট ও ডাইভার ফিডি অ্যাংগার মেয়ারের সঙ্গে। গ্যালপোগোসের উত্তরে, প্রশান্ত মহাসাগরের জলতলে দেখলাম অপরূপ নূতন ধরণের ট্রপিক্যাল-ফিস। গ্রীষ্ম-দেশীয় অঞ্চলের উত্তাপ এখানের জলতলে। নাম না জানা এসব মাছরা ভালবাসে উষ্ণ জলপ্রবাহ, বুঝতেই পারলাম। কিছু কিছু মাছের নামকরণ করা হোল। তারপর অ্যাল ফটাফট ক্যামেরায় ধরে নিল ওদের ছবি। অ্যালের অ্যালবাম যে দারুণ অমূল্য সম্পদ হয়ে উঠছে, বুঝতেই পারছি।

এরপর গ্যালপোগাস দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে বড় দ্বীপ রেডোণ্ডা রকের থেকে পরীক্ষা

শুরু হোল আমাদের। ভূখণ্ড থেকে চব্বিশ কিলোমিটার দূরে, এখানের জলে, ঠাণ্ডা আর উষ্ণ দুধরণের জলস্রোতের মিলন ঘটছে। পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে দুরন্ত ফেনা ছেয়ে যাচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠ। একটু উপর থেকেও নীচের সমুদ্রতল ভাল করে দেখাই যাচ্ছে না। জেলী-ফিস ধরণের অদ্ভুত মাছ সমুদ্রতলে ছড়িয়ে আছে।

অ্যানকে বল্লাম—দেখতো ম্যাডাম, এখানে, এইস্তরে জলের তাপটা কত।

অ্যান সঙ্গে সঙ্গেই জলের উত্তাপ মেপে নিয়ে বলল—"আরে! এখানের উত্তাপও ৬৫° ডিগ্রী। ঠিক পশ্চিম দিকের জলের উত্তাপের মতই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যেসব জলজ-প্রাণী এখানে দেখছি তা কিন্তু গ্যালপোগাসের পশ্চিমের সমুদ্রে দেখা প্রাণীর মত নয়।

সেদিন সমুদ্রতলে ঘুরতে ঘুরতে পৌছালাম ট্যাগাস কোভে। এখানের সমুদ্রভূতলে বাদুড়ের ঢঙ্গের মাছ দেখলাম। বাদামী রঙ্গের লাভাবালুর উপরে এই বাদুড়ে মাছেরা খেলে বেড়াচ্ছে। ছুঁচলো মুখ, দুপাশ চওড়া, বিস্তৃত পাখনা, টুকটুকে লাল ঠোট, এক দারুণ জলজ প্রাণের খবর পেলাম এখানে। দেখলাম, এই বাদুড়ে মাছগুলো ভীষণ আলসে। বেশীর ভাগ সময়ই সমুদ্রতলে বাদামী বালুস্তরের উপর শুয়ে থাকে। মাঝে মাঝে যেন ঘুম ভাঙ্গে এমনিভাবে পাখনা ঝটপট করে জলের উপর ঘুরে আসে, আবার ঝিমিয়ে পড়ে বালির বুকে।

মোটামুটি দেখছি, প্রতিদিনই কিছু না কিছু নূতন প্রাণীজগতের সন্ধান পাচ্ছি এই গ্যালপোগাস দ্বীপের চারপাশের সমুদ্রতলে।

পরের দিন আমাদের অনুসন্ধানের জায়গা ঠিক হোল এসপিনোসা-পয়েণ্ট। এখানের জলতলে নেমেই আমরা চমকে উঠি। বাপরে! একি! এযে নাগরাজ্য! কত রকমের কত ধরণের সাপ। জলজ সরীসৃপজাতীয় প্রাণী ইগুয়ানারা যে এত রকমের হোতে পারে ভাবতেই পারিনি।

সমুদ্রতলে দাঁড়িয়ে ভাবছি। হঠাৎ অ্যাল চেঁচিয়ে উঠল,—সিলভিয়া, কেয়ারফুল! সামনে তাকাও। ভয়ংকর জন্তুটাকে দেখ।

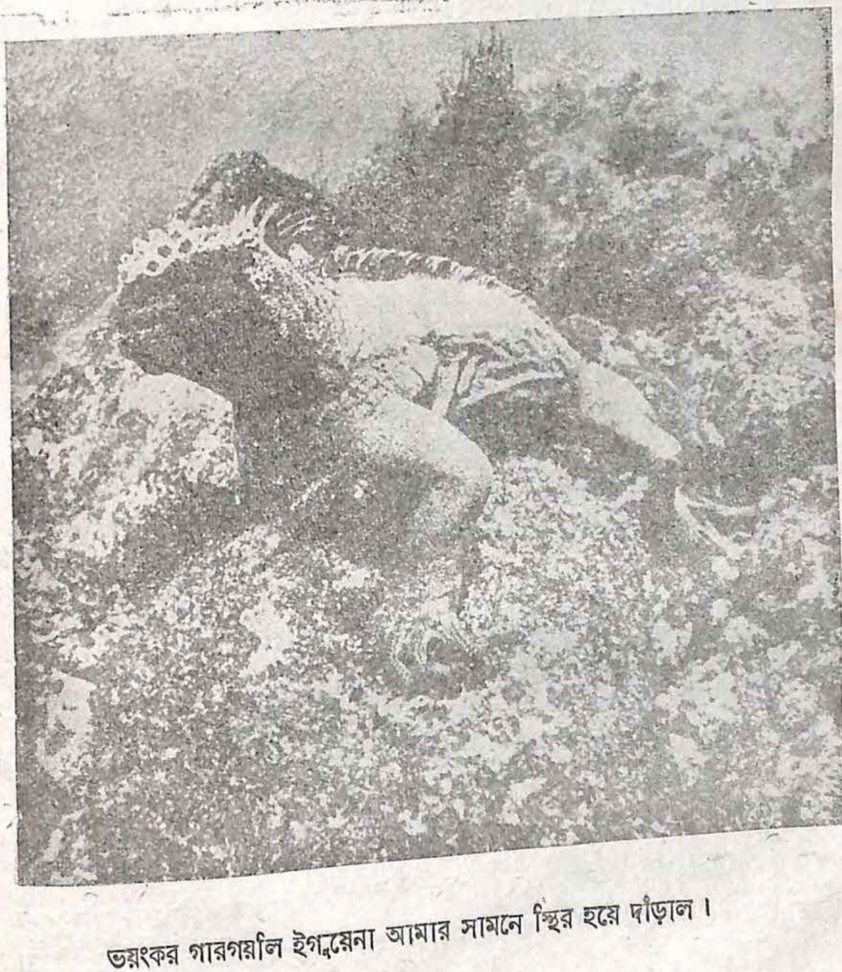
সামনে তাকিয়েই একলাফে পেছিয়ে আসি। আমার দিকে চোখ তুলে এগিয়ে আসছে বিশ্রী চেহারার বিরাট সরীসৃপজাতীয় ইগুয়ানা। মুখে শব্দ করছে, গরগর-গরগর।

অ্যানা বলে উঠে,—জলজ-প্রাণীদের যদি আঘাত না করেন এরা তাহলে কিছু করবে না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন। দেখুন, কি করে। পালাতে চাইলেই দুরন্ত বেগে ছুটে এসে আক্রমণ করবে।

অ্যানের কথায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। ভয়ে বুক দুরদুর করছে। এই বুঝি ভয়ংকর মেরিন ইগুয়েনা আমায় আক্রমণ করে, এমনি শংকা আমার চোখে মুখে।

জলজ-প্রাণীটা গরগর করে সামনে এল। আমার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ পরে গরগর শব্দ বন্ধ হোল। ফিরে গেল প্রাণীটা।

অ্যান বলল,—দেখলেন, যেই বুঝল আপনার থেকে ভয় নেই, রাগ কমল ওটার। গরগর শব্দ বন্ধ হোল। এদের বলতে পারেন "গারগয়লি ইগুয়েনা" অর্থাৎ গরগর শব্দকারী জলজ সরীসৃপ।
সেদিন নানান ধরণের ইগুয়েনার অন্বেষণে দিনটা কেটে গেল। অ্যান আর অ্যাল হিসেব-নিকেশ করে দেখল প্রায় আড়াই হাজার রকমের ইগুয়েনা ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে। অ্যান বলল—একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন। এই গারগয়লি ইগুয়ানাকে অনেকটা ছোট সাইজের ড্রাগনও বলা যায়! লক্ষ্য করুন, দশ পনেরো মিনিট জলের তলে মাটি বালির উপর শরীরটাকে টেনে টেনে চলে। তারপর দম নেয় কিছুক্ষণ। আবার চক্কর মারা শুরু করে। ওর লেজের ঘর্ষণের দাগ বালি জুড়ে কেমন বিচিত্র নক্সা এঁকেছে দেখুন একবার।



ভয়ংকর গারগয়লি ইগুয়েনা আমার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

—তাইতো ! ওয়াণ্ডারফুল ! মনে হচ্ছে কোনও শিল্পী বালির উপর নক্সা এ'কে রেখেছে ।
ধীরে ধীরে আমরা এগুতে থাকি সমুদ্রতলের বালির স্তর দিয়ে গারগয়লি ইগুয়ানার দিকে । হঠাৎ গিরারডের ক্যামরাম্যান ডেভিড ফিসফিস করে বলে-লুক ! দারুণ ছবি ! ইগুয়ানা কেমন করে এপাশ ওপাশ মাথা দুলিয়ে সমুদ্রতলের গুল্ম ছিড়ে ছিড়ে আরামে চিবুচ্ছে । দারুণ রান্না আমরা যেমন তড়িয়ে তড়িয়ে খাই ওর খাবার ঢঙটাও দেখছি সেরকম ।
—আচ্ছা, ইগুয়ানারা শুধু সমুদ্রতলেই হে'টে হে'টে বেড়ায়, না সাঁতরাতেও পারে ?— হঠাৎ অ্যাল বোকার মত প্রশ্নটা করে ফেলে ।
হেসে ফেলি আমি । মেরিন-বাওলজিষ্ট গিরারড্ ও ফিডিও হাসে । ফিডি বলে— নাহে, ক্যামেরার সাটার টিপে টিপে মগজ থেকে বুদ্ধি বস্তুটাই লোপ হয়ে গেল দেখছি। সমুদ্রতলে যাদের বাস তারা সাঁতার জানবে নাতো জানবে কে ? একটু ধৈয্য' ধর, দেখবে সাঁতার জানে কিনা ? মনে রেখো, এই ইগুয়ানারা দারুণ ছটফটে । হয় চক্কর মেরে মেরে ঘুরবে নয়ত সাঁ-সাঁ করে জলে সাঁতরে বেড়াবে, চুপটি করে বসে থাকার বান্দা নয় ওরা ।
হঠাৎ দেখতে পাই সামনে থেকে একটা ইগুয়ানা সাঁ করে সাঁতরে উপরে উঠল । তারপর চার পা আর লম্বা লেজটা এপাশ-ওপাশ দুলিয়ে সমুদ্রের মধ্যে সাঁতরে অন্য-দিকে চলে গেল ।
—বাপরে ! দারুণ সাঁতার কাটেতো এরা ।—অবাক গলায় বলে ফটোগ্রাফার ডেভিড ।
—স্পীড দেখেছেন গিরারড্ ? দুরন্ত ।
—শুধু স্পীডই নয় ডেভিড, এই ইগুয়ানাদের দারুণ অনুভূতি আছে । এই যে দেখছ সাঁতরাচ্ছে, এমনি সময়ে যদি বুঝতে পারে দূরে বিপদজনক কোনও জলজ শিকারী বা মানুষই বসে আছে ওর জন্য ও'ৎ পেতে । তখন মুহূর্তে গতি বদলে ডুব দেবে অন্য দিকে । এর জন্য হাঙ্গররাও এদের ধরতে পারে না ।
—বাঃ, থার্ড সেনসতো দারুণ এদের ।—হেসে বলি ।
—হ্যাঁ সিলভিয়া । জলজ প্রাণীদের এই তীক্ষ্ম অনুভূতি আছে বলেই সব বিপদ থেকে ওরা নিজেদের বাঁচাতে পারে । কিন্তু পারে না দূষণের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে । সমুদ্রের জলতলে দুষিত তেলের প্রাদুর্ভাব, সমুদ্রবক্ষে নানান বৈজ্ঞানিক সম্পদ আহরণের ক্ষুধা, সব মিলিয়ে এই জলজপ্রাণী, জলজ-উদ্ভিদদের আজ বিপন্ন করে তুলছে ।—আক্ষেপ ঝরে পড়ে বিজ্ঞ, বৃদ্ধ মেরিন বাওলজিষ্ট ফিডি অ্যাংগার মেরারের কণ্ঠে ।
—সমুদ্রতলের জগতকে রক্ষা করতে পারলে পৃথিবীরই যে মঙ্গল সে কথা বোঝাবার জন্যইতো নেমেছি কাজে । মানুষ জানে না, কত প্রাণ, কত উদ্ভিদ, কত সম্পদ ছড়িয়ে

ছিটিয়ে আছে সমুদ্রতলে। যদি জানত তখন নিশ্চয়ই এভাবে সমুদ্রকে বিষাক্ত করত না।—ফিডিকে বোঝাতে চাই আমি। মানুষযে নির্দয় হিংস্র আক্রমনকারী নয় সে বিশ্বাস আনতে চাই বৃদ্ধ ফিডির মনে।
বৃদ্ধ মেরিন-বাওলাজিষ্ট ফিডি হাঁসে। বলে—ভায়া, নতুন বয়স। চোখে নূতন উৎসাহ। তাই বুড়ো মানুষের কথায় বিশ্বাস করছ না। করবে, দিন যাক বুঝবে, প্রকৃতির উপর মানুষের মত এমন হিংস্র লুণ্ঠন আর কেউ করেনি। প্রকৃতি জলে স্থলে অন্তরীক্ষে এমনভাবে তার প্রাণ ও প্রাণীজগতকে বেধে রেখেছে যে তারা আপনাথেকেই প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে ভারসাম্য আনছে। কিন্তু সেই সুনিয়ন্ত্রিত প্রকৃতির ভারসাম্যকে ছিড়ে-খুড়ে দিচ্ছে মানুষেরাই।—কথা বলতে বলতে বৃদ্ধ বিজ্ঞানী ফিডি উত্তেজিত হয়ে উঠে।
—জানি ফিডি, সবই জানি। তবুও মানুষের কাছেই দরবার করতে হবে, তাদের বোঝাতে হবে যাতে এই ভুল পথ পরিহার করে তারা।—আমি বোঝাবার চেষ্টা করি ফিডিকে।
—আই উইস্ ইউর সাক্সেস ফ্রেন্ড। হলে ভাল। তবে নিরাশ হলে ভেঙ্গে পোড়ো না। চেষ্টা করতে করতে হয়ত সত্যিই মানুষের একদিন সুবুদ্ধি হবে। সমুদ্র, লুণ্ঠনের রাজ্য মনে হবে না। দুনিয়ার বর্জ-ত্যাক্ত পদার্থকে ফেলবার এক বিশাল ডাষ্ঠবিন মনে হবে না। আমি সেই আগামী ভবিষ্যতের দিকেই তাকিয়ে বসে থাকতে চাই সিলভিয়া। তোমরা চেষ্টা কর সমুদ্র-পরিবেশকে বাঁচাতে। আমার শুভেচ্ছা সবসময়েই থাকবে তোমাদের সঙ্গে।

কেন জানি, বৃদ্ধ মেরিন বাওলজিষ্ট ফিডি আমায় দারুণ ভালবেসে ফেলেছেন। আর সত্যি বলতে কি বলতে লজ্জা নেই, এমন কাজ-পাগলা জ্ঞানী বিজ্ঞানীর সঙ্গ পাওয়ার জন্য আমি পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই এখন যেতে পারি।
পরপর কয়দিন এখন বেরুচ্ছি ফিডির সঙ্গেই।
ফিডিই একদিন বললেন —দেখি, আবার একবার এসপিনোসো পয়েন্ট ধরে সমুদ্রতলে নামতে হবে। থাকার কথা তাদের কিন্তু কৈ, দেখছি নাতো তাদের? তিনচার বছর এখানে আসিনি। এরমধ্যেই মানুষের আক্রমনে তারা নিঃশেষ হয়ে গেল?
ফিডির কথাশুনে অবাক হই। বিস্ময়ের সুরে বলি,—কারা নিঃশেষ হোল স্যার? কাদের কথা বলছেন?
—নামোতো সমুদ্রে। যদি ভাগ্য সহায় হয়, মানুষ তাদের ধ্বংস করে না থাকে, দেখবে তাদের।—চুপ হয়ে যান বৃদ্ধ বিজ্ঞানী ফিডি। বিড়বিড় করে কিছু হিসাব নিকাশ করেন। তারপর বলেন—হ্যাঁ ঠিক, এই সময়েইতে সে বছর এসেছিলাম।

১৯৭৭ সালেই তোএসেছিলাম। আজ ১৯৮১ সাল। চার বছরে একদল প্রাণী ধুয়ে মুছে হারিয়ে যাবে? নাঃ, নাঃ, তা হয় না। হয় তারা আছে, নয়ত জলজ পরিবেশের মধ্যে কিছু অসুবিধে দেখে প্রশান্ত মহাসাগরের অন্য কোনও শান্ত নিবিড় সমুদ্রতলে আস্তানা গেড়েছে।

—স্যার—

—কথা নয়, চলোতো।—প্রায় ধমকেই চুপ করিয়ে দেন আমায় ফিডি।—আজ সমুদ্রতলে গিয়ে এব্যাপারটার ফয়সলা করতে হবে।—দুজনেই নেমে পড়ি সমুদ্রে। আমাদের পিছনে গিরারড আর অ্যান নামে সমুদ্রে। সবশেষে দুই ক্যামেরাম্যান অ্যাল আর ডেভিড।

সমুদ্রবুকে সাঁতারে নীচে নামছি। সামনে চলেছেন ফিডি। এধার ওধার, বিস্তৃত অনেকটা জায়গায় সমুদ্রতলে ঘুরছি। পরশমণি খোজার মত দুচোখ দিয়ে কি যেন খুঁজে চলেছেন ফিডি।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক খুঁজলেন ডক্টর ফিডি। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন,-—আহ! বেবিস আর দেয়ার। ওরা তবে শেষ হয়ে যায়নি! দেখ হে সিলভিয়া, দেখ অ্যান গিরারড্, একটু দূরে কারা সমুদ্রতলে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

আমরা স্থির হয়ে দেখতে থাকি। ধীরে ধীরে সমুদ্রতলের বালুস্তরের পা রাখি।—মাইগড্! একি! সমুতলের বেলাভূমিতে পেঙ্গুইন পাখী! তবে সাইজে খুব ছোট, এই যা-। ঠাণ্ডা ভূপৃষ্ঠ ছেড়ে সমুদ্রতলে নেমে এল কেন এরা?—অবাক হয়ে প্রশ্ন করে ফিডিকে।

—ওদের লক্ষ্য কর। একটু পরেই বুঝবে ভূপৃষ্ঠ ছেড়ে সমুদ্রতলে নামল কেন?—হেসে বলেন ফিডি।

অবাক চোখে মিনি সাইজের জলজ গ্যালপোগাস পেঙ্গুইনদের দিকে তাকাই। মিনি পেঙ্গুইনরা মাঝে মাঝে ছুটে যাচ্ছে, সাঁতরে ধরে আনছে সমুদ্রে ভাসমান ছোট ছোট মাছ। তারপর মনের সুখে খাচ্চেছ।

—স্যার, এই অপর্যাপ্ত মাছের খাদ্যভাণ্ডারের জন্যই কি ধীরে ধীরে সমুদ্রতলে নেমেছে এরা?

—হ্যাঁ, ঠিক। ঠাণ্ডা ও কোলাহলহীন শান্ত পরিবেশ এদের পছন্দ। কিন্তু মানুষ সে সব জায়গাতেই হানা দিয়েছে। ফলে সমুদ্রের পৃষ্ঠে এদের খাদ্যের অভাব দেখা দিতে লাগল। কি করে আর বেচারারা! ডাঙ্গা ছেড়ে এদের কেউ কেউ নেমে পড়ল সমুদ্রে। তারপর নিরিবিলি শীতল এই সমুদ্র তলদেশ ওদের পক্ষে যথার্থ বাসস্থান মনে হওয়ায় এই পেঙ্গুইনরা এখানেই রয়ে গেল। তবে সূর্যের আলোর অভাবে এরা সাইজে খাটো হোল। তাহলেতো বুঝলে সিলভিয়া, মানুষই এদের গৃহহারা করেছে। পারবে কি সিলভিয়া, এই সব প্রাণীদের তাদের নিজের ভূখণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে?

নিশ্চুপ হয়ে থাকি। সত্যিই, যা বললেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী ফিডি, তার জবাব কিন্তু আমার হাতে নেই।

ফিডি বলেন,—যাক, এদের দেখে বড় ভাল লাগল সিলভিয়া। একটা জলজপ্রাণী, একধরণের জলজ-উদ্ভিদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, ভাবলেই বুকের মধ্যে কি কষ্ট হয় বুঝতে পারবে না। চেষ্টা কোরো তোমরা এর প্রতিরোধের জন্য।—বিনীত অনুরোধ ফিডির।

এরপর ফেরার পালা। ফেরার পথেই দেখলাম আশ্চর্য জলজপ্রাণী সি-লায়নস্। ভারী আশ্চর্য ধরণের জলজপ্রাণী।



তিন সি-লায়নসের মেজাজী বিশ্রাম

—কেমন দেখছ সিলভিয়া? এমন প্রাণী দেখেছ আগে?—হেসে বলেন ফিডি।

—নাঃ। এমন অদ্ভুত প্রাণী যে হয় ভাবাই যায় না।

—আশ্চর্য ব্যপার কি জান, জলের মধ্যেই এই সি-লায়নসেরা প্রয়োজনীয় পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি করে। তার কারণ, বেশী উত্তাপ, বেশী ঠাণ্ডা কোনটাই এদের পছন্দ নয়। বড় মেজাজী জলজপ্রাণী। তাই না?

—ঠিকই স্যার। যতই দেখছি ততই অবাক হচ্ছি। সমুদ্রতল শুধুই রহস্যভরা।

—হবেই তো সিলভিয়া। ডারউইন দেড়শ বছর আগে যত প্রাণী ও উদ্ভিদের হিসেব রেখে গেছেন তার থেকেও আজ কত নূতনতর প্রাণী ও উদ্ভিদের দেখা পাচ্ছি। অবশ্য নিশ্চিহ্নও হচ্ছে অনেকেরা। গ্যালপোগাস দ্বীপের চারপাশে, প্রশান্ত মহাসাগরের গভীর জলে আজও ছড়িয়ে অছে অজস্র অজানা প্রাণীজগত।

—সত্যি। মনে হচ্ছে গ্যালপোগাসেই আজীবন থেকে যাই। অজানা এই জগতের শেষ নেই, অন্ত নেই।

হাসেন ফিডি।—অজানা প্রাণের সন্ধানে যদি যেতে চাও, তবে আরও রোমাঞ্চকর জায়গা আছে। তুমি তবে যাও মিয়ামী-বীচের কাছে, ফ্লোরিডায়। দেখবে, সমুদ্র-তলের জগতের অপার কত বিস্ময় আছে সেখানে।

—কিন্তু স্যার, ওখানে গেলেই কি হবে? পরীক্ষা-নিরীক্ষা কি চালাতে দেবে সেখানে?—বিব্রত কণ্ঠে বলি।

—দাঁড়াও, ইনট্রোডাকশন-চিঠি দিয়ে দিচ্ছি। ওখানে আছে আমার বন্ধু ডঃ জেসী হোয়াইট। ভালমানুষ। সব সাহায্যই পাবে।

—থ্যাঙ্ক ইউ ফিডি।

—তোমাকেই ধন্যবাদ ভাই। সমুদ্রতলের পরিবেশকে বাঁচাতে যেভাবে তুমি কাজে নেমেছ, তাতে তোমাকে সবভাবে সাহায্য করতে পারলেই খুশী হব। এরকমভাবে কিছু বিজ্ঞানী যদি নেমে পড়ত কাজে, সমুদ্র তবে বিপর্যয়ের হাত থেকে বেঁচে যেত। যাও ভাই, ফ্লোরিডার।

এরপরই চলে আসি আমি আর অ্যাল গ্যালপোগাস থেকে ফ্লোরিডায়।

ফিডি অ্যাংগার মেয়ারের চিঠি পেয়ে দারুণ খুশী হলেন প্রফেসর হোয়াইট। বললেন,—সিলভিয়া, এসেছ ভালই হয়েছে। তবে, ফ্লোরিড়ায় এই সমুদ্র-পরিবেশের যা অবস্থা তাতে জলজপ্রাণী, জলজগুল্ম আজ ধ্বংসের মুখে এসে গেছে। দেখার মত তেমন কি আর আছে এখানে।

—কিন্তু প্রফেসর, ফিডি যে বলেছিলেন আপনি এখানে দেখাতে পারবেন সমুদ্রতলের অপার বিস্ময়।

—বিস্ময়! হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুধু একটাই বিস্ময় আছে এখানে। বলতে গেলে, পৃথিবী-জুড়ে সমুদ্রে যত বিস্ময়কর জলজপ্রাণী আছে এটা তার মধ্যেই অন্যতম। দেখতে চাও সেই প্রাণীকে?

—হ্যাঁ প্রফেসর।—উত্তেজিত হয়ে উঠি প্রফেসরের কথা শুনে।

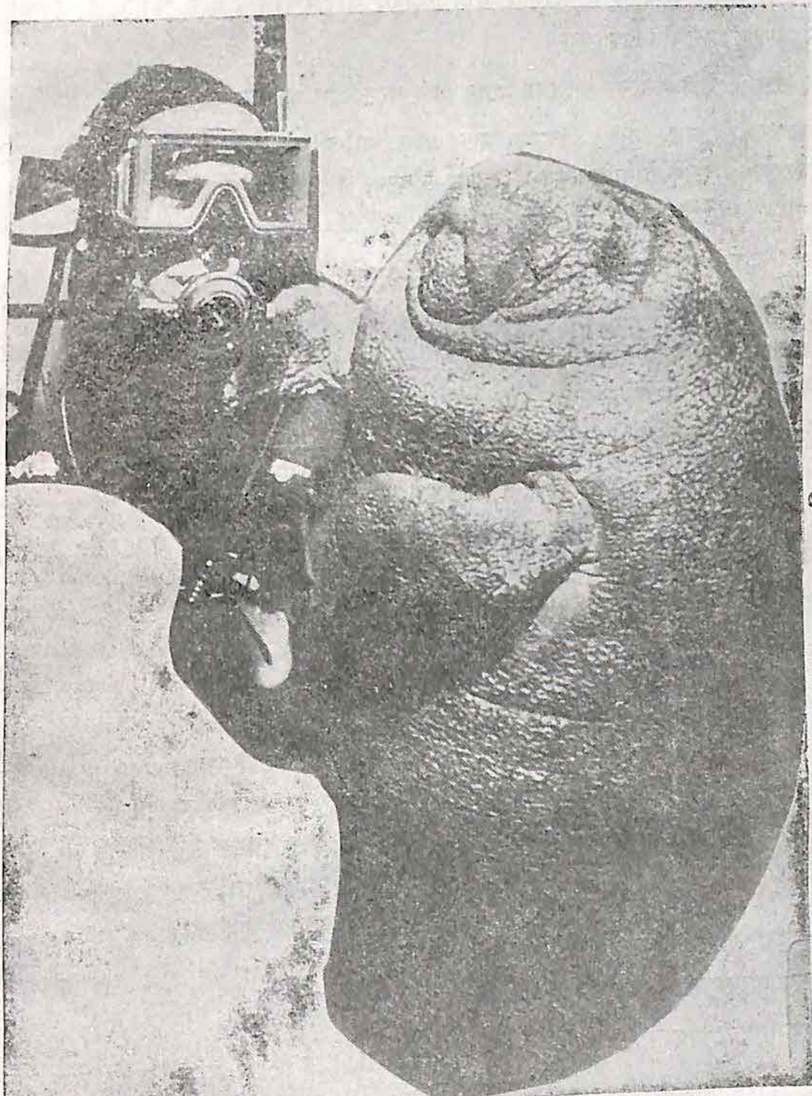
—বেশ, কাল তোমাকে নিয়ে যাব সেই সমুদ্রতলে, যেখানে মনের সুখে খেলা করছে ম্যানেটিরা।

—ম্যানেটি! এরকম প্রাণীর নাম তো শুনিনি প্রফেসর হোয়াইট?

—সব শুন কালকে সিলভিয়া। আজ বরং তুমি আর অ্যাল বিশ্রাম কর।

পরের দিন সকাল হতেই আমি আর অ্যাল হাজির হলাম প্রফেসর জেসি হোয়াইটের মিয়ামি সি-কোয়েরিয়ামে। আমাদের দেখেই বল্লেন,—কি হে, তোমাদের যে তর সইছে না দেখছি। এসো, আমার এই জলজ দুই বন্ধুর সঙ্গে আলাপ কর।

প্রফেসারের সি-অ্যাকোরিয়ামের কাছে এসে দেখলাম বিপুলকায় দুই জলজ-জন্তুর সঙ্গে প্রফেসর খেলা করছেন, অ্যাকেরিয়ামের জলের মধ্যে ডুবে। তাকিয়ে থাকি অদ্ভুত জন্তুটার দিকে।



এরাই হচ্ছে বিরাট জলজজন্তু ম্যামেটি

ম্যানেটিকে বলে ওয়েস্ট আফ্রিকান ম্যানেটি। এশিয়া, অস্ট্রেলিয়ায় যেসব ম্যানেটি পাওয়া যায় তারা একই ধরণের, এদের বলে ডুগং।

—প্রফেসর হোয়াইট, এই হাতির মত বিরাট চেহারার জলজ-জন্তু সমুদ্রতলে লুকিয়ে থাকে কি করে? চটপট নড়চাড়া করতে পারে কি?

—ঐ যে বল্লাম, শান্তিপ্রিয় জন্তু। নিরিবিলি জায়গা ভালবাসে। তাই চট্‌করে ভয়ে পালাতে চায়ও না, যায়ও না। আর কি বল্লে, হাতির মত বিরাট জলজন্তু? ঠিকই তাই। একদল মেরিন-বাওলজিষ্টদের মতে এরা হাতিরই মাসতুতো ভাই। আবার একদল বলেন, না, এরা গরুর খুড়তুতো ভাই। তাই কেউ কেউ একে বলে সি-এলিফেণ্ট, কেউ কেউ বলে সি কাউ। আর ওজন? দুটন মত হবে। লম্বাই আট থেকে ১৪ ফুট হবে। আর খায়? দুশো পাউণ্ড উদ্ভিদ দিনে।

—বাপ্‌স। এত খাদ্য চাই দিনে?—অ্যাল চমকে বলে।

—তাতো লাগবেই অ্যাল। শরীরের এক দশাংশ মত খাদ্য এদের শরীর ধারণের জন্য দরকার। কচুরিপানা এদের সেরা খাদ্য। জলে নামলেই তা দেখতে পাবে। যাক্‌, তত্বতো শুনলে অনেক। দেখবে নাকি, ম্যানেটি কেমন ভাবে সমুদ্র জলে ঘুরে বেড়ায়?

—নিশ্চয়। তার জন্যই তো ছট্‌ফট্‌ করছি।—খুশী গলায় বলি আমি।

—চল তবে।—প্রফেসর ডক্টর হোয়াইট আমাকে আর অ্যানকে নিয়ে চললেন সমুদ্রতলে।

ডুবুরী পোশাক এঁটে তিনজনেই নামলাম সমুদ্রে।—বাঃ, জলতো এখানে বেশ উষ্ম, ঠাণ্ডা নয়।

—হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ। ম্যানেটিরা একটু উষ্ণ জলেই থাকতে ভালবাসে। গভীর সমুদ্রে জলের উত্তাপ কম। তাই গভীর সমুদ্রে এরা থাকে না। ভূখণ্ডের গায়ে সমুদ্র অগভীর। সূর্যতাপে জল বেশ উষ্ণ থাকে। তাই খুশীমনে এখানেই আস্তানা গাড়ে এরা। এখানের জলের উত্তাপ হবে ৭০° থেকে ৭৫° ফারেনহাইট।

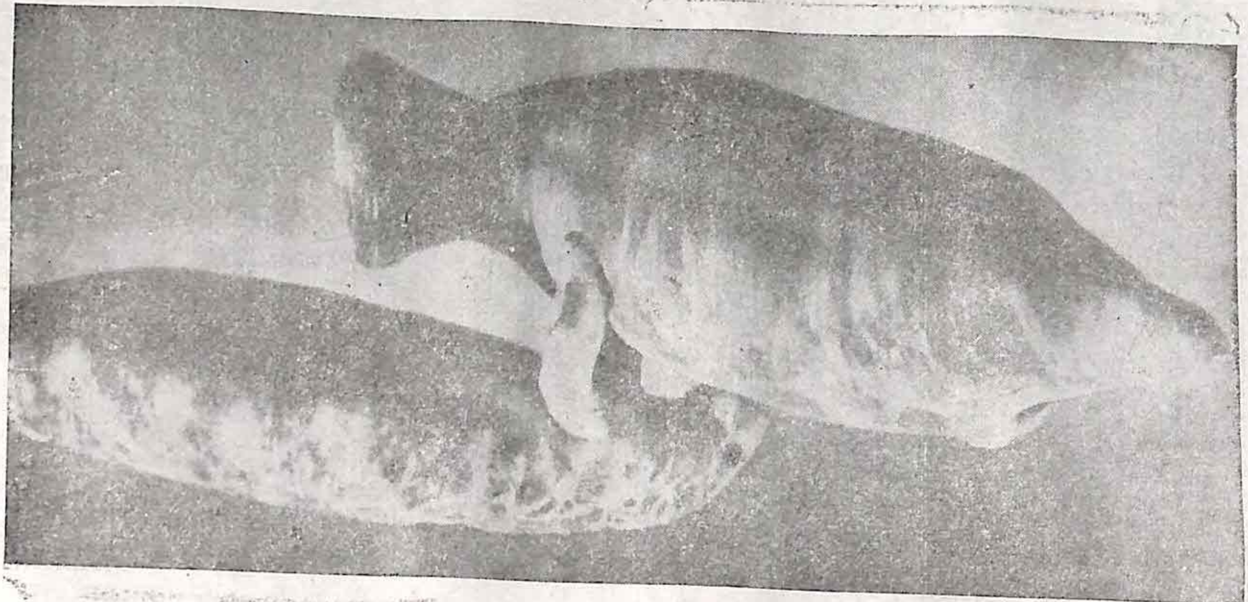
আমার সাঁতরে নীচে নামছি। হঠাৎ প্রফেসার আঙুল তুলে দেখাল,—ঐ দেখ, দুটো ম্যানেটি খেলে বেড়াচ্ছে।

তাকিয়েই বলে উঠে,—বিউটিফুল। বাচ্চা ম্যানেটি মা ম্যানেটির দুধ খাচ্ছে আদুরেভাবে। অ্যাল ক্যামেরা কাজে লাগাবে না?

আমার কথা শেষ হবার আগেই অ্যালের সাটার টেপা শেষ হয়ে যায়। ক্রীষ্ট্যাল-রিভারে দুই ম্যানেটির জল ক্রিড়া ধরা পড়ে অ্যালের ক্যামেরায়।

—এই বাচ্চা ম্যানেটিদের ছোট থেকে বড় হোতে প্রায় চার বছর সময় লাগে। ম্যানেটিরা দু-তিন বছর পর পর শুধু একটি করেই বাচ্চা দেয়।

প্রফেসারের কথার মাঝে বলে উঠি—আরে, মাঝে মাঝেই দেখছি ভুস্‌ করে জল ছেড়ে উপরে উঠে যাচ্ছে বাতাস নেবার জন্য। অনেকটা শুষুক জাতীয় প্রাণীদের মত।



বাচ্চা ম্যানেটি মা ম্যানেটির দুধ খাচ্ছে

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে। দশ-পনেরো মিনিট পরপর এরা অক্সিজেন নেবার জন্য জলের উপরে উঠে যায়। এই ম্যামেটি, যাদের ফ্লোরিডায় দেখতে পাচ্ছ, আমরা তাদের সবার নাড়ি-নক্ষত্র জানি। তাদের গতিবিধিও জানি। তাদের চেনা জানার জন্য প্রত্যেকের আলাদা আলাদা নামও দিয়েছি।

—তাইনাকি ? কিন্তু এদের সব খবরাখবর রাখেন কি করে ?—অবাক হয়েই প্রশ্ন করি।

—এদের লেজের সঙ্গে রেডিও-ট্র্যানজিষ্টার বেঁধে আমরা বার করছি কোথায় এরা ঘুরছে, কি করছে। এমনি করে সবারই হিষ্ট্রি রেকর্ড আমরা তৈরী করেছি। এইতো, শোন না কান দিয়ে। এখন যে ম্যামেটির সঙ্গে রেডিও ট্র্যানজিষ্টার বাঁধা তার নাম "হোহাই"। এখন ঘুরছে এই সেণ্ট-জনস-নদীর তলে, যেখানে আমরা ডুব দিয়েছি এখন।

কান পেতে শুনি। মনে হচ্ছে কি যেন চিবুচ্ছে। প্রফেসারকে জিজ্ঞেস করতেই বললেন —ওরা ফাঁক পেলেই একটু করে জলজগুল্ম, লতাপাতা চিবিয়ে নেয়। তাই এইশব্দ সবসময়েই পাবে।

আবার কান পেতে শুনি শব্দ। আস্তে আস্তে চলাফেরা করছে। ঘড়ির সঙ্গে হিসেব কষি। তিনমাইল ঘণ্টায় এই রেটে ওটা ঘুরছে। প্রফেসার বললেন—দুই থেকে চার মাইল ঘণ্টায় এরা ঘোরে। তবে বিপদ এলে, এরা বেশ দ্রুত পালাতে পারে। পিছনের গোদা লেজের ধাক্কায় চট্ চট্ করে ছুটে পালিয়ে যায়।

—আচ্ছা প্রফেসার, সত্যিই কি এই ফ্লোরিডায় সব ম্যানেটির হিসেব রাখতে পারেন আপনারা, সত্যিই তা কি সম্ভব হয়েছে ?—একটা দ্বন্দ আমার মনে থেকেই যায়।

—দেখ সিলভিয়া, আমরা যারা এই জলজ প্রাণীদের কথা ভাবি তাদের এই কঠিন কাজ করতেই হচ্ছে। কেমন করে এদের নজরে রাখি তার পদ্ধতিতো বলেছি। এখন সবার হিসাব রাখা সম্ভব কিনা সেইটাইতো প্রশ্ন ?

—হ্যাঁ প্রফেসর।

—জান, সমস্ত জলজ দুনিয়ায় আজ মাত্র কটা ম্যানেটি আছে ?

—না, জানি না। ম্যানেটিকে তো এই প্রথম দেখলাম। এর নামতো এই প্রথম শুনলাম।

—শোন তবে। সারা দুনিয়ায় মাত্র সাত-আটহাজার ম্যানেটি আছে। পঞ্চাশ বছর আগেও এদের সংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজারের মত। কি দ্রুতহারে এরা কমে যাচ্ছে, লক্ষ্য করেছ ?

—পরিবেশের বিপর্যয়েই এসব হচ্ছে বলছেন ?

—কিছুটা পরিবেশের দূষণের জন্য কিছুটা মানুষের লোভী বর্বর আক্রমনের জন্য।

—মানুষের বর্বর আক্রমন ?

—হ্যাঁ, তাইই। হাতির মত সাইজের এই ম্যামেলসের মাংস ভারী নরম, খেতেও সুস্বাদ। তাই হিংস্র লোভী মানুষেরা এদের মাংসের লোভে শিকার করে মাংস চালান দিচ্ছে। এদের ধংসের পথে এভাবেই নিয়ে এসেছে।

—আই সি ! সেজন্যই দ্রুত এরা শেষ হয়ে যাচ্ছে ?

—নাঃ, এর সঙ্গে আছে সভ্যতার কুফল। ভূখণ্ড ক্রমেই গ্রাস করছে সমুদ্র। সভ্যতার সৃষ্ঠ শিল্প-নগরী, জনপদের ত্যক্ত বর্জ পদার্থ, সমুদ্র জলকে করছে বিষাক্ত। সমুদ্রপথে জাহাজ-বোট-নৌকা চলাচলের ফলে ম্যানেটিদের শান্ত আশ্রয়স্থলে সৃষ্টি হচ্ছে অশান্তি। এছাড়া জাহাজ আর বোটের প্রপেলোর আঘাতে কত যে ম্যানেটির শরীর কেটে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে তার হিসাব নেই।—উত্তেজনায় ক্রমে রাঙ্গা হয়ে উঠেন প্রফেসর।

—কিন্তু এসব বন্ধের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া যায় না ?

—যায়। আজ তাইই করা হয়েছে। আজ শুধু ম্যানেটিকে মারাই বন্ধ হয় নি, ম্যানেটিরা যেখানে থাকে সেখান দিয়ে নৌচলাচলও বন্ধ আজ। অথচ ম্যানেটিরা কত প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে দেখে একটু পরেই দেখবে।

প্রফেসারের সঙ্গে সমুদ্রতলে নেমে আসি। প্রফেসার মুখ দিয়ে এক অদ্ভুত শব্দ করেন। ওমনি দেখি, একটু পরেই সমুদ্রতলের বালুতট দিয়ে এগিয়ে আসছে বিরাটকায় এক ম্যানেটি। প্রফেসর বলনে—এ হচ্ছে হোহাই। এর সঙ্গেই এখন আমার যোগ আছে রেডিও-ট্র্যানজিষ্টার মাধ্যমে। দেখ না, কি করে হোহাই।

ম্যমেটি হোহাই এসেই প্রফেসর হোয়াইটের ডানপাটা জড়িয়ে ধরে গড়িয়ে পড়ে। ঠিক যেমন পোষা কুকুর মনিবের পায়ে গড়াগড়ি দেয় তেমনি ভঙ্গী।

—নাইস ! চার্মি !—আবেগে খুশী চাপতে পারি না আমি।

—যাও না, গায়ে হাত দিয়ে দেখ, হোহাই কিছু বলবে না।

ভয়ে ভয়ে ম্যামেটি হোহাই-এর গায়ে হাত রাখি। বাপরে ! কি ঠাণ্ডা শরীর ! মাখমের মত মসৃণ, চুক্‌চুকে তৈলাক্ত চেহারা !

হোহাইএর গায়ে হাত দিতেই ও প্রফেসারকে ছেড়ে আমাকে চেপে ধরে। তারপর আমাকে নিয়ে সমুদ্রতলে গড়াগড়ি খায়।

হাঃ, হাঃ, হাঃ, হেসে উঠনে প্রফেসার—।—বুঝলে হে, হোহাইএর তোমাকে খুব ভাল লেগেছে। আচ্ছা বলত, তুমিও কি ওকে এখন ভালবাসছ না ?

—সত্যি, দেখতেই যা বিকট। তা না হলে আদর করার মতই নিরীহ প্রাণী।—নির্দিধায় বলি।

—অথচ দেখ সিলভিয়া এদেরই তোমরা মারছ, খাচ্ছ। ছিঃ।—ধিক্কার দিয়ে উঠেন প্রফেসর।

লজ্জায় মাথা নীচু করি।—সত্যিই, পরিবেশের বিপর্যয়ের মূল কারণ মানুষের আগ্রাসী লোভ। কিন্তু, কি করতে পারি আমরা কয়েকজন মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানী ? তবু চেষ্টাতো করছি প্রফেসর।

—জান সিলভিয়া, এই পরিবেশের বিপর্যয়ে আরও কত ক্ষতি হচ্ছে ? জলজ উদ্ভিদ-প্রাণীর সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রতলের বহু প্রাকৃতিক সম্পদও আজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।



ম্যামেটি হোহাই প্রফেসারের পা জড়িয়ে গড়াগড়ি দেয়।

—সমুদ্রতলের সম্পদ ? কেমন করে ? কোথায় ?—অবাক হয়ে বলি।
—এই ফ্লোরিডার সমুদ্রে এককালে ছিল অজস্র মুক্তা-ঝিনুক অয়েষ্টারদের বাস। যার থেকে পেত সাধারণ মানুষেরা ন্যাচারেল পার্ল। অথচ সেই অয়েষ্টাররা আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এখানে থেকে। এর ফলে কত আমেরিকান জহরত ব্যবসায়ীরা পথে বসেছে জান না। বলতে গেলে, পরিবেশ বিপর্যয়ই তাদের পথে বসিয়েছ।
—এ ব্যাপারে আমরা কি করতে পারি প্রফেসার ? পার্ল বিজেনেসে পরিবেশ বিজ্ঞানী বা মেরিন-বাওলজিষ্টার কি করবে ?
—তারাইতো সব করবে ? যে পরিবেশ হারানোর ফলে অয়েষ্টার-ঝিনুকেরা এখান থেকে চলে গেল, তাদের ফিরিয়ে আনার উপযোগী পরিবেশ তৈরী হোতে পারে। অয়েষ্টার ঝিনুকেরা প্রশান্ত মহাসাগর আর ভারতীয় মহাসাগরের বুকেই বড় হয়। আজ জাপান-চীন যারা কালচারড পার্ল তৈরী করছে তারা যদি কৃত্তিম পার্লের উপযোগী পরিবেশ বানাতে পারে, তবে সত্যি পার্লের উপযোগী সেই পুরোনো পরিবেশই কেন আমরা ফিরিয়ে আনতে পারব না ? সিলভিয়া, পরিবেশ নিয়ে সামগ্রিক চিন্তাভাবনা তুমি করছ, দেখ, কোনও রাস্তা দেখাতে পার কিনা ?
চিন্তা করি কথাগুলো। বলি,—পরিবেশ বিজ্ঞানীকে আর একটি ভাববার মত বিষয় দিলেন। বিশেষ চিন্তার খোরাক হোল এটা। তবে এই নিয়ে কিছু করতে গেলে মুক্তা নিয়ে যারা কারবার করছেন তাদের সাহায্য চাই।
—বেশ, সাহায্যের ব্যবস্থা করব। নিউইয়র্কের জেমস-ডিলার মোউরিশ শায়ার আমার জানাশুনা লোক। চিঠি নিয়ে যেও আমার। তোমাকে পেলে ও বোধ হয় খুশীই হবে। ও খুঁজে বেড়াচ্ছে এমন বিজ্ঞানীকে যার সাহায্যে আমেরিকার পার্লের হারানো আধিপত্য ও ফিরে পায়। তোমার পরীক্ষায় যদি আমেরিকান ন্যাচারেল-পার্লের অয়েষ্টাররা আবার ফিরে আসে তাদের পুরোনো দেশে, আমেরিকার প্রশান্তমহাসাগরের বুকে, সে তো ওরই লাভ। দেখো, কি হয়।
—ধন্যবাদ প্রফেসর হোয়াইট।—ফ্লোরিডা থেকে রওনা হই নিউইয়ার্কের পথে। পরিবেশ বিষয়ে সত্যিই এক নূতন গবেষণার বিষয় দিয়েছেন ডক্টর হোয়াইট।

নিউইয়র্কের ফিফথ্ এভিনিউএ দেখা করলাম জুয়েলার মউরিশ শায়ারের সঙ্গে। প্রফেসার হোয়াইটের চিঠি, আমার বক্তব্য শুনে বল্লেন,—দেখুন, যদি কিছু করতে পারেন আমরা খুশীই হব। চলুন, আপনাকে নিয়ে যাই রিচার্ড রয়টারের কাছে। উনি এখন "কালচারড্ পার্ল অ্যাসোসিয়েশন অফ আমেরিকার" প্রেসিডেণ্ট। শোনা যাক্, উনি. কালচারড পার্লই চান না, ন্যাচারেল পার্লকেই পছন্দ করেন। আমেরিকা কেন, আজ দুনিয়াতেই ন্যাচেরেল পার্লের দিন শেষ হয়ে গেছে ?
—সেকি ! লোকে ন্যাচেরেল পার্লকে চাইছে না ? কেন ?

—প্রথমে, কালচার্ড পার্ল দামে ভীষণ শস্তা। একে দরকার মত নানান্ রঙের করা যায়। যেমন, রূপালী, ক্রীম, পিংক, হলদে, সবজে, নীলচে বা কালো রঙের, যেমনটি চাই, তেমনিই বানাচ্ছে জাপানী কালচারড পার্লের প্রস্তুতকারকেরা।

—কিন্তু, ন্যাচারেল আর কালচারড পার্ল তো এক নয়? দামের যথেষ্ট হেরফের হতে হতে পারে, কিন্তু জিনিষের তো তফাৎ আছে।—বলি আমি।

—চলুন রিচার্ডের কাছে। বাকী কথা সেখানেই হবে।

আমরা আসি রিচার্ড রয়টারের কাছে। আমাদের সব কথা শুনে হাসলেন রিচার্ড। বললেন,—উদ্দেশ্য ভালই, কিন্তু সফল হওয়া মুস্কিল। জানেন, ১৯২০ সালে এই আমেরিকায় ছিল প্রায় তিনশ ন্যাচারেল-পার্ল-ব্যবসায়ী। ১৯৫০ সালে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ছয়-এ। আর আজ, একজনও নেই। সস্তায় মুক্তো পেলে দামী মুক্তো কি কেউ কেনে?

—কিন্তু দুটোর কোয়ালিটি তো এক নয়?

—না, ঠিক এক নয়। ন্যাচারেল মুক্তো আজীবনই ঠিক সেই রকমেই থেকে যাবে, একই ন্যাচারেল পার্ল হয়ে থাকবে, কারণ তার সম্পূর্ণটাই পার্ল দিয়ে তৈরী হয়। কিন্তু কালচার্ড-পার্ল ক্রমে ক্রমে ফ্যাকাশে হয়ে কাঁচের পুতির মত হয়ে যাবে, কারণ কালচার্ড পার্ল হচ্ছে গোলবিডের চারপাশে পাতলা পার্লের আস্তরণ ছাড়া ছিচ্ছু নয়। পার্লের আস্তরণ চলে গেলেই কাঁচের দানা হয়ে গেল ব্যাস।

—তবে? ন্যাচারেল পার্ল চলছে কেন?

—কারণ আজকে ন্যাচারেল-পার্ল পাবার মত সমুদ্র নেই। হাজার হাজার অয়েষ্টার থেকে পাওয়া যায় মুষ্টিমেয় কয়েকশো ন্যাচারেল-পার্ল। কিন্তু তার মধ্যে বেশীর ভাগই সঠিক গোল নয়, রঙও ফ্যাকাশে। অর্থাৎ হাজার অয়েষ্টার থেকে মাত্র কয়েকটা ন্যাচারেল-মুক্তো পাওয়া যাবে। কিন্তু কালচার্ড-পার্লের বেলায় সবই তো নিজেদের হাতের মুঠোয়। যেমনটি চাই তেমনটিই হচ্ছে।

—তবুও রিচার্ড, এই প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট হয়ে যাবে, সেটা কি ঠিক? আপনারা, ব্যবসায়ীরা যদি না চান তবে আমরা পরিবেশ বিজ্ঞানীরা, মেরিন-বাওলজিষ্টরা চেষ্টা করেও যদি ওয়েষ্টারদের বংশ বাড়িয়ে তুলি, তবুও তো ন্যাচারেল পার্ল মার্কেট পাবে না।

—সিলভিয়া, ন্যাচারেল পার্ল চিরকালই অমূল্য। তাই যদি না হোত তবে বিখ্যাত নায়িকা এলিজাবেথ টেলারকে তার স্বামী রিচার্ড বারটন ন্যাচারেল পার্লের নেকলেস প্রেজেন্ট করতেন না ৩৭ হাজার ডলার দিয়ে কিনে। আজ ওর দাম ছয় লক্ষ টাকা।

—মাই গড! ন্যাচারেল মুক্তোর এত দাম!

—নিশ্চয়। তাছাড়া ওই নেকলেসের নাম "লা-পারগ্রিনা"। ১৬ শতকে পানামায় এটা তৈরী হয়েছিল। তারপর ইউরোপীয়ন রাজন্যবর্গ, যেমন, মেরী টিউডর, ইত্যাদির

হাতঘুরে শেষে বিংশ শতাব্দীতে এলিজাবেথ টেইলারের কাছে এল। তাই বলছি, ন্যাচারেল পার্লের উপযোগী ওয়েষ্টারদের ফিরিয়ে আনলে আমরা সাগ্রহে গ্রহণ করব। দাম কোন সমস্যাই হবে না। কিন্তু যথেষ্ট পেতে হবে মুক্তো।

—ওয়েল রিচার্ড। তবে পরীক্ষার নামার আগে জানতে চাই, কালচরড পার্লের উপযোগী ওয়েষ্টার হচ্ছে কি করে?

—সিলভিয়া, জাপান শুরু করে প্রথমে কালচারড পার্লস। তবে আজ চীনও আজ আর পেছিয়ে নেই। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩০ সালে জাপান কালচাড পার্ল নিয়ে আসে দুনিয়ায়। জানেন বোধ হয়, অয়েষ্টারের মেণ্টাল টিসু থেকে রস ক্ষরিত হয়ে ঝিনুকের ভিতরে ছড়িয়ে গিয়ে মাদার-অফ-পার্ল তৈরী করে। অয়েষ্টার গোলাকৃতি মুক্তার সৃষ্টি করে। কিন্তু কি অবস্থায় এই রস ক্ষরণ করে অয়েষ্টার, সেটাই আবিষ্কার করে দুই জাপানী, মিকিমোটো, আর তার স্ত্রী উমি। আসলে তারা প্রথমে নুডল তৈরী করে বেচত। ব্যবসা চলল না। নামল ঝিনুকের বুকে মুক্তো সৃষ্টির পরীক্ষায়। ১৯০৫ সালে প্রথম সফল হোল। ১৯০৮ সালে তার পেটেন্ট নিল। ক্রমে ১৯৩০



কৃত্তিম পদ্ধতিতে সমুদ্রজলে অয়েষ্ঠার ঝিনুক কিভাবে
রাখা হচ্ছে মুক্তা চাষের জন্য।

সালে জাপানের কালচারড পার্ল দুনিয়া ছেয়ে ফেলতে লাগল। কেমন করে কালচারড পার্ল করে জানতে হলে জাপানি আর চীনের পদ্ধতিকে জানতে হবে।

—কালচারড পার্লের ক্ষেত্রে সব ওয়েষ্টারই কি মুক্তো দিচ্ছে?

—নাঃ, নাঃ, তা দেয় না। একশটার মধ্যে পঞ্চাশটা অয়েষ্টারই মরে যায়। মাদার-অফ-পার্ল তৈরীই করতে পারে না। ২০টা মত মুক্তো তৈরী করে। তবে সেগুলো সব জেম হবার উপযোগী নয়। মাত্র পাচ শতাংশ অয়েষ্টার থেকে জেমস্ হবার মত কালচারড পার্ল তৈরী হয়।

—কেমন করে কালচারড পার্ল করে দেখুন ছবিতে। তার আগে জেনে নিন, চীন ফ্রেস ওয়াটার পার্ল তৈরীতে দুনিয়াতে আজ প্রথম। ৫০ থেকে ৮০ টন বছরে ফ্রেস ওয়াটার কালচারড পার্ল বানাচ্ছে চীন। আর জাপানে, ১ কোটি ২০ লক্ষ অয়েষ্টার থেকে দুনিয়ার ৭৫ শতাংশ কালচারড পার্লের সাপ্লাই হচ্ছে। এবার শুনুন সিলভিয়া, কিভাবে হচ্ছে কালচারড পার্লস। প্রথমে ছবিটা দেখুন।

বিশেষ ধরণের ঝিনুক খোল প্রথমে জোগাড় করা হয়। এই অয়েষ্টার খোলের মধ্যে, খোলের মাপের উপর নির্ভর করে ১ থেকে ৬টা মটর দানার মত মুক্তা ধারক পদার্থ, নিউক্লি, রাখা হয়। এপ্রিল থেকে জুন মাসে, ঐ অয়েষ্টার খোল দুটো বন্ধ করে জলে নামিয়ে দেওয়া হয়। জলের উপর লম্বাই ভাবে বাঁশ ভাসানো থাকে। তারপর অয়েষ্টার খোলকে জলে ডুবিয়ে অন্য প্রান্তে বাঁশের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। দেড় বছর পরে, নভেম্বর থেকে জানুয়ারীর সময়ে যখন জল ঠাণ্ডা থাকে, সেই সময়ে, অয়েষ্টার খোলের মধ্যে মুক্তার রস আসে, পার্লের চিকনাই আসে। এরপর অয়েষ্টারগুলোকে তুলে অন্য শীতল পুকুরে রাখে আরও দেড় বছর। তিন বছরের মাথায় ওয়েষ্টারের মধ্যে কালচারড মুক্তো তৈরী হয়ে। এই হচ্ছে কালচারড মুক্তো তৈরীর নিয়ম। তবে ১৯৭৯ সালে, কালচারিং করার সময়, তিন বছরের জায়গায় দেড় বছরের কমিয়ে আনে জাপানি পার্লমেকাররা। তবে আজ ১৯৮৩ সালে সেই সময় আট-নয় মাসে কমিয়ে এনেছেন জাপানী পার্ল কালচারিষ্টরা।

মোটামুটি কালচারড পার্ল তৈরীর নিয়মটা বুঝলাম। কিন্তু মুক্তা-ঝিনুক অয়েষ্টারের মধ্যে রসক্ষরণ, মুক্তার জন্ম, এসব কিভাবে হচ্ছে সেটা পরিষ্কার নয়। তবে এটা বুঝছি, জাপানী আর চীনা মুক্তা-কালচারিষ্টরা মুক্তা সৃষ্টির পরিবেশকে বানিয়েছেন। আমরা যদি সেই পরিবেশ বানাতে পারি, ঝিনুকের বুকে আসল মুক্তাই জন্মাবে, কৃত্তিম মুক্তা নয়। ইতিহাস বলছে, সাধারণ নুডল বিক্রেতা মিকিমোটো শুধু অবৈজ্ঞানিক নিয়মে চেষ্টা করতে করতে, নকল মুক্তার সৃষ্টি করতে পেরেছিল। তাহলে, পরিবেশ বিজ্ঞানীরা আসল মুক্তা-ঝিনুকের বংশকে পুরানো পরিবেশে ফিরিয়ে আনতে কেন পারবে না। নানান্ চিন্তা নিয়ে ফিরে আসি আমি আর অ্যাল।

অ্যাল এর মধ্যেই ছবি তুলে নিয়েছে ফটো থেকে, কেমন করে অয়েষ্টররা সমুদ্রজলের

মধ্যে থোকা থোকা ঝুলে থাকে, ডুব দিয়ে সেই অয়েষ্টারদের নিয়ে আসে।



সমুদ্রজলে ঝুলে থাকা অয়েষ্টার খোল তুলে আনছে ডুবুরীরা

কদিন ধরে ভেবেই চলেছি। সামনে প্রশান্ত মহাসাগরের অদিগন্ত সমুদ্রের ছবি। ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়, আরে, তাইতো, স্থির জল, শীতল জল-প্রবাহ, এসবের পরিবেশ ম্যামেটির পছন্দ। ম্যামেটি থাকত ফ্লোরিডায়। সেখানে অয়েষ্টারও থাকত। অয়েষ্টর আর ম্যামেটি কেউ কারুর শত্রু নয়। চীন-জাপান ওখানে আছে ম্যামেটি। তারমানে, ম্যামেটি যেখানে থাকে, সেখানে, সেই পরিবেশে, মুক্তা-ঝিনুক অয়েস্টররাও বাঁচতে পারে। অন্তত চীন-জাপানের পরিবেশতো তাই বলছে। এটা যদি সত্যি হয়, তবে ফ্লোরিডায় সেই পরিবেশ সৃষ্টি করে পার্ল-অয়েস্টারদের বাঁচানো যাবে না কেন?

এরপর চলল আমার পরীক্ষা ফ্লোরিডায়। পরিবেশ বিজ্ঞানী হিসাবে এটা আমার কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াল। পরীক্ষা চলল দুবছর। শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ, শীতলজল, গুল্মহীন জলস্তর কি করে রাখা যায় তার প্রচেষ্টা চলতে লাগল। ম্যামেটি আর অয়েষ্টাররা একসঙ্গে স্বচ্ছন্দে থাকতে লাগল নুতন পরিবেশে। জলজগুল্ম ম্যামেটির খাদ্য বলে তারাই জলকে পরিষ্কার করতে লাগল জলজগুল্মকে খেয়ে। কিছু অয়েষ্টার জলে বড় হতে লাগল। দুটো বছর কেটে গেল। এবার অয়েষ্টার উঠানোর পালা। এখনই বুঝব এবার অয়েষ্টারের বুকে মুক্তা জন্মাল কিনা?

৯৮৫-র শেষে, ১৯৮৬ সালের জানুয়ারীতে অয়েষ্টার সেল, জল থেকে উঠালাম। ভাঙলাম খোলদুটো। আহ! হোয়াট এ প্লেজার। জন্মেছে! অয়েষ্টারের বুকে ন্যাচারেল পার্ল আবার জন্মেছে! পরীক্ষা তবে সফল।

ত্রিশটা অয়েষ্টার বুক থেকে আঠারোটা ভাল পার্ল পেলাম। কালচারড পার্লের চেয়ে সহস্রগুণ সুন্দর। কোন পরিবেশ অয়েষ্টারদের পার্ল তৈরীতে সাহায্য করল? ভাবতে বসি। তবে কি ম্যামেটি আর পার্ল অয়েষ্টাররা দুজনে দুজনের পরিপূরক বন্ধু। একে অন্যের জন্যে সৃষ্টি করে যথাযথ পরিবেশ? ম্যামেটি জলজগুল্ম, কচুরীপানা-জাতীয় জলজ-উদ্ভিদ খাচ্ছে, জলকে রাখছে স্বচ্ছ। বিশালকায় ম্যামেটির ছায়ায় বড় হচ্ছে অয়েষ্টারের ভিতরে পার্ল। অয়েষ্টারের গায়ে শেওলা অ্যালগি জমছে, ম্যামেটির খাদ্য হচ্ছে তারা। অপূর্ব! প্রায় হারানো দুই জলজপ্রাণী ম্যামেটি আর পার্ল-অয়েষ্টার আবার ফিরে এসেছে ফ্লোরিডার সমুদ্রের বুকে।

ফলাফল নিয়ে হাজির হই পার্ল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট ডেভিড রয়টারের কাছে।—আশ্চর্য! বলছেন, এই ন্যাচারেল পার্ল এখানেই হয়েছে!

পরীক্ষা করেন ডেভিড। অবাক চোখে তাকান। বলেন—সিলভিয়া, আপনি যে মিরাক্যাল করলেন? ফ্লোরিডার সমুদ্রের দামই বাড়িয়ে দিলেন হাজারগুণ। এই রকম মুক্তো, সহজভাবে, প্রকৃতির প্রভাবে যদি তৈরী হয় হাজারে হাজারে, তাহলে ফ্লোরিডার ইতিহাস যে নুতন করে লেখা হবে। আর সেই ইতিহাসে সিলভিয়া আরলি আর তার ক্যামেরাম্যান অ্যালের নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে।

আমি স্মিত হাসি। চুপ করে ভাবি, সমুদ্র যে এমন করে অনন্ত মায়ায় বেধে ফেলছে আমার আগে বুঝি নি। এখন সমুদ্রের ভালবাসায় বাঁধন ছেড়ে পালাবার উপায় নেই আমার। সমুদ্রের স্তরে স্তরে বিস্ময়! সমুদ্রতলে সহস্র রোমাঞ্চ। বিস্ময়-রোমাঞ্চ-আনন্দ আর তার সঙ্গে প্রকৃতির ভালবাসা আমাকে আষ্ঠে পৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। এসব ছেড়ে যাবার উপয়ে নেই আমার।

বন্ধুরা, আপনারা এখন বুঝতে পেরেছেন তো, সমুদ্র কেন এমন করে আমায় টানে? বুঝেছেনতো, সমুদ্রের জন্য কেন আমি এমন ঘরছাড়া পাগল? সমুদ্র যে যাদু জানে। সমুদ্র যে বিস্ময়ের রাজ্য।